মায়ামৃদঙ্গ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৭১ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫১৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
সোমা প্রিণ্টার্স
৩৬ এন. রোড
হাওড়া-৮

আর কয়েক পা বাড়ালে শেষ মাঘের শান্ত স্তব্ধ নদী—জেলার ভূগোলে লেখা আছে ভাগীরথী, লোকে বলে গঙ্গা। 'পতিতপাবনী কলুষবিনাশিনী সুরেশ্বরী—জননী জাহ্নবী।' ওস্তাদ মানুষ। যখন তখন সভায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে পদ বেঁধে বলে, 'আমি তাঁর কোলেরই ছেলে বাবাসকল। মুক্তির তীরে আমার বাস। চক্ষু মুদে পা বাড়ালেই অগাধ শান্তির তলা ছোঁব।' .. পরক্ষণে ফিক করে জনজয়ী হাসিটি হেসে ফের বলে, তবে কিনা শান্তির তীরেই যত অশান্তি, শুচিতার পাশে যত অশুচিতা। যেমন কিনা জলের পারে জ্বলন—গঙ্গার পাশেই ধু ধু চিতা। জীবন মরণ গা ছোঁয়াছুঁয়ি বন্ধন। ...' এই উপমার জের বড় সহজে থামে না। হাততালি পড়ে। দোহারকিরা দেয় জয়ধ্বনি। ওৎ পেতে থাকা বাঘা 'খলিফা' জোরসে একটি ডুডুম্ বাজিয়ে দেয় বাঁয়া তবলায়।

কিন্তু এতদিন সে শুধু ছিল নিতান্ত উপমা। পদে-পয়ারে ধ্বনির মিল। ছন্দের মিল। 'কল্পনা।' 'আলকাপ' দলের লোকের একে বলে কল্পনা। শুধু কল্পনা নয় 'কবিকল্পনা।'

আজ যা দেখল, তা কিন্তু কল্পনা নয়। বলেছিল, শুচিতার তীরে যত অশুচিতা, পুণ্যের পাশে পাপ—আজ পঞ্চাশের প্রান্তে এসে তা হল প্রত্যক্ষ। যা ছিল ভাবনায়, তা এল বাস্তবে। ওস্তাদ ঝাঁকসা —ধনপতনগরের খ্যাতনামা আলকাপ ওস্তাদ শ্রীধনঞ্জয় সরকার—স্তম্ভিত আর বিমূঢ়।

বাঘের মত গর্জে উঠতে সাধ যায়। নয়ত বুক ফাটিয়ে হাহাকার করে। লাফিয়ে পড়ে মাঝখানটিতে, নয়ত পা টিপে পিছু ফিরে পালিয়ে যায়। এ যে এক অসম্ভব দৃশ্য। অশ্লীল। জঘন্য।

কিন্তু কিছু যেন করার নয়। ওরা দুটিতে যেন নিজেরই দুখানি হাত। যে হাত কাটে, সে হাতেই যন্ত্রণা। দুটি চোখ। একটি নষ্ট হলে আদ্ধেক পৃথিবী আঁধারে ডোবে।

শেষ বিকেলের লালচে সূর্য ওপারের বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর রোদ গুটিয়ে নিচ্ছে সন্তর্পণে। পাকা গম কি ছোলার ক্ষেত থেকে লোকেরা গতর তুলে ঘরের কথা ভাবছে। চরের ঢিবির ওপর একটা শকুন কতক্ষণ বসে রোদ পোহানোর পরে সবে উড়ে আসছে এ পারের উঁচু শিমুল গাছটার দিকে। শিমুলচূড়া থোকা থোকা লাল ফুল ভরা। কিংবদন্তির শ্মশানবাসী রাজচণ্ডাল বুঝি মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে লাঠিতে ভর রেখে অমনি দাঁড়িয়ে থাকত কবে। আসন্ন সন্ধ্যার নির্জন পটভূমিতে এইসব পাড়াগাঁয়ে একে একে যেন কিংবদন্তির যত নায়ক নায়িকারা চেহারা পায়—গাছ গাছালি ঝোপ-ঝাড়ে, বালির চরে, কালো জলে নক্ষত্রের ঝিকমিকিতে, পাখির ডাকে।...

ওটা শ্মশান—তাই আঘাটা। আকন্দ কালকাসুন্দে আর সোনাবাবলার ঝোপঝাড়ে ভরা পাড়। ঝোপের ওপর ঝালরের মত, ঝরোকার সদৃশ্য, আলোকলতার ছাউনি। বন

চড়ুইয়ের ঝাঁক আছে। গাঙ শালিক আছে। তাদের চিৎকার তবু কোন বিকার তোলে না ও স্তব্ধ-নিঝুম নির্জনতায়। ঘাসের ওপর মাকড়সারা ফের পুরোদমে জাল বুনতে শুরু করেছে—শিকার ধরবে সারাটি রাত। এখনও হিমের ঋতু। শিশির জমে ওঠে। দিনের দিকে রোদ খর হলে শুকিয়ে যায় জালগুলো। গরু-বাছুরের পায়ের আঘাতে সব ছিঁড়ে যায়। মাকড়সারা বড় পরিশ্রমী।

আর এই পিঁপড়েগুলোও। পোড়া কাঠের টুকরো ছড়ানো নরম মাটিতে তাদের আনাগোনা। কামড়ালে জ্বালা করে। অবিশ্রান্ত সরু দাঁতে ঝুরো ঝুরো মাটি কাটছে আর কাটছে। এখানে ওখানে উঠেছে অজস্র চাপ চাপ ঢিবি।

ঢিবি উইপোকাদেরও কম নয়। কচি বাবলা কি কাশঝোপের গোড়ায় তাদের ঘরবাড়ি। কোনটার ওপর সাপের খোলস পড়ে আছে।

আর আছে হাড়। মানুষ কি অমানুষের হাড় কে বলতে পারে দেখামাত্র? তবে শুধু মুণ্ডু দেখলে চেনা যায়। ওই একটা মোষের—শিঙ দুটো এখনও ভাঙেনি। আর পিটুলি গাছের গোড়ায় ওটা প্রকৃতই মানুষের। সিঁদুরের ছোপ রয়েছে। কিছু কালিঝুলিরও চিহ্ন। কোন ওঝা বদ্যি হয়ত তন্ত্রচালনা করেছিল। ফেলে গেছে। কোন গৃহস্থ একদিন নিয়ে যাবে। সব্জি মাচায় কি ফসলের খেতে ঝুলিয়ে রাখবে।

এই রকম একটা বিচ্ছিরি জায়গা। পোকামাকড়, সাপ, মড়ার মাথা, শ্মশান মশান।

এইরকম জায়গা ওদের দরকার ছিল। এমন নির্জনতা অগম্যতা, আড়াল! নিজের অজান্তে ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু কুঞ্চন জাগে ওস্তাদ ঝাঁকসার। আলোকিত আসরে হাজার শ্রোতার মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে 'রাজা' হয়ে তাকে বলতে হয়—ওরে বিশ্বাসঘাতিনী নারী, ওরে কুলটা, শিরশ্ছেদই তোর প্রকৃত দণ্ড এবং হাতে তলোয়ার কাঁপে, আলোয় ঝলকায় রাঙতার পাত, মিঠিপুরের সঙদার ফজল কোটালের ভূমিকায় করজোড়ে অনুনয় করে—বোকা মেয়ে গো, নাক না থাকলে 'আবিল' খায় ওনারা, ক্ষ্যামা দেন.. এবং লোকে হা হা করে হেসে ওঠে... আর হাঁটু দুমড়ে 'ওই শালার ব্যাটা শালা' নাচিয়ে ছোকরা শান্তি রানির চরিত্রে মিনতির গান গায়, কাঁদে—

সত্যি সত্যি ঢ্যামনা বাচ্চার চোখে অঝোর ধারা চিকচিক করছে দেখে শ্রোতাদের মন গলে যায়, আর ঝাঁকসা ওস্তাদ কোমরে কাঁধের চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে গর্জায়, হাঃ! বাস রে, সে কি হুংকার! ওই কণ্ঠের আওয়াজ শুনে মনেও থাকে না আর উদারা-মুদারা-তারা তিন পর্দর সঞ্চরিনী মিঠে সুরের মন মাতানো গানখানি এই মানুষটিই গেয়েছিল খানিক আগে। মনেই হয় না, এ গানের ওস্তাদ মরমী; কবিকার, দরদী ছড়াদার। এ যেন সত্যি সত্যি রাজার রাজা। রাজকণ্ঠ বজ্রনির্ঘোষ। হোক তার চেহারা 'হেড মাস্টারের মত', গায়ে সাদা জামা, পরনে ধুতি—কোঁচা পাশ পকেটে গোঁজা, সাদা চাদর—সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটে—খাড়া মোটা নাক, চওড়া কঠিন চোয়াল, কাঁচাপাকা অল্পস্বল্প চুল মাথায় ; আসরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে—তবে আমার নাম রাজা বিজয়কেতু, মনের বিশেষ বাসনা হেতু, যাব শিকারে গহন বনের মাঝারে। বেশ মিল দিয়ে বলে যায় একটানা। আটকায় না। লোকে অবাক হয়। মনে মনে স্বীকার করে

নেয় তক্ষুনি—হ্যাঁ, ওই রাজা বিজয়কেতু—শিকার করতে বনে চললেন—বহুত আচ্ছা, জোর জমে যাবে কাপ। ওরা বলে 'কাপ'। আলকাপের পালার নাম 'কাপ'। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, সংস্কৃত-মূলে কাপট্য থেকে কাপ—ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক। আর আল—আল মানে হুল, মৌমাছির হুল। মধু খেতে হলে হুলের জ্বালাও সইতে হবে। তাই, কেমন কাপ? না—যার আল আছে।

অবিকল সেই আলকাপ দেখছে চোখের সামনে। কুলোকে ঘেন্না করে বলে, আলকাপ নয়, আলকাটাকাপ! যা কিম্ভূত, যা হাস্যকর, যা উদ্ভট কিংবা যা আদিখ্যেতা—সুরসিকা তাকেই বলে আলকাটাকাপ। ঝাঁকসা আলকাপের ওস্তাদ। সে বলে, হ্যাঁ আলকাপ যেমন আছে, আলকাটাকাপও তেমনি আছে।

এ তাহলে আলকাপও নয়, আলকাটাকাপ। অযথার্থ, কিম্ভূত, উদ্ভট, বিকৃত।

শুধু তাই নয়, গর্হিত। মহাপাপ। এর পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। সাক্ষী ওই চাঁদ—সারা গায়ে কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। ওই দেখা, বেলা না যেতে তার উদয় কালবেলায়—পুবের আকাশে খসখসে রুক্ষ চাঁদ। দেকে বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

হ্যাঁ, চাঁদই বটে। কত আসরে সে চাঁদের উপমা ব্যবহার করেছে নাচিয়ে ছোকরাদের বর্ণনায়। বলেছে, মহাশয়গণ। জন্ম যদিও অভাজন 'চাঁই'কুলে, মাতৃভাষ, খোট্টাই বুলি, পেশা কিনা নগণ্য সব্জী চাষ, বাস মা জাহ্নবীকূলে—তথাপি বাল্যে গুরুগৃহে গমন করেছি, শিখেছি এ মধুর বাংলাদেশের মধুর বাংলাভাষা—আর কিনা যে পুস্তকের নাম বিজ্ঞান, যার বলে মানুষ আজ বলীয়ান... এইসব আদ্যোপান্ত বলার পর চাঁদের কথায় গেছে ঝাঁকসা ওস্তাদ। রাত্রির শোভা চাঁদ আর আলোকাপের শোভা এই ছোকরা। পুরুষ—তবু পুরুষ নয়, নারী—তবু নারীও না। তবে কী?... হা হা করে হেসে বলেছে, যেমন ওই চাঁদ। নিজের আলো নাই। ধার করা আলো গায়ে মেখে বাহাদুরী করে বলে, দেখ শোভা। আর এ আলোর মহাজন কেবা?... নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে দেশখ্যাত ওস্তাদ বলেছে, মহাজন ইনি। ইনি সূর্য। এই সূর্যের আলোয় রাঙা চাঁদ—তার পুরাণ-কথা শুনুন। চন্দ্রের গুরুপত্নী হরণ আর অভিশাপে অঙ্গক্ষতের বর্ণনায় আসর হয়েছে মন্ত্রমুগ্ধ। হঠাৎ কখন কথা গেছে সুরে—মুদারার চড়া সা থেকে রেতে। ভাঁজে ভাঁজে নেমে এসেছে খাদে। এ যেন কয়েকটি মুহূর্তে ওই ভাগীরথীর বুকে ষড়ঋতুর লীলা ঘটে যাওয়া—কখনও উত্তাল, কখনও গভীর কখনও শান্ত, কভু মৃদু। সারা আসরে অবগাহনের পুণ্য সঞ্চয়। রাত্রি হয়ে উঠেছে জীবনের মত বিচিত্র।

মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। কত কী দেখার বাকি ছিল। এখনও কত কী আছে বাকি। শুধু মূক সাক্ষীর মত চুপচাপ থাকা—যেমন রাহুচণ্ডাল লাল ফেটি বাঁধা শিমুল গাছটা—পায়ের নীচে—

ততক্ষণে সম্বিত হয়েছে গঙ্গা। এক গঙ্গা আরেক গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। পাশে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে যে, তার—

মেয়েদের মত দীঘল কেশ, দুহাতে চাঁদির চুড়ি, নীলচে হাওয়াই শার্ট, ডোরাকাটা পাজামা, পায়ে কাবুলী চপ্পল—ফরসা মুখের ওপর শেষ রোদের ঝলকানি তার—চাপা

চিবুক সামান্য পুরু কালচে ঠোঁট, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ ভুরুর ওপর ছোট্ট কপাল দেখে শুধু তাদের কথাই মনে পড়ে, যারা পুরুষ—তবু পুরুষ নয়, নারী—তবু নারীও নয়। যদিবা পুরুষ, সে-পুরুষ স্মৃতির পুরুষ—পরোক্ষ। যদি বা নারী—সে নারী অ-ধরা নারী, প্রত্যক্ষ কিন্তু বিভ্রম। দেহে কণ্ঠে মনে একান্ত কিন্নর।

পদ্মাতীরে কালীতলা বাজারের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ননীবাবু শান্তিকে বলেছিল সাক্ষাৎ কিন্নর হে তুমি। এ জন্মে আর তোমার মানুষ হবার আশা নেই—এ আমি গুনে বলে দিলাম। দেখে নিও। চুল কাটবে, চুড়ি ভাঙবে, পুরুষ হবে? হয়ত হবে—কিন্তু স্মৃতির জ্বালা বড় জ্বালা। সে ব্যাটা বাঘের মত চিবিয়ে খাবে দেখে নিও। মরবে, জ্বলেপুড়ে মরবে। নিজে মরবে, অন্যকেও মারবে। নামে শান্তি, তুমি অশান্তির দূত সংসারে।

পুরুষ বলে ওকে মানতে চায়নি ননীবাবু। আর লজ্জার কথা—মাতাল দশায় সবার সামনে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। সকালে নেশা ছুটলে সেই ননী ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, তুই ব্যাটা ধরাধামে এক অ-ধরা। খুব জ্বালাবি!

জ্বালাচ্ছে। জ্বালানোর আঁচ কী তীব্র এতদিনে আজ জানল ওস্তাদ ঝাঁকসা। শান্তি আজ অশান্তির দূতের বেশে দেখা দিল! সেই যে বলে বেড়িয়েছে এতদিন, শান্তির পাশেই আছে অশান্তি। শুচির পাশে অশুচি! আজ দ্যাখে গঙ্গার পাশে এ কোন গঙ্গা?

ওস্তাদের আদরের গঙ্গামণি।

মণি বলে যাকে জেনেছিল, গলায় মালার মধ্যমণি করেছিল, সে ঝুটা পাথর, বিলকুল কাচ। নাম গঙ্গা শুনেই গুনগুনিয়ে উঠেছিল একদিন,

সই আমার গঙ্গাজল হে
সই আমার গঙ্গার জল
জন্ম জন্ম ডুবলাম যত পেলাম না তো বুকের তল।।

সেই গান মাত্র তিনটি মাসেই ছড়িয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে। মুরশিদাবাদ ছাড়িয়ে বীরভূম— বীরভূম থেকে দুমকা পূর্ণিয়া সাঁওতাল পরগনা—এমন কি গঙ্গামণির দেশ সেই কালুপাহাড়িতেও। এক সময়ের সাগরেদ সোলেমান এখন ওস্তাদ হয়েছে। কদিন আগে বনেশ্বরের মেলায় তার দলের সঙ্গে পাল্লা (প্রতিযোগিতা) ছিল। সোলেমান বলছিল, কালুপাহাড়িতে এক আসর গেয়ে এলাম ওস্তাদজী। ওখানের দলের একটা গান শুনলাম—আপনার ভণিতা। ভারি সুন্দর গানখানা!... সলজ্জ হেসেছিল ওস্তাদ ঝাঁকসা। ধনপতনগরের শ্রীধনঞ্জয় সরকার—এই ওস্তাদ ঝাঁকসা যা বানায়, তাই এমন আলোর মত ছড়িয়ে যাওয়ার গৌরব পায়। সাক্ষাৎ সূর্য আলকাপের জগতে।

সেই সূর্যে যেন হঠাৎ অবেলায় গ্রহণযোগ। চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে। এতদিন পরে জানা গেল, প্রবলপ্রতাপ বাঘের মতো ভয়ঙ্কর মানুষটিকে এক জায়গায় এসে অসহায় হয়ে যেতে হয়। কিছুই করার থাকে না। সেই অক্ষমতার দরুন দুঃখেই চোখ ফেটে জল আসছে। যুবতী গঙ্গামনির বুকের ওপর তার প্রাণপ্রতিম 'ছোকরা' শান্তিচরণ—এই জঙ্গলময় শ্মশান—এ কি অভাবিত দৃশ্য!

খানিক পরে এই কাগুজে চাঁদটা মাঠের পারে আমবাগানের শীর্ষে ভৌতিক ফানুস হয়ে জ্বলবে। শূন্য আখের ক্ষেতে 'আলসে' বা আখপাতা জড়ো করে চাষারা আগুন জ্বেলে দেবে। ভুট্টার খেতে মাচায় বসে বসে শুয়ার তাড়াতে টিন বাজাবে কেউ। শেয়াল ডাকবে। প্যাঁচা ডাকবে। আর খুব তাড়াতাড়ি নিঃঝুম হয়ে আসা পাড়াগাঁয়ে পৃথিবীতে তখন একদল মানুষের যাত্রা হল শুরু। তীর্থযাত্রার মত হাঁটবে তারা। গভীর রাতে পদ্মাতীরে আমবাগানের নীচে চন্দ্র জুয়াড়ীর জুয়ার আসর। চন্দ্র জুয়াড়ী এবার বিনোদিঘীতে মেলা ডেকেছে। পক্ষকালের পারমিট। এ অঞ্চলের সরল সুবোধ মানুষগুলো পোকার মত মেলার আলোর দিকে ছুটেছে। পক্ষকাল প্রতিটি রাতে গানের আসর বসছে! এলাকায়-এলাকায় ঢেঁড়রা পিটিয়ে এসেছে চন্দ্র জুয়াড়ীর লোকেরা। যাত্রা না, বাউল ভাজা না, ঝুমুর না—স্রেফ আলকাপ। আর আলকাপ যখন, তখন ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের একা আসর সাত রাত্রি। পাল্টা দল ঘুঘুডাঙ্গার সোলেমান, হাজিপুরের গোপাল। পাল্লায় টিকলে ওরা রইল। না টিকলে লোক যাবে পদ্মা পেরিয়ে মালদার রহিমপুর। আরশাদ ওস্তাদের হাতে বায়না দিয়ে আসবে। সে আশা অবশ্য সামান্যই। রহিমপুরকে পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। পদ্মার এপার-ওপার ওদের তুল্য দল নেই! এপারের সেরা বলে যশের মালা যে গলায় পরেছে, সেই ওস্তাদ ঝাঁকসাও সবিনয়ে করজোড়ে নতমাথায় বলে, রহিমপুর আমাদের সবার গুরু। যেমন কিনা মহাগুরু দ্রোণ—আর আমি শালা অধম একলব্য—চণ্ডালের ব্যাটা চণ্ডাল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত সদা। ...অভ্যাসমত হো হো করে হাসে সে। বলে, কোনদিন তো মুখোমুখি হইনি ওনাদের—হলে দেখা যাবে। আসলে রহিমপুর দল কখনও পাল্লার আসরে বায়না নেয় না। ওরা বলে, আলকাপ ছিল সেকালে। একালে আমরা আলকাপকে করে তুলেছি 'লোকনাট্য'। আরশাদ ওস্তাদ শুধু লোকনাট্য বলেই ক্ষান্ত নয়—বলে 'নবনাট্য'। ঝাঁকসা হাসে। ...গাঁয়ের ছেলেটিকে শহুরে পোশাক পরিয়েছ—বাঃ বাঃ চমৎকার! বুলি শিখিয়েছ তোতাপাখির মতন। হতে পার তোমরা গুরু, আমি বাবা ওপথে নেই। গাঁ ঘরের কথা নিয়েই আমার কারবার। গুরুর যা সাজে শিষ্যের সাজে না; আমি নিজের পথেই চলি। তবে কিনা—শিখব, ফাঁক পেলেই তোমাদের কাছে শিখে নেব। কেন না আলকাপের জন্মস্থল হল রহিমপুর। আদিগুরু বোনা কানা—বনমালী দাস; একচক্ষুহীন নাপিত মহাশয় আদিতে জন্ম দিলেন আলকাপের। সে এক হিসট্রি—ইতিহাস!...

বিনোদিঘীর মেলা থেকে চন্দ্র জুয়াড়ী আজ খবর পাঠিয়েছে, রহিমপুর বায়না নিয়েছে। তবে পাল্লার আসরে গাইতে ওদের আপত্তি। শর্ত দিয়েছে, প্রথম আসর—তার মানে আসরের শুরু থেকে শেষরাত্রি অব্দি টানা সময় ওরা নেবে। তারপর আসর ছাড়বে। তখন বিপক্ষদল আসরে নামুক। চালিয়ে দিক সকাল অব্দি। রহিমপুর আর পাল্টা নামছে না। এবং মাত্র দুটো রাত্রের বায়নাই ওরা নিয়েছে। তার বেশি কদাচ নয়।

তার মানে আসরের যৌবনটুকু ওরা লুটেপুটে নিয়ে ঘুমোবে গিয়ে—তোমরা তখন

ছিবড়ে চোষ। শেষরাতে শ্রোতার চোখে ঘুমের শেষ এবং প্রচণ্ড টান। অতক্ষণের উত্তেজনার পর গভীর ক্লান্তি। সেই ক্লান্তি ভেঙে নতুন উত্তেজনা জাগানো কম কথা। ফাল্গুন মাস এসে গেল। শীত শেষবারের মত চূড়ান্ত হানা দিচ্ছে। রাতের শেষ প্রহরে ঘন কুয়াশায় পৃথিবী ঢেকে যাচ্ছে। হিম বাড়ছে ভীষণতর। আসরে বড় আড়ষ্টতা, কুণ্ডলীপাকানো বিধ্বস্ত সব শরীর। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আসরে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ খোলা কঠিন। সুর ঝাঁপে। আঙুল জড়িয়ে যায় বাদ্যযন্ত্রে।—

তবু ভাবেনি ওস্তাদ ঝাঁকসা। হাতে আছে এক মোহিনী আগুনের বাতি। পলকে পলকে আলোর তাপে চাঙ্গা করে তোলে শ্রোতার নিস্তেজ মন। চনমন করে ওঠে রক্ত।—

আমার এ প্রথমো গান
তোমারে শোনাব বলে
জেগে আছি সারারাতি ....

শান্তির এই গানখানিই যথেষ্ট। বাসরজাগা গ্রামীণ বধূর লজ্জা আর ক্লান্তি আর ঘুমের আবেশ মিলিয়ে 'শালার ব্যাটা শালা' যেন সাগর জাগায়—যে সাগরে উজ্জ্বল সোনার তরণী হয়ে ভাসে তার নিটোল দেহখানি, নানা ছন্দে। সে নারী—তবু নারী নয়, স্মৃতিকে যদি বা পুরুষ যদি বা পরোক্ষে কিশোর, সে-স্মৃতি তার ছায়ায় যায় লুকিয়ে—জেগে ওঠে এক অ-ধরা চিরকালের। নিজের রক্তমাংস ত্যাগ করে সে শুধু রূপে ভাসে।

আর আজ সারাটি দিন ওস্তাদ ঝাঁকসা শান্তিকে গান শিখিয়েছে। আদরে বিহ্বলতায় গভীর নেশায় প্রত্যক্ষ করেছে নিজের সৃষ্টিকে। পাশে বসিয়ে খাইয়েছে। হাতে জল ঢেলে দিয়েছে আঁচাবার সময়। বলেছে, তুই ব্যাটা বাগদী সন্তান—আমাপেক্ষা জাতে নীচ, তথাপি ইচ্ছে করে তোর এঁটো খাই। —পরক্ষণে হো হো হো হো স্বভাবসিদ্ধ হাসি।

তা শুনে শান্তি কটাক্ষ হেনে বলেছে, অত ভক্তি ক্যানে গো ওস্তাদজী? জবাই কববে নাকি মোল্লার মুরগিটা? করো না—গলাটা পেতেই রেখেছি কবে থেকে।

এইসব কথায় কিংবা ওই চপল চোখের নাচ দেখে মুহূর্তে ওস্তাদেব মন ঘৃণায় কটু। গর্জে উঠেছে হঠাৎ, চুপ, শালার ব্যাটা শালা! ...তারপর ফের হাসি—হো হো হো হো!

এমনি করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রয়াস সারাটি জীবন চলে আসছে। গালটা যখন দেয়, ঘৃণা থেকেই দেয়—কিন্তু যখন হাসে, তখন মুহূর্তে গালটা নিতান্ত কথার কথা হয়ে পড়ে। শান্তি হয়ত বিশ্বাস করে—গালাগালগুলো ওস্তাদের আদরের ভাষা, মুখের কথা—মনের নয়।

তারপর দুপুরে কালঘুমে পেয়েছিল। বিকেলে উঠে দলের লোকজনদের ডাকবার কথা। সবাই এ ধনপতনগরের বাসিন্দা নয়। কারুর বাড়ি তিন মাইল দূরে—কারুর পাশের গাঁয়ে। সঙদার বা কপে ফজল থাকে মিঠিপুরে। সে ওখান থেকে আরেকটা

ছোকরা আনবে। দুটো ছোকরা না হলে কাপে (ব্যঙ্গরসাত্মক পালা) বড় অসুবিধা হয়। দুটি স্ত্রী-চরিত্র থাকলে শুধু শান্তি দিয়ে তো চলে না।

ঘুম ভাঙল বেলা গড়িয়ে। প্রথম লোক পাঠানোর ব্যস্ততা—তারপর শান্তির খোঁজ। শান্তি বাইরের আটচালাটায় মাচার ওপর রোদে ঘুমোচ্ছিল। তার পাত্তা নেই। ওস্তাদ আজ গঙ্গামণির ঘরেই দিনটা কাটিয়েছে শান্তিকে নিয়ে। রাতে বায়না না থাকলে রাতটাও কাটানোর ইচ্ছে ছিল। কত ভাগ্যে মাসের মধ্যে দু-একটা রাত বাড়িতে এসে ঘুমনোর সুযোগ মেলে। তবে সেও এক ঝামেলার মধ্যে পড়া। বড় মোল্লান অর্থাৎ বড় গিন্নির দাবি সবার আগে। সেখানে তিনটি পুত্র, এক কন্যা' বড় সংসার। কমলবাসিনী মধ্যযৌবনেই হাড়গিলে রোগা কুঁজো আর তেমনি কুঁদুলি মেয়ে। সেথা সুখ থাক ভালবাসার, স্বস্তি নেই। মেজ মোল্ল'ন সুখলতা সাক্ষাৎ বাঘিনী। বাঁজা মেয়ে। দূর থেকেই করজোড়ে এগোতে হয়। পয়সাওলা বাপের মেয়ে। বাপ শম্ভু চাঁই আজকাল ট্রেনে সবজি চালান দিয়ে একতলা ইটের বাড়ি তুলেছে। হয়ত সেই গিদেরে মাটিতে পা পড়ে না সুখলতার। স্বামীর ছিটেবেড়ার দেয়ালঘেরা খড়ের ঘরে বন্দিনী পায়রার মতো সদা বকবকম কলকণ্ঠ। আর ছোটকি এই গঙ্গামণি—কালুপাহাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ঢপদলের অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতী মেয়ে। আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়স। ওর জন্যই ওস্তাদ গাঁয়ে একঘরে।

হোক—তবু দেশখ্যাত ওস্তাদ মানুষ। গাঁয়ের সমাজ ছাড়িয়ে আরও বড় পৃথিবীর চৌহদ্দিতে তার চলাফেরা। তার কিছু যায় আসেনি তাতে। পয়সাকড়িও বেশ কামায়। তিন জায়গায় তিন বউর বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। সামান্য পৈতৃক খেত আছে। দুই গিন্নির মধ্যে তা সমান ভাগে বণ্টিত। ছোট পায় শুধু নগদ টাকাকড়ি।

আর সবচেয়ে মজার কথা. এই তিন মাসে গঙ্গামণিও একঘরে থাকার ব্যাপারটা ধাতস্থ তো করেছেই, অন্য বউদের মতো তার এতে কোন মাথাব্যথা নেই—উপরন্তু পাড়ায় ইতিমধ্যে তার ভাবসাবও গেছে বেড়ে। ওর দিনরাত্রি একা কাটে না। নির্মলা আছে, মধুমতী আছে—কত বৌঝি ওর আশেপাশে সব সময় ছায়ার মত ঘোরে। দল বেঁধে জলকে যায় গঙ্গার ঘাটে। সাঁতার কেটে আসে। এমন কি অবিকল চাঁই বুলিতে বলে, চল্ গে নির্মলা, নাহান করোগে গাঙমে। নির্মলা হাসলে সে বলে, কা হো রঙ্গিয়া, এত্তা হাস গাইলে কাহে?

ওস্তাদ ভেবেছিল, গঙ্গামণি যথারীতি জলকে গেছে। শীতের দিনের ঘুম—রাত জাগা মানুষের পক্ষে বেশ গাঢ় হবার কথা। উঠেই দেখে, ঘর শূন্য। চা খেতে ইচ্ছে করছে। তবে ওদিকে লোক পাঠানো ইত্যাদি নানারকম প্রস্তুতি আছে। সকাল সকাল সেথায় পৌঁছতে হবে। শান্তি সাইকেলে মিঠিপুর যাবে ফজলের বাড়ি। কিন্তু শান্তি নেই।

বলা যায় না, যে আত্মভোলা ছেলে—হয়ত গুণমুগ্ধ ভক্তদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। সেই ভেবে গঙ্গার পাড়ে খোঁজখবর নিতে এত দূর খেয়ালবশে চলে আসা। হঠাৎ একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বেলার অল্প রোদে শ্মশানের শিমুলতলায়

একজোড়া মানুষ দেখতে পেয়েছিল। দুজনেই যেন মেয়েমানুষ—একজন তো গঙ্গাই বটে, অপরজন কি নির্মলা, নাকি মধুমতী—তাহলে ওই শ্মশান মশান আঘাটায় কেন? বুক ধড়াস করে উঠেছিল।

চুপিচুপি ঝোপঝাড় ভেঙে এখানে আসতেই চোখে পড়েছে চাবুক। কী জ্বালা কী যন্ত্রণা।

গায়ে গায়ে জড়াজড়ি যেন দুটি নাগনাগিনী জোড় বেঁধে শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে ঢালু পাড় বেয়ে শান্তিকে নেমে যেতে দেখে গঙ্গা বলে, ও কি! এ অবেলায় নাইবে নাকি? গা মুছবে কিসে?

নিস্তেজ গলায় ওর জবাব আসে, চুল দিয়ে মুছিয়ে দিও—এত মায়া যদি! সেই সঙ্গে সামান্য হাসি—কেবল চোখ দুটোই যা হাসে। ওর চোখ দুটো এত সুন্দর! বড় দুঃখ লাগে! সংসারে বেচারার আপনজন বলতে কেউ কোথাও নেই। এ উঠন্ত বয়সে এখনও মেয়ে সাজবার পাগলামিতে সায় দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। ভাল খেতে পায়, ভাল পরতে পায়, নাম যশ প্রশংসা মেলে। কিন্তু ও যে পুরুষ, তা ওকে ভুলে থাকতে হয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে হাতে চুড়ি, মাথায় চুল, নাকে নাকছাবি—হাস্যকর একটা হিজড়েপনা যেন। তবু কারও কী ঘেন্নাপিত্তি আছে কোথাও? আলকাপের ছোকরা—ব্যস, পরোয়ানা মিলে গেল—আর কী চাই? ঘৃণা, ঘৃণা! ঘৃণা যে এত বেশি হয়, গঙ্গা জানত না কোনদিন। গঙ্গা বলত, তোমার লজ্জা করে না মেয়ে সাজতে? ...তা শুনে শান্তি অবাক হয়েছে। সে কি গো! তাহলে ওস্তাদের যে দল অচল হয়ে যাবে। গঙ্গা বলেছে, হবে হবে। তোমার তাতে কী? পরক্ষণে চমকে উঠত সে। তুলে দেবে না তো গুরুমশায়ের কানে। না, তোলে নি শান্তি।

জামা পাজামা সব খুলে আন্ডারপ্যান্ট পরে ঠাণ্ডা কালো জলে নেমেছে শান্তিচরণ। আলকাপদলের মানুষেরা বড় নিলাজ হয়। গঙ্গা দেখেছে। শান্তি পুরো ন্যাংটো হয়ে জলে নামলেও অবাক হত না সে। কিন্তু কী ফরসা দুধের মত ঝকঝকে শরীর শান্তির। কী নিটোল। সব সময় শরীরটা মেয়েদের মত ঢাকা থাকার ফলে এই রকম হয়েছে। তেমনি নরম আর অপটুও। বিকৃতি ঘটবার ভয়ে ওস্তাদ ওকে এতটুকু খাটতে দেয় না। কাপড় কাচাও বারণ। ওস্তাদ বলে, এ নামতা ভুলো না—চলনে বলনে শয়নে স্বপনে তুমি নারী—সর্বদা নারী তুমি ভাবনায় ইচ্ছায় আহারে বিহারে। তবে না আলকাপের সার্থক ছোকরার জন্ম! প্রথম-প্রথম গঙ্গা সকৌতুকে বলত, তা এত হাঙ্গামার দরকার কী বাপু? মেয়ে রাখলেই পার দলে। ছাগল দিয়ে গরুর কাজ কেন? ঝাঁকসা ওস্তাদ হেসে উঠত। —কেন? তোমার সাধ যাচ্ছে নাকি? কিন্তু ছোটকি, কথাটা কী জান? তাতে মায়া জমে না।

গঙ্গা অবাক। —মায়া? তার মানে!

গম্ভীর হয়েছে ওস্তাদ। হ্যাঁ, তার নাম মায়া। সে তুমি বুঝবে না। সে বড় গুহ্য তত্ত্ব। দ্যাখ না ছোটবউ, ঝুমুরকে তাড়িয়ে দিল আলকাপ। বীরভূম ছিল ঝুমুরের আদি ঠাঁই।

বীরভূমে আজ ঝুমুর মেয়েদের অন্ন জোটে না। রক্তমাংসের শেষ কথা রক্তমাংস—ব্যস, কথা ফুরুলো, নটে মুড়ুলো। কিন্তু মায়ার শেষ কথা নেই। সে তুমি বুঝবে না। ঝুমুর মেয়ে এলোকেশী এখন মল্লারপুর চালকলে মজুরনীর কাজ করে সাত সিকে রোজ মাইনেতে! আর আলকাপের ছোকরার কপাল দেখ। বড় কঠিন মায়ায় বেঁধে রেখেছে পদ্মার এপার-ওপার।

গঙ্গা সেই মায়াঝাঁপির ঢাকনা খুলে ভিতরটা ছুঁল আজ। নিষিদ্ধ গণ্ডিরেখা পেরিয়ে যেন সাতশ রাক্ষসের প্রাণভোমরা ছুঁল একবার। বুক ঢিপ ঢিপ করে। কোথায় বুঝি আকাশপাতাল তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

গঙ্গা উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ। শীতের ভয়—তবু নাইতে ইচ্ছা করে। নির্মলারা এখনও দূরের ঘাটে তার জন্য অপেক্ষা করছে। দেরি হয়ে গেল কিছুটা। ঝোপঝাড়ের দিকে আসবার স্বাভাবিক অজুহাত একটা আছেই! সেজন্যে ভয় নেই। কিন্তু কেউ দেখল না তো?

শান্তি হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসছে।

প্রথমে বাঁদিকে তাকায় গঙ্গা।

এখানে গঙ্গা দুকূলেই বেশ ভরাট। এপার ভাঙা ওপার গড়ার খেলা নেই। আঁটোসাঁটো নিটোল মাজাঘষা দেহে গঙ্গা এখানে গঙ্গার মতই চিরযৌবনবতী। বাঁদিকে ঝাপসা হয়ে পড়েছে কুয়াশার নীলচে আড়ালে ছোট্ট শহর জঙ্গিপুর। দূর ঘাটে অস্পষ্ট পারাপারের মানুষ, নৌকো, মোটরগাড়ি। কাছাকাছি কেউ নেই।

তারপর সামনে ওপারে তাকায়।

ধু-ধু মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে। বুনোহাঁসের ঝাঁক উড়ে আসছে। আখের শূন্য খেতে কারা সবে আগুন জ্বেলে দিল। সরষের হলুদ ফুলে অন্ধকারের আঙুল নামছে। গঙ্গার বুকে উজ্জ্বল স্তনের মত সাদা ঢিবি আর বুকের ওপর নেমে আসা কালো চুলের মত শান্ত স্তব্ধ জল ঘিরে হালকা গোলাপি ছটা। জলচরা পাখিরা উড়ে যাচ্ছে পাড়ের দিকে।

ডাইনে তাকিয়ে ছোট্ট গ্রাম ধনপতনগরের নিচে ঘাটটা দেখতে পায়। নির্মলারা এখনও ঘড়া মাজছে।

তারপর হঠাৎ—মুহূর্তে পিছনের কথা মনে পড়ে।

ওটা শ্মশান। ওখানে কেউ আসে না। ঘন ঝোপঝাড়, হাড়, মড়ার মাথা আর বিষাক্ত পোকামাকড়ের আড্ডা। কেন আসবে? আসবে—মৃত্যু হলে তবেই আসবে। এতক্ষণ কোন হরিধ্বনি তো ওঠেনি ওদিকে।

গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল রক্তের গোটার মত কয়েকটা শিমুল ফুল। অকারণ বাতাস এল কাঁপিয়ে। গঙ্গার জলে ঢেউ তুলে চলে গেল চরের দিকে। মরশুমের প্রথম ঘূর্ণিবাতাস হয়ত এইটাই। খড়কুটো উড়ছে। এতদূর থেকে চরের ওপর ঘুরন্ত একটা হলুদ পাতা নজরে পড়ছে। পা বাড়িয়ে ফের তাকাল ঝোপের দিকে। তারপর থমকাল গঙ্গা। বুকে হাতুড়ি পড়ল জোরে। পলকে সে সাঁৎ করে আকন্দঝোপে ঢুকে হনহনিয়ে ঘাটের দিকে চলতে থাকল।

আর ওস্তাদ ঝাঁকসা শিমুলতলায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডেকেছে, শান্তি!

আর শান্তি—শান্তিও ক্ষিপ্রহাতে জামা পাজামা জুতো কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে জলে। জল বুকসমান মাত্র। ওপারে চর। তারপর ফের হাঁটুডোবানো খানিক জল। তারপর পাড়।

প্রাণভয়ে তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত পালিয়ে যাচ্ছে ছোঁড়াটা। কিন্তু ভাঙা গলায় অসহায় লোকটা শুধু চেঁচিয়ে ওঠে, শান্তি, শান্তি!

সাড়া আসে না। সামনের আবছায়া আর গঙ্গার কালো জল মিলে এক অখণ্ড ব্যাপক অন্ধকার—তার শিয়রে রক্তের মত জ্বলন্ত লাল ছটা। যেন স্বয়ং রক্তমুকুটপরা অন্ধকারবর্ণ নরক শান্তিকে এইমাত্র গ্রাস করে নিল।

ওস্তাদজী।

উঁ।

ব্যস, ওইটুকু মাত্র সাড়া। যতবার ডেকেছে ফজল, একই অস্ফুট আওয়াজ মাত্র। সারা জীবনের সঙ্গী লোকটা আজও দুর্বোধ্য ফজলের কাছে। অত বড় টানা টানা চোখ দুটো কবে একদিন হয়ত সরল ছিল। মনের ভাব বোঝবার পক্ষে ছিল খুবই সহজ। হয়ত সে তার ছেলেবেলায়—যখন সে গাঁয়ের মোড়ল তার বাবার সঙ্গে শকরকন্দ আর সরবতি আলুর খেতে গেছে, দেখেছে কালো জলের গভীর সুন্দর নদী, নদীর পারে সুদূর আকাশ, দেখেছে জলকে যাওয়া মেয়েদের চপল হাসির ঘটায় কেমন করে এপার থেকে ওপার ঝলমল করে ওঠে। সেই চোখ লোকটা রাত জেগে-জেগে হারিয়েছে! দুনিয়ার সবার থেকে ও এখন আলাদা মানুষ। ওই ঘোলাটে নির্ঘুম অদ্ভুত চোখে কী সে ভাবে, কী সে করতে চায়, টের পাওয়া ভারি কঠিন। ও এখন চিরকালের রাতের মানুষ—আসর ছাড়া ওর কোন আলাদা জগত নেই। যখন কথা বলে, মনে হয়, আসরে দাঁড়িয়ে আছে—সেই সুরে কথা বলছে—যে সুরে সে কাপ দিতে বলে ওঠে—তবে আমি হলাম রাজা বিক্রমাদিত্য, সুবিচারে ভুবনবিদিত, ঘর আছে সতী, নাম ভানুমতী—

কিংবা ছড়ার ধুয়ো গেয়ে ওঠে,

নদীর স্রোতের মত কালের গতিতে আমার
হেলায় বেলা বহে যায় গো।

লোকটা ওই হেলায় বেলা বহে যাবার ব্যস্ততায় ছটফট করে মরে যেন। ফজল, ওরে ফজ্‌লা, এত হয়েও কিছু হল না রে ভাই! ফজল যদি বলে, কী হল না ওস্তাদ? অমনি ধনঞ্জয় সরকার ধমক দিয়ে বলবে, সে তুই বুঝবি না রে শালা কাঠুয়া ব্যাঙ কুন্‌ঠেকার (কোথাকার)। ফজল একটু হেসে চুপ করে যাবে। মনে মনে বলবে, ভুলোর পেছনে ছুটছ কী ওস্তাদ—পুরুষ কখনও নারী হয় না।

চাঁদ ততক্ষণে বাঁশবনের মাথা পেরিয়ে গেছে। মস্ত ডাগর চাঁদ। পুরুষ কখনও নারী হয় না—কথাটা ফের তার মনের মধ্যে আটকানো পোকার মত ছটফট করছে। পুরুষ কখনও নারী হয় না—তার মানে 'নারীলোকের' যা সব সুন্দর সুন্দর জিনিস—ভালবাসা বল, মায়া মমতা বল, স্নেহ বল, কি দয়া ধর্মই বল, পুরুষলোকের মধ্যে আশা করেছ কি মরেছ! তত্ত্বকথা আমিও তো কম জানিনে ওস্তাদজী! হত যদি শান্তি কোন স্ত্রীলোক, কখনও অমন করে বুকে 'হন্তা' দিয়ে পালাত না! ও শালা আলকাপের ছোকরা বেইমান কালসাপ। দুধকলা দিয়ে পুষে একদিন বুকে দংশন করবেই করবে। ধিক ওস্তাদ, তোমার শিক্ষা হল না এখনও। ঠকতে জনম কেটে গেল—এখনও নেশা ছাড়ল না। কবে থেকে তোমাকে বলে এসেছি, সাবধান—বেশি মত তালিম দিও না, উড়তে শিখলেই অন্য ডালে গিয়ে বসবে।

এসব কথা বলার জন্যই ফজল বারকতক ডেকেছে, কিন্তু ওদের ভাবসাব দেখে মুখ খুটে আর বলা যাচ্ছে না। একটা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চুপ করে থাকছে। কাকে কী বলতে যাচ্ছে? লোকটা তো কম জ্ঞানের জ্ঞানী নয়।

ফজলের বাড়ির উঠোন থেকেই যাত্রা শুরু হত মেলার দিকে। কয়েক মাইল পূর্বে পদ্মার ধারে বিনোদীঘি গ্রামটা। দীঘির পাশে আমবাগানের মধ্যে মেলার ধুম। উপলক্ষ তেমন কিছু নেই—চন্দ্রমোহন জুয়াড়ির কাণ্ড। গ্রামের ধনী ভদ্র লায়েক মানুষদের বশ করেছে টাকা দিয়ে। ওই টাকায় দশের কোন কাজ হবে সেখানে—ওঁরা তাতেই সন্তুষ্ট। মেলার যাবতীয় দায়িত্ব চন্দ্র জুয়াড়ির। ওদিকে পদ্মা-জলঙ্গি এদিকে ভাগীরথী—'বাঘড়ী' থেকে 'কালান্তর' অঞ্চল অব্দি তার জুয়ার রাজ্যপাট। সাত-আটটা জুয়ার ফড় পাতা থাকে মেলায়। চন্দ্রমোহনের চেলারা সেখানে বসে কালোয়াতি গলায় হাঁকডাক করে। গুটি চালে। চন্দ্রমোহন সব দেখাশোনা করে। হার হলে টাকা জোগায়, জিৎ হলে কুড়িয়ে বেড়ায়। আর তার বডিগার্ড হচ্ছে কুখ্যাত সলিম। সলিমেরও অনেক চেলা-চামুণ্ডা রয়েছে। যেন ছায়ার আড়ালে গুরুর হুকুম তামিলে ওঁৎ পেতে থাকে। মেলার গোলমাল লাগলে তারা বেরিয়ে আসে আওয়াজ দিয়ে। বাস, পলকে মেলায় সূঁচ পড়লেও আওয়াজ যায় শোনা।

তার বায়নায় গান। বায়নাপত্রে সই দেবার আগে গানের দলকে একশোবার ভেবেচিন্তে নিতে হয়। আসর ফেল করলে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে আর আসরে নামবার সাধ এ জন্মের মত ত্যাগ করা ভাল।

ফজলের হাতের মুঠোয় সেই বায়নাপত্রের একটা কপি। বেশ শীত পড়েছে এবার। মুঠিতে কোন অনুভূতি নেই—ঠাণ্ডায় জমে গেছে আঙুলগুলো। ওস্তাদ উঠোনে এসে মোড়ায় বসেছে তো বসেছেই, ওঠবার নাম নেই। তাই তার যেমন, তেমনি দলের লোকগুলোরও হিম বাঁচিয়ে দাওয়ায় ওঠা চলে না। ছোকরাহারা ওস্তাদ—যেমন মণিহারা ফণি—জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ হতবাক লোকটাকে দেখে সবার বুকের মধ্যেটা চিনচিন করে উঠছে।

ছোকরা আরেকবার অবশ্য পালিয়েছিল। তবে এমন হঠাৎ বায়নার রাত্রেই

নয়—অনেক আগে। ফুরসৎ ছিল ফের আরেকটা জোগাড় করার। আলকাপের দল প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটা করে রয়েছেই। সে-সব দলে জানাশোনা কোন ভাল নাচিয়ে-গাইয়ে ছোকরা থাকলে, নানা কৌশলে তাকে মুঠোয় আনা যায়। কিছুকাল তালিম দিলেই—যদি ঠিকঠাক ঘিলু মগজে থাকে, আর থাকে বিধিদত্ত কোন মহিমা—দেহের ছন্দে কি মনের গড়নে—সে ছোকরা তখন আর এক মোহিনী-মায়া। একটি কটাক্ষে আসর অবশ। ...

সুফল ছিল ওস্তাদের প্রথম ছোকরা। বেশি টাকার লোভে সে অন্য দলে পালিয়েছিল একদিন। তারপর এল শান্তি। বাগদীর ছেলে—মা-বাবা হারা অনাথ, এঁটোকাটা কুড়িয়ে খেয়ে বেড়ায় গেরস্থবাড়ি। একদিন ওস্তাদ ঝাঁকসা গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, শোনে ভারি মিঠে গলায় একটা বার তের বছরের আধ ন্যাংটা ছেলে আপনমনে গান গাইছে। জলের ধারে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে ছেলেটি। কী সুন্দর চেহারা! শামুক গুগলি খেয়ে বেঁচে আছে বলেই কি অমন গলার স্বর? ওস্তাদ ভাবত।

বড় সাধে নাম রেখেছিল শান্তি। কারণ, মনে তখন ঘোর অশান্তি—অন্যের দলের ভাল ছোকরা হায়ার করে বায়নার আসর তুলতে হয়। তাতে বড় অসুবিধা—হাতে নিজের তলোয়ারটি না থাকলে কি রণক্ষেত্রে মান বাঁচে না মাথা বাঁচে?

সেই শান্তি!

ফজল ফেরে ডাকে, ওস্তাদজী!

ফের তেমনি অস্ফুট সাড়া—উঁ?

চন্দ্র জুয়াড়ির বায়না খ্যাল রাখুন কিন্তু। ফজল মরিয়া হয়ে বলে কথা।

এবার একটু নড়ে ওঠে ধনঞ্জয় সরকার। আবছা জ্যোৎস্নায় উঠোনের ওপর যথারীতি হারমোনিয়াম বাক্স—তার ওপর ডুগিতবলা বাঁধা, দুখানা খাপে মোড়া ছোট্ট তলোয়ার, শান্তির পেন্টের বাক্স—যা ফজলের বাড়িতেই থাকে—এইসব কিছু তৈরি। আর তার পাশেই বসে আছে 'বাহক' রঘুনন্দন। বিড়ি টানছে এক মনে। হুকুম পেলেই মালপত্র মাথায় তুলে সবার আগে হাঁটতে শুরু করবে। বেশ বোঝা যায় মাথার 'বোঁড়ে'টা পাছার নিচে রেখে সে আরামে বসে আছে। গা-মাথা ঢাকা তুলোর কম্বল—ওস্তাদের দান। হাবাগোবা মানুষ—কী ঘটেছে যেন কিচ্ছু টের পায় না।

বিকেল থেকে ফজলের বাড়ি এসে সবাই বসে রয়েছে কথামত। ওস্তাদ আর শান্তি আসবে সন্ধ্যায়। উঠোনে মাদুর পেতে দিয়েছে ফজল। চা করে খাইয়েছে। ফজলের বউ এ সবের মধ্যে নেই। স্বামীকে গানের দল ছাড়ানোর জন্যে নিজের কলজেটা পীরের থানে মানত দিতে সে সব সময় তৈরি। ফজল গ্রাহ্য করে না। ওর মুখ চললে এর চলে হাত। লোকজন জোটবার আগে এক দফা ঝামেলা হয়ে গেছে। একমাত্র ছেলেটির গায়ে জ্বর! ওষুধ পথ্যির নাম গন্ধ নেই—বেচারা মেয়ে হয়ে যাবেই বা কোথায়? ডাক্তার বলতে সেই এক জঙ্গিপুর শহর—এক মাইল হেঁটে যেতে হয়। মিঠিপুরে কবরেজও নেই—আছে এক ওঝা। ছেলেকে কি ভূতে ধরেছে যে ওঝার বাড়ি যেতে হবে? গনগনে উনুনের পাশে ফজলের বউ ছেলেকে কোলে নিয়ে আগুন

পোহাচ্ছে। উজ্জ্বল অঙ্গারের ছটায় তার দুটো ভিজে চোখ দেখবার অবকাশ কারও নেই। আপন মনে নিঃশব্দে কাঁদছে সে। কতদিন এমনি করে কাঁদে। ...

ওস্তাদ ঝাঁকসা যেন ঘুম থেকে জেগে এক মনে বলে, ফজল লম্ফটা আনবি?

দাওয়ায় লম্ফ জ্বলছিল। উঠে গিয়ে নিয়ে আসে ফজল। হারমোনিয়াম বাক্সের ওপর রেখে বলে, পত্র লেখবেন জুয়াড়িকে? তাই ল্যাখেন বাবু, দৈবের মার—কী করি।

ওস্তাদ একটু হাসে। —না রে ভাই। কই, দেখি বায়নাপত্রটা। ভাল করে পড়েও দেখিনি সেদিন।

ফজল বায়নাপত্রটা দেয়। পুরো ডেমি কাগজ—একটা নকল চন্দ্র জুয়াড়ির কাছে আছে। ঝাপসা লাগে অক্ষরগুলো। চন্দ্র জুয়াড়ির আসরে নতুন গান নয়, আজ নতুন বায়নাপত্র নয়—কত বছর কেটে গেল ওর মেলাগুলোয়। ফজল সন্দিগ্ধ মনে বলে, আইনের ফাঁক খুঁজছ ওস্তাদজি? ও শালা উকিলের বাবা। মুসাবিদা যা করে, হাকিমের সাধ্যি নাই তার...

ওস্তাদ ঝাঁকসা হাত নেড়ে থামবার ইসারা করে। বিড়বিড় করে পড়তে থাকে—

... ঝড় বৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া কোন মতে বায়না খেলাপ করিব না। ... পড়তে পড়তে হেসে ওঠে আপন মনে। বলে, শালা জুয়াড়ি বড্ড হুঁশিয়ার। বাঁধা গৎ ঝেড়েছে। যেন, বাবা মরুক বা মা মরুক, কি ঘরের মাগটাই দুম করে মরে যাক, তাও ছাড়ান নাই!

দলশুদ্ধ হাসে এ কথায়। এতক্ষণে স্তব্ধ মুখগুলো গুঞ্জনে নড়ে ওঠে।

ফের বাকিটা পড়তে থাকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ইতি বাইশে মাঘ, সন তেরশ, উনষাট ... ফজল। ...হঠাৎ চমকে উঠে ডাকে সে। এটা উনষাট সন?

ফজল বলে, কে জানে? ক্যানে গো?

কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে থাকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। তারপর আস্তে আস্তে বলে, সন তারিখের হিসাব রাখি না রে ভাই—দিন যায় না রাত যায়। আমার তো সবই সমান—অন্ধের মতন থাকি। ফজল! উনতে কী আছে রে?

হাল ছেড়ে ফজল বলে, জান্নে বাবা। মুরক্ষু মানুষ, সাতে পাঁচে ন ।

কেমন হাসে ওস্তাদ ঝাঁকসা। উনপঞ্চাশে আমার সুফল পালাল—তোর মনে নাই ফজল?

আমার সুফল। হাসি পায় কথাটা শুনলে। ফজল হাসে না। চুপ করে থাকে।

পাগল হয়ে বসে থাকতাম গঙ্গার ধারে। তখন আমার প্রথম যৌবন। বড় বউ ধরে নিয়ে আসত বাড়ি। প্রহ্লাদের মা তখন প্রতিমার মত রূপসী—অ্যাঁ? হঠাৎ সশব্দে হো হো করে হেসে ফেলে ধনঞ্জয় সরকার। ...তবু শালা এ পাপীর মন ভরল না, হৃদয় জুড়াল না। এর মনে পাপ, চোখে তার ছাপ পড়ছে। লোক খবর দেয় সুফল আমার অমুক দলে অমুক মেলায় গান করছে। একবার গেছি সাঁইথিয়ার ওদিকে একটা মেলায়। গিয়েই শুনি আগের রাতে পাকুড়ের দলের গান হয়ে গেছে—দারুণ এক

মোহিনী ছোকরা এসেছিল—সুফল তার নাম। অন্য কোথায় বায়না আছে বলে চলে গেছে। ওঃ কী আফসোস, কী আফসোস। শালাকে সামনে পেলে কলজেটা ছিঁড়ে খাই, নয়ত...

ফজল বাধা দিয়ে বলে, পুরনো কথা থাক ওস্তাদ। বায়নার কথা ভাবুন।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কান করে না। শালা ঢ্যামনা আমার বুক খালি করে দিলে। বুকখানা গ্রীষ্মকালের আকাশের মত জ্বলে। বিবাহ করলাম। বুক ভরবার বড় আশা নিয়ে বিবাহ করলাম। কিন্তু ফজল, কী হল? সে জ্বালা তো শেষ হল না। সুফল যা দিয়েছে তা তো কেউ দিতে পারল না। জ্বালা নিয়ে ছটফট করে মা জাহ্নবীর ধারে গিয়ে বসে থাকি। একদিন হঠাৎ যেন মা আমার বড় দয়া করে সামনে তুলেছিলেন ওই শান্তিকে। আঃ ফজল রে, সে কি দিন, সে কি আনন্দ। ফের আকাশের চাঁদ পেলাম হাতের মুঠোয়। তোর মনে পড়ে না ফজল? কিন্তু ভাই, সুফল শান্তি নয়। শান্তি সুফল নয়। সুফল যাই করুক, শান্তির মত ... হঠাৎ সতর্ক হয়ে থেমে যায় ওস্তাদ ঝাঁকসা।

স্মৃতিচারণায় যে আবেশ, তাতে ডুবে থাকলে এ আবেগবিহ্বল কথাটার জবাব দেওয়া যেত। ফজলের মন পড়ে আছে বিনোদিঘীর আসরে। চন্দ্র জুয়াড়ির বাঘের মতো অন্ধকার থেকে তাক করছে—অবিকল দেখতে পাচ্ছে সে। গা শিউরে ওঠে। ফজল হিসেবি এসব ব্যাপারে—ওস্তাদের মত মরিয়া নয় সে। তাই সে বলে, ছাড়ান দ্যান জী, ছাড়েন। ভবিষ্যৎটা ভাবেন।

কখনও আপনি, কখনও তুমি বলা ওর অভ্যাস। সঙদার মানুষ—বলতে গেলে আলকাপের আসরে ছোকরার মতই তার অস্তিত্ব এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছোকরা যেমন তেমনি সঙদার বা সঙাল বা ক'পে না থাকলেই চলে না। লোক হাসাবে কে? এ তো মূলে রঙ্গরসের নাট্য! সঙদার ফজল বাঘড়ি অঞ্চলের বুলিতে বলে ওঠে, চলেন ওস্তাদ—আমি শালা কাঠুয়া ব্যাঙ তো আছিই—গোপলার সঙ্গে পাল্লা, ডর কিসের? জোর রঙ ধরে দিব বরঞ্চ—ক্যানে, সেই পুরনো আমলের খাস্তা কাপগুলান?

কথাটা তা নয় ফজল, কথা আছে।

কী কথা?

আছে। তা তোকে বলা যাবে না রে ভাই।

ফজল অবাক হয়েছে। এই প্রথম সে শুনল—কী একটা কথা ওস্তাদ তাকে বলতে পারবে না। শুনে মনটা কেমন করে ওঠে। বুকে হাতুড়ি পড়ে হঠাৎ। সে বলে, আমাকে না বলার মত কিছু আছে ওস্তাদজি? বেশ, বল না। শুনব না।

হয়ত বলব, বলব না ... নিস্তেজ কণ্ঠে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে। সে কথা এখন থাক। বায়নাপত্রে দেখছিলাম, শান্তিচরণের নামে কিছু লেখা আছে নাকি। নেই। থাকলে একটু কঠিন হত। ওকে নিয়ে গান না করলে টাকা দিত না জুয়াড়িটা। তা ফজল, তুই বলছিস, গান চালাতে পারবি?

আলবৎ পারব। ফজল লাফিয়ে ওঠে।

কে জানে! অঙ্গহানি তো বটে। ওস্তাদ ঝাঁকসা উঠে দাঁড়ায়। ...ওঠ, ওঠ সবাই।

ভেবে আর কী হবে রে বাবা! যে পথে হাঁটছি, ওই পথেই মৃত্যু হোক—পথ বদলালে ডাঙায় তোলা মাছের মতন ধড়ফড় করে মরব হয়ত। জয় মা বাকবাদিনী কী জয়!

লোকগুলো অস্ফুট কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে দাঁড়ায়।

ফজল রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে বলে, খিল এঁটে শুয়ে পড়ুক ঘরে। আর বাইরে ক্যানে?

পাল্টা জবাব আসে। ...যে দোজখে যায়, সে যাক। আবার কথা ক্যানে?

ওস্তাদ ঝাঁকসা চাপা গলায় বলে, ফজলাটার ঘর যেমন, আসর তেমনি। ও ব্যাটা মানুষ হবে না কোনদিন। কপে হয়েই থাকল—কপে হয়ে মরবে। চাই কি আজরাইলের সঙ্গে মস্করা করে বেহেশতটা মাগনী মেরে দেবে! ব্যাটা খোদার খাসি কাঁহেকা।

সবাই হাসতে হাসতে পথে নামে। মিঠিপুরের সেই 'কাঁনাপুকঁড়ে' ছোকরাটা এতক্ষণ ঝুপসি হয়ে মন মরা বসেছিল একান্তে। এবার মাথা থেকে কম্ফোর্টার খুলে অকারণ জ্যোৎস্নায় বেণী বাঁধা চুলের গোছাটা হাত দিয়ে টানে। বুকের দিকে ফেলে রাখে। মেয়েলি ভঙ্গিতে শরীরটা একটু দুলিয়ে সে ওস্তাদের পাশে পাশে হাঁটে। ওস্তাদ তবু তার দিকে লক্ষ্য করছে না জেনে সে একটু ছ্যাবলামি করতে চায়। বলে, আমাকে বুঝি মনে ধরছে না ওস্তাদজি?

কে? চমকে উঠেছে ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকার। ...

আমি ভানু গো, ভানু। আপনার নতুন মোহিনী।

চাপা গজ গজ করে ওস্তাদ। ...ধুস্ শালা! সামনে চল্ রে, সামনে। আমার চোখে টোক্কর খেয়ে পড়বি নাকি? মাদ্দী কুন্‌ঠেকার (কোথাকার)! শালাদের দেখলে ঘেন্না করে, আবার দুঃখও লাগে।

এ বদরাগী লোকটার কাছে ছোকরা টিকবে কেন? অভিমানে আহত ভানু একটু পিছিয়ে গিয়ে ফজলের সঙ্গ নেয়। ফজল ওর হাতটা ধরে হাঁটে। শান্তির নয়—তবু ছোকরার হাত তো বটেই। শীতের পথে আলকাপওয়ালাদের এইটুকুই যা উত্তাপ।

কখনও জ্যোৎস্না কখনও ঘনছায়া—জনা দশ মানুষের পায়ের ধুপধাপ শব্দ উঠছে ঠাণ্ডা ধুলোয়। এত নীরবতা আর চারদিকে। কোথাও কোন শব্দ নেই ওই পথ চলার সামান্য শব্দটুকু ছাড়া—যেন ঘুমন্ত নিঃঝুম নির্জন পাড়াগাঁয়ের হৃদস্পন্দন। ওরা আলকাপের মানুষ। রাত যত গভীর হোক, পথ হোক যত দুর্গম, ঋতু হোক বিরূপ—তবু স্বভাবে ওরা তুখোড় আর হুল্লোড়বাজ। চলতে চলতে ওরা গান গায়, কোমর দোলায়, পথেই কাপের ভাষায় কথা বলে। ওদের নাটুকেপনা হাঁ করে চেয়ে দ্যাখে জনপদবাসীরা। ওদের রসিকতা শ্লীলতার চোখরাঙানি আদালতি হুকুম মানে না। দিনদুপুরে পথের ওপর হিসি পেলে, শিশুর মতো সবার চোখের সামনে সে কাজ সারতেও অনেক তুখোড় আলকাপওয়ালা পিছপা নয়। আর এমন সব শান্ত স্তব্ধ ঘুমন্ত রাত পেলে ওদের তো ষোলকলা পূর্ণ। চেঁচামেচি করে সবার ঘুম ভাঙিয়ে পথ চলে। চকিত বিরক্ত গেরস্থ মানুষ একটু পরেই বুঝতে পারে, হুঁ। আলকেপেরা যাচ্ছে!

সেই স্ফূর্তিবাজ লোকগুলো আজ বিমর্ষ। শান্তি নামক তাপকুণ্ড না থাকাটা আজ এত স্পষ্ট যে, ক্রমাগত শীতের আঙুল ওদের শরীরকে নীল করে ফেলছে। ওরা টের পাচ্ছে কী ছিল কী হারিয়েছে!

ওস্তাদ ঝাঁকসা কখন দলের পিছনে পড়ে গেছে।

সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। শূন্য আখের ক্ষেতে শুকনো 'আলসে'র (আখপাতার) স্তূপ। সরু আলের ওপর মিয়ানো ঘাস আর গন্ধ গোয়ালের কচি নরম ঝাড়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে। সামনে অন্ধকার আমবাগানের ঘনছায়ায় আগের লোকগুলো সেই মাত্র অদৃশ্য হল।

চুপি চুপি পালিয়ে যাবে বাড়ি? দেখে আসবে গঙ্গামণি এখন কী করছে? হয়ত গিয়ে দেখবে ...

হ্যাঁ, কতকিছু দেখা সম্ভব গঙ্গামণির ঘরে। এইসব নিস্তাপ নির্জন রাতে তার ঘরে রঙের বাসর। এই তো স্বাভাবিক। এই তো সহজ আর প্রকৃত কথা গঙ্গার মত মেয়ের। তিন মাস আগে সেটা আঁচ করা উচিত ছিল—করেনি। মানুষ এত নির্বোধ হয়ে পড়ে হঠাৎ। গঙ্গার মত যুবতী তার প্রেমে—তার মোহে পালিয়ে আসেনি। এসেছিল যার জন্যে—যা সিদ্ধ করতে, তা বেশ জানা গেল।

কালুপাহাড়ির কার্তিক সংক্রান্তির মেলায় তিনরাত্রি বায়নার আসর গেছে। যে বাড়ি আড্ডা, তার পাশের বাড়িতে গঙ্গামণি থাকে। বুড়োমত এক মাস্টার—সেই আবার দলপতি গঙ্গার। শুধু এটুকুই জানাশোনা—তার বেশি নয়। প্রথমে আলাপ শান্তির সঙ্গে। শান্তি এসে বলেছিল, আজ দুপুরে আমার নেমন্তন্ন গঙ্গাদির কাছে। ব্যস, তারপর শান্তির মারফত আলাপ-পরিচয়। আড্ডায় আসা-যাওয়া। নিলাজ আসরচরানি মেয়ে, লোকে তার স্বভাব বিলক্ষণ জানে। এসে বলে, ওই গানখানা শিখিয়ে দেবেন ওস্তাদ?

মাজাঘষা ছিমছাম চেহারা। রঙটা ফরসা। ডিমালো মুখ, পুরু নাকে নাকছাবি, ছোট্ট কপাল আর মাথায় ঘন কালো চুলের ঝাঁপি। হাঁটলেই ধরা যায় এ মেয়ে নাচের মেয়ে। চলে আসবার দিন দুপুরবেলা তাকে দেখবার জন্যে মন আনচান করে উঠেছিল ওস্তাদের। শান্তি টের পেয়েছিল সেটুকু। চাপা গলায় বলেছিল, গঙ্গাদি শুয়ে আছে ঘরে। ঘুমোচ্ছে—নাকি শরীর খারাপ।

কালুপাহাড়ি থেকে গান সেরে ওরা স্টেশনের দিকে আসছিল। কেউ লক্ষ্য করেনি পিছনে, অনুসরণ করছিল বাঘিনীর মতো ওই ঢপের দলের যুবতী। স্টেশনে এল, টিকিট কেটে গাড়িতে উঠল, দেখল এককোণে গঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ধনঞ্জয় সরকার ভেবেছিল, কোথায় যাচ্ছে বুঝি। একটু ইতস্তত করে শুধিয়েছিল সে, কোথায় যাওয়া হবে গো ঢপওয়ালি? গঙ্গা একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মাত্র।

ট্রেন চলেছে নলহাটি হয়ে আজিমগঞ্জ। ফের গাড়ি বদল। গাড়ি এবার চলেছে উত্তরে। দলের লোক উসখুস করছে। শান্তি গল্পে মেতে রয়েছে ফজলের সঙ্গে। গঙ্গা তখনও সঙ্গে।

ট্রেন থামল জঙ্গিপুর। ঘোড়ার গাড়ি করে সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে ধনঞ্জয় সরকার

তখন গঙ্গাকে খুঁজছে। গঙ্গা নেই। হঠাৎ অদৃশ্য হল কোথায়? নাকি এই দীর্ঘপথ রাতজাগা চোখে একটা ভুল দেখে আসছিল!

রিকশা করে একটু এগিয়েছে। হঠাৎ সামনে ঝোপের আড়াল থেকে গঙ্গার উদয়।

...থামুন, থামুন। আমি কি হেঁটে যাব নাকি?

আরে! তুমি—তুমি কোথায় যাবে ঢপওয়ালি?

আপনারা যেখানে যাবেন।

তুমি—তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে?

থাকব।

ছি, ছি। লোকে কী বলবে?

গঙ্গা নীরবে কাঁদছে দেখে ধনঞ্জয় সরকার চুপ। কতক্ষণ পর একটা হাত ওকে বেড় দিয়েছে। হাতে আশ্বাস ছিল। মনে মনে বলেছে, তাই তো গঙ্গা, আমি ওস্তাদ মানুষ—ঘরে দুই স্ত্রীলোক—আমার ঘরে বড় কাঁটার জ্বালা। তোমাকে কোথায় রাখি। এ এক সমস্যা বটে। ...

রাখবার জায়গা হয়ে গেল শেষ অব্দি। ভক্ত আর চেলারা মিলে ঘর বানিয়ে দিল। সমাজ যদি বা বিমুখ, আপনজনের সংখ্যা কম নয়—তাদের সাহসে সাহস।

আর 'এ ধরিত্রীর নাম সর্বংসহা।' আসরে দাঁড়িয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে একথা। 'ভূমণ্ডলে সব সয়। পাপ সয়, পুণ্য সয়। আলো সয় যেমন, তেমনি আঁধারেরও স্থান আছে হেথা।' ...অতএব ছোট্ট পাড়াগাঁ ধনপতনগরও সব সইল। সামান্য কয়েকটি দিনেই অচেনা বিদেশি নতুন গাছটা এর অনেক গাছপালার ভিড়ে তাদেরই একটি হয়ে উঠল। গঙ্গা বদলেছে যেমন, তেমন পড়শিরাও বদলেছে। বন্ধুর শেষ নেই তার। সবাই মিলে দলবেঁধে নদীর ঘাটে জলকে যায়, জলে সাঁতার কাটে।

ওরা ধনপতনগরে 'চাঁই' সম্প্রদায়ের মানুষ। কোন পুরুষে ওরা এসেছিল বিহারের অনুর্বর এলাকা থেকে। গঙ্গার দুপারে সতেজ উর্বর প্রাণময়ী মাটিতে নতুন বসতি করেছিল। ওরা নিজেদের মধ্যে 'খোট্টাই' বুলিতে কথা বলে—আবার বাংলাও বলে। ভাগীরথী যতদূর গেছে এ জেলায়, দুই পারে এখানে ওখানে ওদের গ্রাম। শাক-সবজির চাষবাস আছে। মেয়ে মরদ সবাই মিলে তরিতরকারি ফিরি করতে যায় গাঁওয়ালে। হাটে বাজারে যায়। গরিব-গুর্বো অভাজন মানুষ সব—কবে বিহার থেকে দলে দলে এদিকে চলে এসেছিল পেটের দায়ে। এখন কয়েক জন্মের পর মনে-প্রাণে আচারে-বিচারে ওরা বাঙালি! কত আলকাপের ওস্তাদ ছোকরা বা সঙদার ওদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

তাদের মধ্যে গঙ্গার মতো মেয়ে কেমন মানিয়ে গেল দেখে ধনঞ্জয় সরকার কম অবাক হয়নি। এমন কি খোট্টাই বুলিতে ওকে দিব্যি কথা বলতে শুনে তার তাক লেগে গিয়েছিল। এ মেয়ে সামান্য নয়।

তবে কথা কী, নিশ্চিন্ত একটা নতুন আলোর ছটা এসেছিল জীবনে। কমলবাসিনী—তারপর সুখলতা, ঘরের দিকে। কেউ টানতে পারেনি ওস্তাদ ঝাঁকসাকে। টান দিচ্ছিল এই গঙ্গামণি। বুঝি তারও একটা নিশ্চিন্ত ঘর—একটা নির্দিষ্ট

আশ্রয়ের দরকার ছিল। ছিল এক অব্যক্ত নারীর ক্ষুধা ইহজীবনে। অনেক আদরে অনেক ভালবাসার তাপে একটা ওমভরা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। তার স্বাদ ওস্তাদ পাচ্ছিল সবে। ভাবছিল, এই তো পঞ্চাশ এসে গেল, চুলে পাক ধরেছে, যথেষ্ট হল দিগ্বিজয়—এবার সব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসবে ঘরে। রাত জাগতে আজকাল বড় কষ্ট হয়। শরীর অপটু হয়ে উঠেছে। গলা মাঝে মাঝে বেইমানি করছে। আবার কী! সংসারের অন্য মানুষের মত সহজ-সরল জীবনে মাছ হয়ে খেলা করার দিন এসে গেল। সেই যে বন্যেশ্বরের মেলায় গেয়ে এল—

(আমি) মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে—
(আমার) এমন জনম আর কী হবে।
সাঙ্গ হল দেখা শোনা চুকিয়ে দেব লেনাদেনা
(এত) দেখেও তো দেখা হল না
তল পেলাম না ডুবে
(আমার) এমন জনম আর কী হবে।

...অধিক আশা বৃথা। তাই মন এবার, তল্পী তোল, চল যাই ঘরের পানে। আর বাঘা লোকটি বেশ মজার। তক্কে তক্কে থাকে। ওই সময় কথার অন্তে জোরসে বাঁয়ার তবলায় একবার ডুড়ুম বাজিয়ে দেয়। সেই ডুড়ুম যেন বিধাতার আওয়াজ—উত্তম! চমৎকার কথা ভাই রে!

গন্ধগোয়ালে আর হাতিশুঁড়োর নরম ভিজে ঝাড়ে পা ডুবিয়ে মধ্যরাতে তন্ময় লোকটা হঠাৎ চমকে ওঠে। বুকে চাপা গুরুগুরু ধ্বনি—বাঘা মিয়া খলিফা যেন তবলা বাঁয়ায় লহরা চালিয়েছে। এক্ষুনি শুরু হবে আসরটা—চারপাশে হাজার উন্মুখ সতর্ক মানুষ। ...

জোরে নিজেকে নাড়া দেয় ওস্তাদ ঝাঁকসা। ঘর কেন, ঘরে কী দেখবে, কী কৈফিয়ত নেবে—ঘর মানেই আসর, আসর ঘর এক হয়ে আছে সংসারে, একটা বিম্ব অন্যটা প্রতিবিম্ব। হাতে আলকাপের আয়না। মানুষের মুখ কতবার দেখা হয়ে গেল জীবনে। তবে, তা দেখল কে? দেখল অন্যে, নিজে তো দেখেনি। নিজে দেখার দিন এসে গেল।

লম্বা পা ফেলে প্রায় দৌড়ে ছায়ায় গিয়ে ঢোকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ডাকে, ফজল—ফজল রে! ফজল কই?

ফজল পিছিয়ে আসে। এই তো আছি ওস্তাদ।

আছিস! ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে। শোন ফজল। আজ একটা নতুন কাপ দেব আসরে। এইমাত্র মাথায় এল। এক কুলটা অসতী নারীর পালা। ধর এক রাজা—মস্ত রাজা, তার রাজ্যের সীমানা নাই সসাগরা বসুন্ধরা মাঝে—ঘরে তার দুই রানী, সে রাজা গেল মৃগয়ায়, চক্ষে দেখল এক অপরূপা সুন্দরী, ভুবনমোহিনী বিদ্যাধরী কি কিন্নরী—সঙ্গে তুই কোটাল, বিবেকের মত সাবধান করছিস—মুখোশ খুলে দিচ্ছিস হারামজাদি বেশ্যার ...

ধনঞ্জয় সরকারের কণ্ঠ মেঘের মত বাজে। দলশুদ্ধ থেমে কান পেতেছে।

ফের শান্তস্বরে সে বলতে থাকে। ...ঘরে ছিল রাজপুত্র—রূপবান। শয়তান মাগী তাকে ভুলাল—পুত্রসম কুমারকে ... তা'পরে কিনা ...

ফজল একটু ভেবে বলে, পুত্র?

হ্যাঁ, পুত্র।

ক্যানে, ধরুন যদি অন্য কেউ হয়—ক্ষতি কী? পুত্র হওয়াটা ...

অমানুষিক কণ্ঠে গর্জে ওঠে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ... চোপ শালার ব্যাটা শালা কাঠব্যাঙ! তুই ওস্তাদ, না আমি বে? আমি ওস্তাদ জন্মদাতা—আমি বলি পুত্র, হ্যাঁ আমারই পুত্র, আমারই স্ত্রীলোককে সে নষ্ট করল।

লোকটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল কেন ফজল বুঝতে পারে না।

ঝাঁকসুর দল এসেছে শুনেই সারা মেলা একেবারে নড়ে ওঠে। গোপাল ওস্তাদের আসর চলেছে তখন। সবে একটা কাপ বা পালা জুড়েছে, জমে উঠেছে আসর। গোপাল আবার নিজেই ভাল সঙাল—উঠে দাঁড়ানো মাত্র আসর প্রস্তুত হাসবার জন্যে। কিন্তু আজ পাল্লা এক প্রখ্যাত ওস্তাদের সঙ্গে—পদ্মার এ পারে যার নাকি জুড়ি নেই। সুতরাং সে আজ আর লোকহাসানোর সস্তা ভূমিকায় নেই। সঙ্গে এনেছে এলাকার এক নামকরা সঙাল—জাগু কপে। ফজলের মত দুর্ধর্ষ সঙালের বিপক্ষে আসর রাখবার ক্ষমতা তার ছাড়া নেই কারও! কাপের শুরু তাকে দিয়েই। উঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে সে বলেছে, আজ বাঘের সঙ্গে সিংহের লড়াই ভাই সকল! তবে আমি কিনা বাঘের সেই ফেউ। নাম মহম্মদ জাগিরুদ্দিন, আদর করে আপনারা দশজনায় নাম দিয়েছেন জাগু কপে—কথায় বলের, বাঘের পিছে ফেউ ডাকে। আমি বাঘেই আগেই ডাকতে এলাম, হুঁশিয়াব! ঢ্যাঙা লিকলিকে চেহারা লোকটার। ছোট্ট মাথা। কিম্ভূত গোঁফ। দেখলেই বত্রিশ নাড়িতে হাসির চাপ লাগে। বকের মতো লম্বা পা বাড়িয়ে দলের লোকেদের ডিঙিয়ে ফাঁকা আসরটুকুতে পৌঁছানোর ভঙ্গি দেখেই হাসির ঝড় উঠেছে। শ্রোতারা গাছের মতো ভাঙছে দুলছে নড়ছে। ... তারপর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সে 'কাপের' (অর্থাৎ ব্যঙ্গরসাত্মক নাটকের) পালায় ঘোষণা করেছে, তবে আমার নাম আঁকাড়ি—সামান্য গরিব মানুষের ছেলে, ওপাড়ার ওই মোড়লের বেটির সঙ্গে ভাব, যাই এখন তার কাছে, দুটো মনের কথা কয়ে আসি। না কী বলেন আপনারা?

সোৎসাহে শ্রোতারা বলে ওঠে, ভাল ভাল।

আসরের ভিতরেই দলটা বাদ্যযন্ত্র ঘিরে বসে রয়েছে। সেদিকে ঝুঁকে সে ডেকেছে ওহে আমার প্রাণেশ্বরী 'গিদাম্বরী' আছ কি ঘরে?

গিদাম্বরী শুনে ফের হাসির ঝড়। নাচিয়ে ছোকরাটা হারমোনিয়ামের সামনে বসে ছিল। উঠে দাঁড়িয়েছে মাথার ঘোমটা ফেলে। বেণী দুলিয়ে কটাক্ষ আর চাপা হাসির ঝিলিক—অনেকের ঠাণ্ডা রক্ত একটুখানি উত্তাপ পায়। সেই সঙ্গে ভিড় থেকে কার চাপা মন্তব্য : থামো, থামো, শান্তি আসছে। তা শুনে নিলাজ ছোকরা সকৌতুকে বলে, আমারে বুঝি মনে ধরছে না কোন নাগরের। আমি কি শান্তি দিতে পারিনে হে বঁধু? শান্তি নামেই যদি শান্তি হয়, তবে আমি যে মধু! লোক বলে মধুবালা।

জাগু বলে, শানিতে এখন গঙ্গাজলে খাপি খাচ্ছে। এস এখন মধু খেয়ে দেখি। তুমি যে মধুর হাঁড়ি!

শ্রোতারা হাসে। ওস্তাদ ঝাঁকসার ছোকরা শান্তিচরণকে তারা ভালই চেনে। গঙ্গার ধারে ধনপতনগরে ওদের বাস—তাও জানে তারা। আর মধুসূদন ছোকরা যে জাতে হাড়ি—সেও জানা। তাই এত হাসি।

... আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে ভিড়ের শেষপ্রান্তে দাঁড়ানো লোকের জটলা থেকে আস্তে আস্তে একটা লোক সরে যায় তফাতে! ওস্তাদ ঝাঁকসা! কেবল নাকটুকু বের করে দাঁড়িয়ে ছিল। সদ্য এসেই আসরের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল সে। দলবল মেলার প্রান্তে চটের তাঁবুতে ঢুকেছে যথারীতি। ওই তাদের সাজঘর। ঝটপট সাজতে বসেছে ভানু। ওস্তাদ ঝাঁকসা অভ্যাসমত পর্যবেক্ষণে এসেছে এখানে। তারপর ওই কথা। 'শান্তি এখন গঙ্গাজলে খাপি খাচ্ছে।'

একটু তফাতে গিয়ে সে ফিস ফিস করে ওঠে, শালা কুত্তার বাচ্চা! ..আলকাপ যে আকথা কুকথা নয়, তা ওরা এখনও বোঝে না। বাজে কুচ্ছিত ভাঁড়ামো করে গেঁয়ো বলে শেয়ালরাজা সেজেছে। যেতে যদি ভদ্রসমাজের আসরে, শহরে বাজারে মহাজন মানুষের ঠাঁই, আলকাপ ছেড়ে কাস্তে হাতে পাট কাটতে হত সোজা!

ওস্তাদজী!

চন্দ্র জুয়াড়ি কাঁধে হাত রেখেছে। ...একেবারে ছদ্মবেশ যে! তবে নাক দেখেই চিনেছি। হা হা করে হাসে সে। বেঁটেখাটো ভুঁড়িওয়ালা মানুষ, মাথায় টাক, মস্তো গোঁফ। সার্জের খয়েরী পাঞ্জাবি, দামী শাল, আঙুল ভরতি আংটি—চন্দ্রমোহন টানতে টানতে নিয়ে যায়।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, ভাল আছেন চন্দ্রবাবু? সেই ভুবনপুরের মেলায় শেষ দেখা।

হ্যাঁ। মধ্যে ছটা মাস কী ঝড় যে বয়ে গেল। সে বলব'খন। আসুন, আমার ঘরে আসুন। চন্দ্রমোহনের ঘর মানে করগেট টিনে ঘেরা দুর্ভেদ্য দুর্গ। মেলার শেষ প্রান্তে একেবারে। ভিতরে খাটিয়া রয়েছে। দামী বিছানাপত্তর। গোটা দুই মোড়া। একটা ছোট টেবিল। তার ওপর টুথব্রাশ পেস্ট সাবান আয়না দাড়িকাটার সরঞ্জাম। দড়ির আলনায় কিছু জামা-কাপড় ঝুলছে। এক কোণে রান্নার স্টোভ বাসন হাঁড়ি গেলাস। বেশ পরিপাটি থাকে লোকটা। মোড়ায় বসতে যাচ্ছিল ওস্তাদ, চন্দ্র হাত ধরে টানে। ...আরে, এখানে বসুন। ঘরের মানুষ আপনি! ..পরক্ষণে হাসে। ঘর! 'ঘর না বৃক্ষের কাণ্ড—জলে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। তার কোটরে কোনরকমে থাকা। মাটির আর জীবনে পাব না রে দাদা!'

বিছানায় বসিয়ে দেয় ওস্তাদকে। স্টোভে সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠেছে। একটা লোক খুন্তি দিয়ে হাঁড়িতে কী নাড়ছে। সুগন্ধে টের পাওয়া যায়, মাংস। চন্দ্রমোহন বলে, নবা, হাঁড়ি নামা। চা করে দে ওস্তাদকে। ...থাক্, বাইরে থেকে এনে দে।

পয়সার বদলে স্লিপ। স্লিপ নিয়ে বেরিয়ে যায় নবা। বলে যায়, কষার সময়—নাড়তে হবে মাংস।

মোড়া টেনে স্টোভের সামনে বসে চন্দ্রমোহন। ভুরু কুঁচকে দুবার খুন্তি নেড়ে এদিকে মুখ ফেরায়। ...মনমরা মনে হচ্ছে! হবারই কথা। ...হাসির চোটে দুলতে দুলতে সে বলে... একটাতে রক্ষে নেই—তাতে তিন তিনটে বাঘিনী ঘরে বাঁধা। কী সব কাণ্ড করছেন ওস্তাদ—হদিস পাওয়া ভার। এদিকে আমি শালা তো ভয়ে ছায়া মাড়াইনি অ্যাদ্দিন—বয়স ভাঁটিতে কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে!

একটু হাসে ওস্তাদ ঝাঁকসা। কেন, আপনার সেই সৌদামিনী কী হল? আসেনি এ মেলায়?

সদু! ...চন্দ্রমোহন কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। এসেছে। যাবে কোন চুলোয়। ওদিকে দোকান দিয়েছে। ছাড়ুন ওসব চুড়িওয়ালীদের কথা। আপনার কথা বলুন।

আমার আর কী! আছি, এই মাত্র।

আপনার শান্তি এবার দেখা করতে এল না তো? নাকি সাজতে ব্যস্ত? দেরিও হয়েছে বটে।

শান্তি নেই। পালিয়েছে।

খুন্তি নাড়া হাতটা থেমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ...পালিয়েছে? সর্বনাশ! তাহলে গান করবেন কেমন করে?

ওস্তাদ ঝঁকসা আস্তে আস্তে বলে, কেন চন্দ্রবাবু? শান্তি ছাড়া কি ওস্তাদ ঝাঁকসা এমন অক্ষম যে আসর চালাতে পারবে না?

নিরাশ কণ্ঠস্বরে চন্দ্রমোহন বলে, না—কথাটা তা নয়। মানে, মেলাখেলার শ্রোতা—একটু ফুর্তি-ফার্তি চাই কিনা! এতো আপনার চ্যাংড়ামির আসর—গাঁয়ের বাইরে একেবারে। যত রঙ ঢালবেন, তত জমবে। বউঝিরা নেই, ভদ্রজন নেই—একেবারে বেলেল্লা মানুষ সব। ...কিন্তু পালালো কেন?

ওস্তাদ ঝাঁকসা হাসে। এতো নতুন কথা নয় চন্দ্রবাবু। এলাকায় আপনার চলাফেরা—জীবনটা কাটিয়ে দিলেন এক রকম। আলকাপের খবর আপনার তো সবই জানা!

চিন্তিত মুখে চন্দ্রমোহন বলে, দেখুন, আপনার দায়িত্ব আপনারই। আসর না রাখতে পারলে আসরে লোকসান হয়ে যাবে কিন্তু। লোক হবে না মেলায়।

বেশ তো! না পারলে চলে যাব। আরো ভাল দল আনবেন... বলে ওস্তাদ ঝাঁকসা উঠে দাঁড়ায়।

খুব অবাক লাগে তার। শান্তিই কি ছিল তার একমাত্র শক্তি? শান্তি ছাড়া ওস্তাদ ঝাঁকসার গান শুনবে না লোকে? পা বাড়ায় সে। চন্দ্র জুয়াড়ির চা সে খাবে না।

চন্দ্র মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে আরে! ও ওস্তাদ! রাগ হল বুঝি? কী মুশকিল! আমার হয়েছে শতেক জ্বালা—

উঠে এসে হাত ধরে টানে সে। ...বড় ভাবুক লোক মশাই আপনি! আমি তাই বলছি নাকি বসুন, বসুন!

ওস্তাদ ঝাঁকসাকে বসতে হয়। ভারি মিঠে ব্যবহার এই চন্দ্রমোহনের। কার সাধ্য এখন টের পায়, এই লোকটা মানুষকে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে বেড়াচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তর? কে বুঝতে পারে, দরকার হলে এক্ষুনি এই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এক সাক্ষাৎ শমন।

নবা চা দিলে নীরবে খায় ওস্তাদ। চন্দ্রমোহন নিজে চা খায় না। ও যা খায় তার নাম কারণসুধা। হেঁট হয়ে খাটিয়ার নীচে থেকে একটা বোতল বের করে সে। একটা কাপে ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে নেয়। গোঁফ মুছে বলে, মাংসটা নামুক। আসরে যাবার আগে এখান হয়ে যাবেন। বিলিতি জিনিস কিন্তু। ...হল? চলুন—সলিমকে দেখি! ফতেগঞ্জ থেকে লোক এসেছে নাকি। পরের মেলা ওখানেই বসানোর ইচ্ছে আছে। এখানে মাত্র পনের দিনের লাইসেন্স।

ভিড়ে হারিয়ে যায় ব্যস্ত চন্দ্রমোহন। ওস্তাদ ঝাঁকসা একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে টইটুম্বুর উচ্ছ্বসিত আসর চলেছে। জোর জমিয়েছে গোপালের দল। বাইরে পৃথিবীতে এখন নিশুতি রাত। প্রচণ্ড শীত আর কুয়াসায় জ্যোৎস্নার রঙও নীলচে হয়ে পড়েছে। বাইরে পা বাড়ালেই রক্ত জমে যায় যেন। এখানে উজ্জ্বল আলো আর প্রচুর উত্তাপ। হল্লা। উত্তেজনা।

ভালো লাগে না কিছু। এই শীতের রাতে নির্জন কোন ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ওদিকে জাগু 'কাপ' দিয়ে চলছে।

গাঁয়ের দুষ্টু ছেলে আঁকাড়ি—বাবা-মা তার বিয়ে দিচ্ছে না। তাই একদিন সে বাবা-মাকে জব্দ করতে চায়। মা যখন ঘরে নেই—বাবাকে ডেকে বলে,

বলব কী আর দুঃখের কথা, পিতা
মা মজেছে নানা রঙ্গে
ওপাড়ার এক মোড়লের সঙ্গে
কইছে কথা, পিতা ......

বাবা তা শুনে মালকোঁচা মেরে খেঁটে হাতে ছুটে গেল। গোপাল ওস্তাদ সেজেছে বাবা। ছুটে যাওয়া মানে অল্পপরিসর আসরেই এদিক থেকে ওদিক ছুটোছুটি—অবশ্য সেটা নাচের ছন্দে, দ্রুত হেঁটে চালার ভঙ্গী সেই নাচে, নীচে হারমোনিয়ামে—তবলায় 'চালান' বাজছে। 'চালান' দৃশ্যান্তরও বোঝায়। বিরতি বোঝায় (যেমন রেডিওর 'ফিলার')। গোপাল বসল। এবার দ্বিতীয় দৃশ্য। অর্থাৎ ফিল্মের ফেড আউট ফেড ইন ঢঙে ছেলেরূপী জাগু উঠে ডাকল মাকে—

বলব কী আর দুঃখের কথা, মাতা
বাবা মজেছে নানা রঙ্গে

ওপাড়ার এক ছুঁড়ির সঙ্গে
কইছে কথা, মাতা...

শুনেই মা ছোটে। মা সেজেছে একটি গুঁফো লোক—দলেই দোহারকি করে। চাদরটা এমন করে দ্রুত জড়িয়ে নিয়েছে, হঠাৎ দেখলে গাঁওবুড়ি ভ্রম হবে। মুখটা যথাসম্ভব ঢেকেছে—তবু গোঁফ দেখা যায়। যাই হোক—এখন আসরে সেই মা। আলকাপের রীতিই এই। ...এবার উঠল বাবা। ....কই দেখি সে মাগী কী করে! ব্যস। দুটিতে মুখোমুখি। পরস্পর দোষারোপ! গালিগালাজ। পরে সব জল হয়ে যাওয়া। ছেলের কীর্তি। অতএব বিয়ের যোগাড় করতেই হয়।

জমিয়ে দিয়েছে গোপালের দল। অশ্লীল ধরনের একটি উত্তেজনা ফেটে পড়ছে আসরে। বড় কটু লাগে ওস্তাদ ঝাঁকসার। ওরা এখনও বড্ড সেকেলে। পদে পদে অশ্লীলতা করে। অমার্জিত ভাষা! চাষাড়ে ইতরামি শুধু। কিন্তু আশ্চর্য, তবু লোকে প্রতিবাদ করছে না—বলছে না,—ভাল কিছু শোনাও ওস্তাদ—যাতে জ্ঞান বাড়ে, শিক্ষা হয়, 'অমল বিমল রসে' মন মজে।

হয়ত এইটাই নিয়ম। যখন যা সামনে জাঁকিয়ে আসে, তাতেই মজে যায় অবোধ শ্রোতা সাধারণ। ওস্তাদ ঝাঁকসা উঠে যখন বলবে, বাবাসকল, এ কি না লোকশিক্ষার বাহন, তখনও হয়ত বলে উঠবে, ভাল, ভাল, বেশ! চালাও ওস্তাদ, চালিয়ে যাও।

লোকের মতিগতি বোঝা সহজ নয়। বড় অবাক লাগে। দুঃখ হয়।

আসরে যাবার সময় হয়ে এল। ভানুর সাজ শেষ হল কিনা দেখতে হয়। পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, গঙ্গামণির কথা। খুবই অকারণ। নাকি কারণ একটা ছিল।

লোকশিক্ষার বাহন কথাটা মাথায় আজ গভীরভাবে বসে গেছে। এক বিশ্বাসঘাতিনী নারীর কাপ দেবে বলে তৈরি হয়েছে না সে? জনসমাজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে, বন্ধুগণ, সাবধান, হুঁশিয়ার—রূপের ফাঁদ পেতে যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে এক রাক্ষসী। শুধু চোখে দেখেই মজো না। গুণ খোঁজো। পরীক্ষা করে দেখ, মিথ্যা না সত্য, আসল না নকল...

গঙ্গা—গঙ্গামণিও পালিয়ে যায়নি তো? গঙ্গাতীর থেকে আর ঘরে ফেরেনি ওস্তাদ। সোজা চলে গেছে ফজলের বাড়ি মিঠিপুরে। কোন খবর তো নেওয়া হয়নি।

যাক। ওর না থাকাই ভাল। গিয়ে যদি ঘর শূন্য দেখে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে। কুলটা নারী সাক্ষাৎ সাপিনী। চলে যাক—আরও যদি কিছু যাবার থাকে, যাক। ধনঞ্জয় সরকার আর ঘরে ফিরছে না। চন্দ্রমোহনের মতোই মেলা থেকে মেলায়, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে জীবনটা কাটিয়ে দেবে তারপর হয়ত কবে একদা, কোন আসরে দাঁড়িয়ে, কানে একটি হাত রেখে অভ্যাসমত রাগিণী ভাঁজছে—হঠাৎ অন্য কানে অদৃশ্য শমন এসে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, চলে আয়! ব্যস, আবার কী! দেহ রেখে ধনপতনগরের ধনঞ্জয় সরকার চলে যাচ্ছে, পিছনে জমজমাট আসর—মায়াবী মোহিনী, বাদ্যযন্ত্র আর সঙদার রইল পড়ে। তারপর কী হবে? কোথায় যেতে হবে? নরকে নয়ত? চমকে ওঠে হঠাৎ।

মনিরুদ্দিন ওস্তাদের যোগ্য ছাত্র এই ধনঞ্জয় সরকার। মনিরুদ্দিন গত বছর মারা গেছে। কালুখাঁর দিয়াড়ে তার গোর। গোরের শিয়রে কাঁটামাদারের গাছ। গ্রীষ্মে রক্তলাল ফুল ধরে থোকায় থোকায়। মাঝে মাঝে গিয়ে চুপিচুপি সেলাম দিয়ে আসে বিমুগ্ধ সাগরেদ। পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ ফেটে জল বেরোয়। ওস্তাদজী; তুমি বলেছিলে, এ পথ পাপের পথ—এ নেশায় বড় গোনা (পাপ)। বড় যন্ত্রণার জীবন আলকেপেদের। তুমি এপথ ত্যাগ করতে বলেছিলে। পারছি না—তোমার আদেশ অমান্য করেছি। তুমি আমাকে মাফ করো ওস্তাদজী।

শেষ জীবনে অবসরের দিন। মনি ওস্তাদ তখন গান ছেড়ে মৌলানার কাছে তৌবা করেছে। শরীয়তে মন দিয়েছে। পাঁচ অক্ত নমাজ পড়ে কপালে চামড়ায় ছোপ ধরেছে। মসজিদ ছেড়ে বেরোয় না সে। খোদাতলার কাছে কান্নাকাটি করে। ছোট্ট জানালার ধারে মুখ রেখে ধনঞ্জয় সরকার চুপি চুপি ডেকেছে। ওস্তাদজী!

ভিতর থেকে স্থবির অজগর সাপ ফোঁস করে উঠেছে, চুপ, চুপ, ওনামে কেউ নেই এখানে। ও আল্লার ঘর—মুসল্লীর ঠাঁই।

...ওস্তাদজী, গঙ্গাপার রাতের দেশে বায়না। যাবার আগে আশীর্বাদ চাই।

...ঝাঁকসু! বেটা, হাদিস কোরাণে আছে—সাদ আর গোমরাহ্ নামে ছিল দুই শহর। সেখানে পুরুষ পুরুষের পিয়ারা, দিলের রওশন—হৃদয়ের বাতি। পুরুষলোক পুরুষলোককে আউরতের মত ভালবাসত। তার পরিণামে কী হল? দুটো শহর আল্লার হুকুমে গায়রত হল—ধ্বংস হয়ে গেল। এ গোনাহ্র মাফ নাই বেটা। পরিণামে জাহান্নাম—দুনিয়ার আগুনের আশিহাজার গুণ তেজী সে আগুন...

নাঃ, মনি ওস্তাদ নয়। এ এক মৌলানা—মুসলমানের গুরু। এর ভাষা ভিন্ন, অবোধ্য। কোথায় গেল সেই মনি ওস্তাদ—হিন্দুর বেদপুরাণ যার কণ্ঠমূলে বাস করে, মাথায় সন্ন্যেসীদের মত লম্বা চুল, চাঁছা গাল, ধারালো গোঁফ, বেড়ালের মত পিঙ্গল চোখ, গৌরবর্ণ ছিপছিপে গড়ন, ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরে আসরে দাঁড়ায় করজোড়ে, যেন সভা কবি!

সেই লোকটা পাপ ভয়ে কাঁদছে। বলছে, পুরুষকে নারী সাজিয়ে লক্ষ মানুষের মনে নেশা ধরিয়েছি—নিজেও মজেছি সে নেশার ঘোরে—এ পাপ মহাপাপ। অনন্ত জাহান্নাম সামনে জ্বলে। গায়ে আঁচ লাগে।...

লাগে, লেগেছিল। আলকেপেরা টের পায় ও কী জ্বালা! খুব কাছেই যে বিশাল আগুন। ফোস্কা পড়ে তাপে। অ-ধরাকে যত ধরতে চায়, দেখে রক্তমাংসের ক্লেদ, ব্যর্থতার গ্লানি। প্রতিমার গায়ে লোভের পাপী হাত আঁচড় কাটতেই বেরিয়ে পড়ে খড় আর বাঁশের পিণ্ড। ইষ্টদেবতা তো ওখানে নেই—তার বাস মনের মধ্যে। তাকে হাতের মুঠোয় পেতে গিয়েই তাপ লাগে। মোহ ভেঙে যা পড়ে থাকে—তা অশ্লীল। তার নাম সমকামিতা।

'সাদ (সডোম) আর গোমরা' জেগে উঠেছে পদ্মার এপার-ওপার। হুঁশিয়ার ভাইসকল! ...মহম্মদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাস ভুল বকে। ভুল বকতে বকতে মসজিদের

ঠাণ্ডা মেঝেয় চিরকালের মতো ঘুমিয়ে গেল একদিন। তার গোর দেবার অধিকার সেদিন মুসল্লীদের। দূর থেকে দলে দলে হিন্দু আর মুসলমান সাগরেদ শ্রদ্ধা জানাল মনে মনে।

...শরীরটা হিম হয়ে আসে আমবাগানের নীচে। ওস্তাদ ঝাঁকসার বুক কাঁপে দুরু দুরু। মনে পড়ে যায় ওস্তাদজীর কথা। হ্যাঁ, বড় সত্য কথা বলেছিলেন মনিরুদ্দিন বিশ্বাস। পুরুষকে মনেপ্রাণে নারীতে পরিণত করার কারচুপির ক্ষমা নেই। প্রতিশোধ নেন বিধাতা পুরুষ। শান্তি ওস্তাদের গঙ্গামণিকে অশুচি করেছে—এ সেই প্রতিশোধের খেলা মাত্র। বিধাতা দেখাচ্ছেন আঙুল তুলে।

বেঁচে থাকতে থাকতেই নরকের জ্বালা এল তাহলে! হতাশ ক্লান্ত ভীত লোকটা সাজঘরের দিকে হেঁটে যায় আস্তে আস্তে। বড্ড একা হয়ে পড়েছে বলেই কি এই সাত-পাঁচ এলোমেলো ভাবনার ঝড়—যেন কী আড়াল গেছে ঘুচে, এখন মাথা বাঁচে না দুর্যোগে?

প্রথমে হইচই, বিশৃঙ্খলা, তারপর সামান্য কিছুক্ষণ শান্ত সব—শান্তি নেই খবর তখন আসর জুড়ে মেলার ভিড়ে সবখানে গুঞ্জনিত। ভানুতে মন মজবার লক্ষণ নেই শ্রোতাদের। বয়সের যে সীমায় থাকলে তখনও মেয়ে বলে মেনে নিতে সাধ যায়—সে সীমা পেরিয়েছে ভানু। ফলে ওকে এখন বড় কদর্য লাগে। শান্তির মুখে অত ঘন পেন্টের দরকার হত না। সমান্য একটু সিঁদুর মেশানো ফে-া পাউডার স্নো মুখে বুলিয়ে নিলেই যথেষ্ট। ঠোঁটে আলতা, কপালে টিপ। একটা কৌটোয় কিছু জিংক অক্সাইড—হাতের চেটোয় নিয়ে কয়েক ফোঁটা জল মিশিয়ে বলেছে, ফজলদা, দেশলাই কাঠি দাও।

কাঠির ডগায় সযতেনে সাদা ফোঁটার অল্প দুটি আলপনা দু গালে, চিবুকে, কপালে। ওতেই ওর রূপ খুলে গেছে। বিলোল কটাক্ষ হানলেই তখন মূর্ছা যায় মনপ্রাণ।

খুব অল্প সাজগোজেই ওকে স্বাভাবিক মেয়ে দেখাত। ডাঁটাসো দুখানি নরম বাহু, নাচের ছন্দে দুলে উঠলে জন্ম নিত এক নাগরী নটী। বুকে কাঁচুলির বদলে দুটো ন্যাকড়া গুঁজে নিত সে। এমনিতেই ওর শরীরটা ছিল নাচের উপযোগী—সরু কোমর, ভারি পাছা, সুডৌল উর্ধ্বাঙ্গ। ও যেন বিধাতার একটু ভুলে পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়েছিল। শুধু কণ্ঠস্বরে ধরা গেছে, ও আসলে পুরুষ। কিন্তু কণ্ঠের এ বেইমানী ঢেকেছিল তার গান গাইবার ক্ষমতা, রূপের বিভ্রম।

আর ভানু পদে পদে ধরা পড়েছে যে সে পুরুষ। মুখে সফেদামিনার পুরু পেন্ট—সকাল হয়ে গেলে তখন কী বিচ্ছিরি না দেখাবে ওকে। বুকে ঠাসা বেমানান কাঁচুলি। চুলের খোঁপা আছে—শান্তির ছিল শুধু বিনুনী, যেন পাড়াগেঁয়ে বাবুবাড়ির মেয়েটি।

ভানুকে দেখাচ্ছে ধিঙ্গি বেশ্যার মত—অশ্লীল লাগে ওর হাসি, ওর দেহভঙ্গী, ওর কটাক্ষ। আসরে গুঞ্জন থামছে না। বিপক্ষের ছোকরা মধু শান্তির ঘাটতিটা বরং পুষিয়ে দিয়েছে। লোকে ওকে সিনেমার অভিনেত্রী মধুবালার নামে ডাকে।

তবে শুধু ছোকরা নিয়েই তো আলকাপ নয়। ভিড় থেকে ফরমাস ওঠে, কই হে ওস্তাদ, সঙফার্স দাও। খুব হয়েছে! চারদিকে নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছে।

ছোকরার গান শেষ হলে নিয়ম আছে কপে বা সঙাল উঠবে। ছোকরার সঙ্গে ডুয়েট গাইবে। দুজনেই নাচবে অবশ্য। ওরই ফাঁকে অল্পস্বল্প রসিকতা।

এবার ফজলের ওঠবার কথা। উঠল স্বয়ং ঝাঁকসা ওস্তাদ। এক কানে হাত রেখে অভ্যাসমত হারমোনিয়ামের সুরে গলা মিলিয়ে সে রাগিণী ভাঁজে। নিস্তেজ বিশৃঙ্খল আসরে একটা জোয়ার আসে যেন—দমকে দমকে, উচ্ছ্বাসে, ওই পদ্মার দুকুল ভাঙ্গা বন্যার জল।

ওস্তাদ ঝাঁকসা ধুয়া দিয়েছে ঃ

বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।।
(তোর) সোনার অঙ্গ করল ভঙ্গ রক্তধারায় লালে লাল।।
মনে করি হলাম স্বাধীন
আমরা মাগো চির পরাধীন—
হয়ে এখন বিশ্বের অধীন
অন্নবিনে নাজেহাল।।

আসর স্তব্ধ। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে শ্রোতারা। কাছাকাছি সব চাষাভুষো অভাজন মানুষ—দূরের পিছনের দিকে বেঞ্চে বা দাঁড়িয়ে বাবু-ভদ্রজন—নানা বয়সের নানা মেজাজের শ্রোতা। কেউ ফিসফিসিয়ে ওঠে, ধুস্ শালা! এ আবার কী লাগালে!

দুবার ধুয়াটা গেয়ে সমের মাথায় দোহারকিদের ছেড়ে দেয়। দ্রুততাল ওরা গাইতে থাকে। চড়া সুরে কয়েকজোড়া কত্তাল বাজে। বাঘা মিয়া তবলায় মেঘ ডাকায়। ক্ষিপ্র আঙুলগুলো ভেলকি দেখায় যেন।

সেই ফাঁকে একটু হাঁটে ওস্তাদ। চোখ বুজে পরবর্তী পদ বানিয়ে নেয়।

লাল মুখোরা গেছে চলে,

তবলচী খলিফা বাঁয়ার আওয়াজ দিয়ে বলে, বেশ ভাল ভাই!

ওস্তাদ একটু ঝুঁকে তালে তালে সোজা হয়ে ফের কলিটা ধরে—

লালমুখোরা গেছে চলে
সে কথায় যেওনা ভুলে
কালো মুখের তলে তলে
আড়াল থেকে ছড়ায় জাল।।
(এখন) দুই সতীনে চুলোচুলি

একটু হেসে কথায় বলে—সতীন কারা? না—এই হিন্দুস্থান পাকিস্তান।

দুই সতীনে চুলোচুলি
এর গালে চুণ (ওর) গালে কালি
চুলো নিয়ে বিবাদ খালি
ঘরের চালেই ধরায় জ্বাল
বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।।

এসব কী শুরু করল ওস্তাদ ঝাঁকসা? চারপাশে গুঞ্জন, ফিসফিস, চাপা মন্তব্য। আরে বাবা, রঙের আসর—রঙ লাগাও। সঙটঙ দাও, জমাটি কাপ দাও, শুনি।

...ভাই সকল! এ আলকাপ কি না লোকশিক্ষার বাহন। আমার গুরু ওস্তাদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাসের একথা। এ কি না এক আজব আয়না। আপনারা তাতে নিজের নিজের মুখগুলো দেখে নেন। খারাপ লাগলে বলেন, আরে ছ্যাঃ, এ হল ইতরজনের গান! আজ আমার বিপক্ষে এসেছেন সুযোগ্য পাল্লাদার গোপাল মাস্টার। মাস্টার কেন? না, ধনঞ্জয় সরকার পদ্মার এপারে এক মনিরুদ্দিন বিশ্বাস ছাড়া কাকেও ওস্তাদ স্বীকার করে না।...

ফের গুঞ্জন। এবার স্পষ্ট আসর—ফজলের ভাষায়, থিতোচ্ছে না।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, তবে আমার পাল্লাদার গোপাল। গোপাল যিনি, তিনি কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণ আর আমি—আমি ধনঞ্জয়—গাণ্ডীবধারী অর্জুন। তবে দুঃখের কথা ভাই, আজ গাণ্ডীব হাতে নাই। নিরস্ত্র। আর কৃষ্ণ, তোমায় সখা বলে মানি। তুমি হলে এ কুরুক্ষেত্রে আমার সারথি। তুমি আমায়...

লাফ দিয়ে ফজল উঠে বলে, তুমি আমার সহিস—ঘোড়ার ঘেসেড়া!

পলকে আসর ফেটেছে। হো হো হা হা হাসির তোলপাড়। ফজল বসে পড়ে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, আজ মনে বড় বাসনা গোপাল—প্রাণসখা কৃষ্ণর সঙ্গেই একবার যুদ্ধ করি। শ্রোতামহাশয়গণ। আলকাপের মধ্যে আছে পঞ্চরঙ। খেমটা আছে, নাটক আছে, তেমনি আছি কবিয়ালী। দুপক্ষে একটা আশয় বিষয় ঠিক করে দিন।

কে বলে, লে বাব্বা! কবি শুদ্ধ হবে নাকি? ...চারিদিকে ফের চাপা গোলমাল। বেঞ্চ থেকে কে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ঝাঁকসু, এ মেলাখেলার আসর। শাস্ত্রটাস্ত্র ভাল লাগবে না বাপু। তুমি বরং বিনি আশায়-বিষয়ে গাওনা করো। কাপ দাও—জমাটি কাপ একখানা!

লোকটাকে লক্ষ্য করে ওস্তাদ ঝাঁকসা। আরে! জমিদার বিষ্ণুবাবুর বড় ছেলে ষষ্টিবাবু! কী কাণ্ড দ্যাখো। মাতাল মানুষ। আলকাপের আসরে এসে রাত জাগছে। মনে মনে খুশি হয় সে—আবার খারাপও লাগে। হাত জোড় করে বলে, বাবুমশায়! আপনাদের বাড়ির ভিতরেও এ ঝাঁকসুর গান করবার সৌভাগ্য হয়েছে। আপনার পিতা এক গণ্যমান্য মানুষ। আপনারা তো জানেন, আমি আকথা-কুকথা অশাস্ত্রীয় কিছু গাই না!

গোলমাল বাড়তে থাকে। ঠিকই বটে। এ মেলার আসর। রঙ চাই। চাই তুখোড় বেলেল্লাপনা। ঘেমে ওঠে শীতের মধ্যে। মন কত যত্নে তৈরি হয়েছিল তত্ত্বকথা শোনাবে বলে। এরা সব শুঁড়িখানার মাতাল। তবে তাই সই।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কোমরে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে চাপা গলায় ডাকে, ফজল! লাগা সেই ঘাট-ডাকার সঙ!

হারমোনিয়ামে দ্রুততালে একটা সুর বাজায় পঞ্চানন। তবলা বাজে। কত্তাল বাজে। স্বল্প বিরতিকালের এ বাজনার নাম 'চালান'।

বাজনা থামতেই দুহাত তুলে চিৎকার করে ওস্তাদ ঝাকসা-ব্যস্ ব্যস্! তবে শুনুন। আমি এক গাঁয়ের মোড়ল। ঘরে আছে এক পালচরা ষাঁড়—হারামজাদা ছেলে, কাজ নেই কম্ম নেই, টোটো ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। তাকে ডাকি।

দম নিয়ে সে ফের বলে, গঙ্গায় একটা ঘাট ডেকে নিয়েছি জামিদারবাবু শ্রীবিষ্ণুচরণ রায় মশায়ের কাছে (বিনোদদিঘীর জমিদারবাবুর নামটাই বলে সে। তাতে রস পায় শ্রোতারা)। এখন, সেই ঘাটে নৌকো বইতে পাঠাব আমার অকম্মা ছেলেকে। কই রে বেটা, আছিস?

ফজল খালি গায়ে উঠেছে। বেঁটে কুষ্মাণ্ডসদৃশ দেহ। ডাগর মস্তো পেট। ইচ্ছে করেই একটু ফুলিয়ে রেখেছে। ধুতি কোঁচা কোমরে জড়ানো। ওর এতটুকু শীতবোধ নেই যেন। হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে, আছি হে আছি।

মোড়ল থমকায়, চোপ্ ব্যাটা! বাবাকে কেউ হে বলে নাকি?

ফজল একটুও না হেসে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে, বলে বৈকি। এ বাঘড়ী এলাকায় বাপকে মুসলমান ব্যাটায় বলে, বাজি হে, বাজি! হিন্দু বেটায় বলে, বাবা আছো নাকি হে? তা বলি মোড়ল মশায়, আমি হিন্দু না মোছলমান?

লোকের হাসির মধ্যে মোড়ল গর্জে ওঠে, কে হিন্দু কে বা মুসলমান? সবাই এক মায়ের সন্তান। সবাই মানুষ।

মোড়লের ছেলে নৌকা বইতে যাবে। যাবার সম একান্তে বউর কাছে বিদায় নিতে যায়। গান গেয়ে বলে—

'একমাস পরে আসব রে ধনি, ঘরে থাকো না...

পরক্ষণে বউ গানে জবাব দেয় অর্থাৎ, কলিটা সম্পূর্ণ করে,

(আমি) থাকতে পারব না।

ছেলে গায়,

পনের দিন পরে আসব রে ধনি, ঘরে থাকো না।...

বউ গায়,

থাকতে পারব না।

ছেলে জোর চেঁচিয়ে গেয়ে ওঠে,

সাতদিন পরে আসব রে ধনি, ঘরে থাকো না।...

বউ কেঁদে বলে,

(প্রাণনাথ) থাকতে পারব না।

দিনের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। একদিন, তারপর ও বেলা, শেষে—

খানিক বাদেই ফিরব রে ধনি, ঘরে থাকো না।

জবাব একটাই :

থাকতে পারব না।।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বউকে জড়িয়ে ধরে সুরে বলে,

আমার যাওয়া হল না।।

জোর জমে গেছে আসর। এরপর অবশ্য ছেলেকে বাপের ধমক খেয়ে যেতেই হবে ঘাটে। এদিকে বউ শ্বশুরকে মান্য করে না। শ্বশুর তখন গলায় হাত দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেবে। বউ মনের দুঃখে বাপের বাড়ি যাচ্ছে। পথে পড়েছে নদী। নিঃঝুম সন্ধ্যাকাল। ঘাটে আছে ঘাটমাঝি। তাকে মিনতি করে। গানের সুরে পার করে দিতে বলে। ...তারপর দেখে, ঘাটমাঝি তারই স্বামী।

আসর টালমাটাল। ওস্তাদ ঝাঁকসা সিগ্রেট জ্বেলেছে এতক্ষণে। শ্রোতাদের আড়াল করে মুখ নামিয়ে টানছে। এ ভব্যতা তার স্বাভাবসিদ্ধ।

হাসির ঝড়ের মধ্যে বেরসিকের মত কে শ্রোতার ভিড় ঠেলে দ্রুত এগোচ্ছে! ...পথ দাও, পথ দাও, আসরে যাব।

কে রে বাবা! চোখে পা দিয়ে যাচ্ছে যে। চারপাশে বিরক্তি! লোকটা এগিয়ে আসছে আসরে। ওস্তাদ, ওস্তাদজী কই। খবর আছে। খবর।

খবর? কিসের খবর? ওস্তাদ ঝাঁকসা নড়ে ওঠে। চমকায়। ধনপতনগর থেকে প্রসন্ন এসেছে। ...কী, কী হয়েছে প্রসন্ন?

প্রসন্ন কানের কাছে মুখ এনে বলে, সর্বনাশ হয়েছে ওস্তাদ। ছোটি বহু বিষ খেয়েছে—এতক্ষণ আছে কি নাই!

ছোট বউ? গঙ্গা? গঙ্গামণি? উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বসে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় শুধু। কী করবে বুঝতে পারে না।
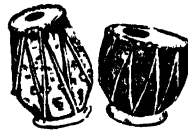
ভোর হয়ে গেছে।

আমগাছগুলো গাঁওবুড়োদের মত গায়ে আর মাথায় নীলচে কুয়াসার আলোয়ান আর টুপি পরে জড়সড় স্তিমিত আগুনের সামনে বসে রয়েছে যেন—পদ্মার সীমান্তরেখা ঘিরে ডিমের কুসুমের মতে সূর্য, তার আলোর রঙ এখন জ্যোৎস্নার বেশি কিছু নয়। প্রকাণ্ড দীঘির ওপ্মাশে জমিদারবাবুদের কালশিটে পড়া দালানে সেই ছটা। সামনে মাঠ—পাকা চৈতালী ফসলের খেতে এখনও ধোঁয়ার মত কুয়াশা ফেরে। চারদিকে মৃত্যুর স্বাদ এখনও লেগে। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য লাগে।

মেলায় শেষ রাতের ঝিমুনিটুকু সবে কাটছে। কেউ কেউ শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলেছে। হাত মুখ সেঁকছে। চায়ের দোকানে জটলা বাড়ছে। জুয়ার আসর এবার গুটিয়ে ফেলার পালা। চারপাশে হ্যাসাগবাতি নিভিয়ে দেবার ব্যস্ততা। গুঞ্জন বাড়ছে সব কাঁপন্ত নীলচে ঠোঁটগুলোয়। এখন আবার চড়া সুরের আসর দরকার। চেঁচামেচি করে হোক—যেভাবে হোক নতুন দামে চালিয়ে গেলেই হল। আসর জমতে দেরি হবে না।

সব আলকেপেই এই ভোরের আসরের সুযোগ পেতে চায়। সেটা ভাগ্যগুণে পেয়ে গেছে গোপালের দল। মানিক ফকিরের কাপ জুড়েছে তারা। ফকির সাজতে জাগুর জুড়ি নেই। সদ্য হাসির হাওয়া বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ঝড় আসবেই! আসর সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ জাগবে এখনি।

ধনপতনগরের দল এখন জিরোচ্ছে। হারমোনিয়ামের ওপর মাথা রেখে বসে আছে পঞ্চানন। বাঘা মিয়া বাঁয়াটা পেটে রেখে তবলার ওপর ঝুঁকেছে। দোহারকিরা কেউ গুটিসুটি শুয়েছে, কেউ পিটপিট করে তাকিয়ে মুখের ওপর বিপক্ষ ক'পের (ক'পে অর্থাৎ সওদার) লম্ফঝম্ফ দেখছে—নিরুৎসাহে। আসর ছেড়ে বাইরে গেছে কেবল ওরা দুজন।

মেলার বাইরে দীঘি। দীঘির পাড়ে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে আগুন জ্বেলেছে ফজল। পাটকাঠি কুড়িয়ে এনেছে কোত্থেকে। ওস্তাদ ঝাঁকসা আগুনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে—চোখ দুটো বোজা। দুটো হাত শিখায় বাড়ানো।

প্রসন্ন যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেছে। অবাক হয়েছে, ক্রুদ্ধ হয়েছে—তাতেও কোন ফল হল না দেখে সে সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই ফিরে গেছে ধনপতনগর। শেষবার বলে গেছে, তবে জেনে রেখো ঝাঁকসুদা—ধনপতনগর আর তোমার মুখ দেখবে না। তুমি কি মানুষ?

না, মুখ আর দেখাবে না ঝাঁকসু ওস্তাদ। শিমুলতলার শ্মশানেই সব কিছুর অবসান হয়ে গেছে। ...প্রসন্ন, সে বেশ্যাকে তোরা ইচ্ছে হয় পোড়াস, নয়ত বালির চরে পুঁতে দিস, যা খুশি করস! আমি তাকে চিনিনে। হ্যাঁ, পষ্ট বলে দিলাম রে বাবা, আমি আর কোন কিছুতে নাই।

এমন নিষ্ঠুর এই লোকটা! নিষ্ঠুর বলেই কমলাসিনীর মতো মেয়েকে পায়ে দলে সুখলতাকে বুকে টেনেছিল। নিষ্ঠুর বলেই তো ফের সুখলতার বুকের ওপর হেঁটে গিয়ে নিয়ে এসেছিল গঙ্গামণিকে। ফের বুঝি কী মতলব মাথায় এসে গেছে।

ফজল অনুনয় বিনয় করেছে। পুলিশ হ্যাঙ্গামার কথা তুলেছে। তাতেও লাভ হয়নি। বরং রাক্ষুসে মুখভঙ্গী করে হেসেছে ধনঞ্জয় সরকার। থাম্ রে কাঠব্যাঙ। পুলিশ ঝাঁকসার নামে মাথা নত করে। সেটা ভুলিস নে। আমাকে তোরা কী ভাবিস রে শালার ব্যাটা শালা? আমার নাম ঝাঁকসু ওস্তাদ।

ব্যস। ফজল কাঠ। ওই সলিম ডাকাতের মতো ভয়ঙ্কর লাগে লোকটাকে। কত বড় বড় মহাজন মানুষ এর ভক্ত! এলাকার কারো সাধ্য নেই ওর গা ছোঁয়। ফজল তা জানে। সে মনে মনে বলে, কেন যে গানের ওস্তাদ হয়েছিল ধনঞ্জয় সরকার। বড় অদ্ভুত লাগে ভাবতে। ও ডাকাতের সর্দার হল না কেন?

আসলে ও একটা মিথ্যে দম্ভের খপ্পরে পড়ে গেছে। সেই যে যখন তখন বলে, জনশক্তি হল মহাশক্তি। জনশক্তি আমার হাতে। আসরে দাঁড়িয়ে যখন চারপাশে তাকাই, দেখি হাজার মানুষ আমার হাতের মুঠোয় বন্দী। আমার বুক ফুল ওঠে সাহসে। আমি তোদের জন্যে, তারা আমরা জন্যে বাঁধা—এক প্রাণ এক মন এক সুরের পাঁচালি। ফজল রে, আমি ধন্য, এ মানব জন্ম ধন্য।

পাগল, পাগল একটা! আসরের মানুষ আর সংসারের মানুষ যে এক নয়, এ ভুল ওর ভাঙবে কবে কে জানে! বড় আফসোস লাগে।

কিন্তু আছে এ এক বিরাট ধাঁধা ফজলের কাছে! কেন বিষ খেল গঙ্গামণি? কেন শান্তি পালাল? সেই শেষরাত থেকে প্রশ্ন ওকে জ্বালিয়ে মারছে। সাহস পায় না বলতে। মুখ তোলে, জিভের ডগায় শিরশির করে কথা, ঠোঁট বুজিয়ে নিতে হয়। হয়ত জোরসে এক কিল মেরে বসবে পিঠে। দল থেকে তাড়িয়ে দেবে। ফজলের বয়স হয়ে এসেছে। ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশি তো বটেই। জাগুরুদ্দিনের মতো স্বাধীনভাবে গান করতে তার দ্বিধা আছে। সঙ্গত একটা বড় কথা। ঝাঁকসু ওস্তাদের কাছ থেকে সরলেই সে হয়ত মূল্যহীন হয়ে পড়বে আলকাপের বাজারে। আজ পনের-যোল বছরের জুটি—পরস্পর ইসারা বোঝে, মনের ভাবটি স্পষ্ট টের পায়, আসরে দাঁড়ালে বুকে সাহস থাকে প্রচণ্ড—পাশেই আছে মহাশক্তিমান নায়ক। আলকাপে তো লিখিত নাটক নেই। ঘটনাটা শুধু জানা থাকে। তাকে স্থানকালপাত্র অনুসারে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। একই পালা প্রতি আসরে প্রতিবার নতুন নতুন চেহারা পায়। ঘষামাজায় ঝকঝকে হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার ধোপে যা কিছু গলতি, সব বাতিল হয়ে যায়। নতুন নতুন কথা আসে। যেন জলমেশানো দুধ থেকে কালক্রমে জলটুকু বাতিল করে দুধটুকু শ্রোতাদের ক্ষুধিত ঠোঁটের সামনে এগিয়ে দেওয়া।

ফজলের অত সাহস নেই। কী জানি কী হয়ে যায়! জমিজমা নেই একটুও—সামান্য একটা ভিটে! গানের টাকায় সংসার চলে তার। কতদিনের সাধ, ঘরের চালে টালি দেবে—মিটছে না। পেটে খেতেই সব চলে যায়। রাতজাগা মানুষ—একটু ভালরকম খেতে না পেলে শরীর টিকবে কেন? বউটিও বেশ খরুচে। তা না হলে এতদিনে ফজলের সংসার হয়ত শক্ত মাটি পেত পায়ের নীচে।

আগুনের সামনে বসে সে এইসব কথাই ভাবছিল। ওস্তাদকে মনে মনে সে ঘৃণা করছিল। এ হৃদয়হীন মানুষের সঙ্গে সে এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? যদি ফজলেরই কিছু আপদ-বিপদ ঘটে যায়, আসর ছেড়ে তো যেতেই দেবে না তাকে!...

হঠাৎ ওস্তাদ ঝাঁকসা ডাকে, ফজল!

উঁ—বলে ফজল মুখটা তুলেই নামিল নেয়। ওস্তাদ চোখ বুজেই কথা বলছে।

ঠিক করলাম, না ভুল করলাম?

ফজল বুঝেও না বোঝার ভান করে বলে, উঁ!

প্রসন্ন এসেছিল। গেলাম না।

হুঁ। গেলে না তো!

তাই তো বলছি রে, ঠিক হল, না ভুল হল?

ফজল ফোঁস করে বলে, ভুল হল।

ভুল? কেন রে?

গঙ্গামণি আপনার বহু।

খিক খিক করে হাসে ধনঞ্জয় সরকার। ...বহু? আ বে, হাম বিভা নেই করিস্

শালীকো। চাঁই বুলি খোট্টাই ভাষায় কথা বলে সে। হাঁ বে ফজল, মন্তরভি নেই পড়িস!

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ফজল। তা তো সত্যি! কথা বলতে পারে না সে। নাকের পাশের জরুলটা অকারণ খোটে।

ওস্তাদ বলে, কাল সাঁঝমে শালী শান্তিকা সাথ জোড় লাগিস।...

চমকে উঠে ফজল বলে, আ ছি ছি ছি!

হাঁ। কুত্তা-কুত্তীন য্যায়সা হো যায়। ফজলা, উসকী হামভি জান মার দেতে! এ সমঝকার লেছে বেটি ঢপওয়ালী। আপনা জান নেহি, বে ফজল, উ আপনা...

অশ্লীলতম বাক্যে সম্পূর্ণ হয় কথাটা। ফজল কানে হাত ঢাকে। ...আ ছি ছি! চুপ কর ওস্তাদ। হামার ঘেন্না লাগে, হামার খারাপ লাগে।

বাঘড়ী অঞ্চলের বুলি এবার ফজলের মুখে। অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার সময়গুলোতে ওর এমনি করে বুলি বদলে নেয়। কেন নেয়, ওরা নিজেও জানে না। বুঝি মন উজাড় করার সুখ বেশি পায় এই মাতৃবুলিতে। ফের ফজল বলে, সেটা আগে বুললেও হত জী—খামাকা শান্তিকে হামি টুঁড়ে হয়রান হনু। হারামী জাত হারালছে ফির। পাকা মর্দানা হল্‌ছে। অর্‌ নারী সাজতে ফির চাহিবে না। মরবে—না খেতে পেয়ে মরবে ওস্তাদ।

বিড় বিড় করে কী বলে ওস্তাদ ঝাঁকসা। বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ থাকে। আগুনে অবশিষ্ট জ্বালানিগুলো দুজনেই গুঁজে দেয়। ওদিকে আসর চলেছে সমানে। কার যেন তাড়া খেয়ে ফকিরবেশী জাগু আসরের প্রান্তে একটা আমগাছে চড়ে বসেছে। অঙ্গভঙ্গী করে কী বলছে। মাথায় টুপি, ছেঁড়া বিচ্ছিরি হাফ শার্ট গায়ে! লুঙ্গিও পরেছে, কাঁধে কাঁথা ছেঁড়া দিয়ে সত্যিকারের ফকিরী ঝুলি—এতসব সাজগোজ জোগাড় করে আসরে নেমেছে জাগিরুদ্দিন!

মুখ তুলে দুজনে আসরটা দেখে নেয় একবার। তারপর ঝাঁকসা ওস্তাদ বলে ছেড়ে দে। পরের কাপ ঠিক করা যাক। দশটা না বাজলে ছাড়বে না শালা জুয়াড়ী।

নিরাসক্ত কণ্ঠে ফজল বলে, ধুর কাপ! একটা ডুয়েট দিয়ে শেষ করব। ভাঙা আসর। জমবে না আর।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ওস্তাদ ঝাঁকসা। চাপা গলায় ডাকে, ও বে ফজলা! চন্দ্রবাবু মাল খাওয়াবে বলেছিল। চল, গিলে আসি দুপাত্র। চাঙ্গা হয়ে যাবি। আয় বে আয়, পদ্মার বান ডাকাতে যাই!

দুজনে চন্দ্রমোহনের ঘরের দিকে যায়। নতুন উৎসাহে লম্বা লম্বা পা ফেলে দুটিতে হাঁটে।

সূর্য মাথার সোজাসুজি আসবার আগেই মেলা নিস্পন্দ। দু'চারজনের যা নড়াচড়া রোদপোহানো বা চলাফেরা আছে, তার সবাই মেলার নিজের লোক। দোকানদার বাজিওয়ালা, ফেরিওয়ালা, জুয়াড়ি। দুটো লোক—জাতে মুদ্দোফরাস, ঝাড়ু চালাচ্ছে, এমুড়ো থেকে ওমুড়ো। গাছের পাতার ফাঁকে কোথাও অল্প অল্প রোদ। রোদ অবশ্য

সরছে আর সরছে ক্রমাগত। সেই ফাঁকে কেউ সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে নিচ্ছে কিছুক্ষণ। দোকানের সামনে কয়লার উনুন এনে রান্নায় ব্যস্ত অনেকে। আলকেপেদেরও রান্নার সময় এখন। গোপালের আড্ডা দীঘির পাড়ে ভাঙা একটা আটচালায়। কবে নাকি পাঠশালা ছিল ওটা। এখন জায়গা বদল করছে। ভাঙা হোক, পাঠশালা ছিল একদা—তাই ভেবে গোপালের ভারি খুশি। চন্দ্রমোহন তাদের বেশি খাতির করল ধরে নিয়েছে। ওদিকে ঝাঁকসার স্বভাব জানা আছে তার। আসরের খুব কাছাকাছি সাজঘর বা আড্ডা সে পছন্দ করে।

চটের তাঁবু মাত্র। ওপরে অবশ্য ত্রিপলের ছাউনি। তার ভিতর বেঘোরে ঘুমোচ্ছে দলের লোকগুলো। ফজল অল্প নেশাতেই কাবু হয়ে পড়ে। তাতে কড়া হুইস্কি—জীবনে কখনও এ জিনিস সে খায়নি। সে এখন প্রায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। বেঁটে ফরসা থলথলে তার দুটো বাহুর বেড়ে যে ওই ধিঙ্গি ছোকরা ভানুই রয়েছে, তা অনুমান করা যায় সহজে। একটা চাদরে দুটো মানুষ ঢাকা—শিয়রে ছলকে পড়া লম্বা চুলের ঝাঁপি। ওস্তাদ পর্দা তুলে উঁকি মেরে একবার দেখে নিয়েছে। মা বাপ তুলে অশ্লীল গাল দিয়েছে। কে আর শুনবে গালিগালাজ? দুটো শুওরই গভীর ঘুমে মড়া। খাঁটি আলকেপে মড়া।

এই নেতিয়ে পড়া পিণ্ডগুলো দেখলে অবশ্য বড্ড মায়া লাগে। কী সুখের টানে মানুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত রাতের শয্যা আর ঘুমের সুখ ওরা বাতিল করে দিয়েছে? ওই ফজল—সে অবশ্য গুণী মানুষ, নাম যশ চায়, টাকাকড়ি চায়। ওই বাঘা মিয়া খলি বা তবলচী, সে চায় টাকা আর হাতের অভ্যাস চালিয়ে যেতে। বাঘার হাড় অব্দি পাক ধরেছে—গোরে যাবার সময় এসে গেল শীগগির—ভুরুর চুলও সাদা হয়ে গেছে। তবু বেচাবার বিশ্রামের বরাত নেই। এ বুড়ো বয়সে ফের বিড়ি বাঁধতে জঙ্গীপুর বাজারে গিয়ে বসার চেয়ে এটা মন্দ না। ভালই দেয় ওস্তাদ। রাত্রি পিছু সাত টাকা। যা তা কথা নয়! আর ওই পঞ্চানন —ওর গলায় সুরের বদলে অসুরের বাসা; অথচ এত ভাল হারমোনিয়াম বাজায়! এত মিষ্টি ওর হাত, এত ক্ষিপ্র আঙুল চলে যে মনেই হয় না হারমোনিয়াম বাজছে! এ যেন কী বাজছে। এ যেন আশ্চর্য নতুন বাদ্যযন্ত্র! তার সুখ হয়ত ওইখানটিতে। যা কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারে না, তা আঙুল চালিয়ে জাহির করে ও সুখী। তারপর ওই দোহারকি তিনজন। নাসির, উদ্ধব আর বটো। তিনটি আস্ত কলুর বলদ ছাড়া কিছু নয়। শুধু দোহারকি করার জন্যে ওদের অস্তিত্ব। দ্রুততালে ধুয়ো গায় আর তালে তালে উত্তাল কত্তাল বাজায় ঝম ঝম ঝমা ঝমা। ওস্তাদ ঝাঁকসা বরাবর চেয়েছে, দলের প্রতিটি লোকের যেন দরকার হলেই আসরে ওঠবার যোগ্যতা থাকে। প্রত্যেকেই যেন নাচে গানে অভিনয়ে পটু হয়। লোক হাসাতেও সমর্থ হয়। সে কিন্তু আজও সম্ভব হয়নি। যদি বা কোন হারমোনিয়ামদার আসরে উঠে কাজ করবার উপযুক্ত হল, অমনি দল থেকে কেটে পড়ল সে। নতুন কাঁচা দলে শুরু করল মাস্টারী। তবলচী বা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দেখেশুনে আর সে চেষ্টা করে না ওস্তাদ ঝাঁকসা। নিজে বরং দুটো তিনটে ভূমিকা চালিয়ে নেয়—ফজলকে দিয়েও

চালায়। মোট কথা ওস্তাদ আর সঙাল থাকলেই আসর চলল, ছোকরা তো রয়েছেই। এ তিনজন মিলে চলতে থাকলে পদ্মার এপার বাঘড়ী কালান্তর আর গঙ্গার পারে রাঢ় এলাকা পায়ের তলায় বশ মানবে।

নাসির মোল্লাবাড়ির ছেলে। বাপের পয়সা আছে অনেক। উদ্ধবও মণ্ডল সন্তান। বটোর বাবার শক্তিচালানী করবার আছে ভালো। ওরা পান তামাক আর খাওয়া পেলেই খুশি। আর কী পেলে খুশি তাও ওস্তাদ জানে। মোহিনী ছোকরার একটু হাসি, দুটো কথা, অল্প ঢলাঢলি—ব্যস, স্বর্গ ওদের হাতের মুঠোয়। আরো একটা ব্যাপার আছে। সেটা যতই কদর্য শোনাক, তার সীমাচৌহদ্দি বড় কড়া—শান্তির পাশে শুয়ে থাকার ভাগ্য হয়ত দুর্ভাগ্যই। শান্তি ওদের আর যা যা সব আকাঙ্ক্ষিত, পুষিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি কোনদিন। বিনিময়ে শান্তি অনেক কিছু উপকার পেয়েছে। কিন্তু শোবার সময় শুওরটা দেয়াল ঘেঁষে শুত। ফলে—পাশের জায়গার একমাত্র অধিকার শুধু ফজলের। এ নিয়ে মান-অভিমান আড়ালে-আবডালে কম চলত না। চলত—আবার মিটেও যেত আপনা আপনি।

আজ শান্তি নেই। নেই—তা দোহারকিদের ধুয়ো ধরার টানেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু সতর্ক ওস্তাদ ঝাঁকসা আবার নিজেই একশো—নিজে দোহারকি করতে লেগে যায়, ফজলকে করায়—এমন কি বাঘামিয়াকেও। তবে ওরা যখন মুদারায়, বাঘা মিয়া চলে উদারায়। ব্যান্ড পার্টিতে ফ্লুট-কর্নেটের সঙ্গে যেমন মস্ত ভেঁপুবাঁশি বাজে—ঠিক তেমনি।

শান্তি নেই। কিন্তু ভানু আছে। বটো—উদ্ধব—নাসির তিনজনেই তক্কে তক্কে ছিল—এ তো সেই করতলগত ভানু, যাকে অ্যাদ্দিন আমলই দেয়নি ...কিন্তু ভানুরও একটা আত্মসম্মানবোধ আছে। আজ সে প্রখ্যাত ওস্তাদ ঝাঁকসার প্রধান ছোকরা—আজ সে মহারাণী গিদাম্বরী—জাগু সঙালের ভাষায়। অবিকল শান্তির মতো চাউনি তার, গান শেষে ঠিক তেমনি পদক্ষেপে দুলতে দুলতে সাজঘরে আসা, অবহেলায় শাড়ি ব্লাউজ খুলে ছড়িয়ে দেওয়া, জলের বালতির জন্য রঘুকে হুকুমদারি। তেমনি ভঙ্গীতে হাতের চেটোয় সাবান নিয়ে মুখের পেন্ট ধুয়েছে। চঞ্চল পায়ে নাচতে নাচতে চন্দ্রমোহনের ঘরে গেছে। ইয়ারকি মেরেছে। চা খেয়েছে। পয়সা আদায় করেছে। আসবার সময়, ধুৎ মিনসে বলে জুয়াড়ির চিবুকে ঠোনাও দিয়েছে। যত বিচ্ছিরিই লাগুক এ আচরণ, তবু মনে মনে সে আজ শান্তি। এবং শান্তির মতই শেষপ্রান্তে চাদর বিছিয়ে শুয়েছে। বলেছে, কই হে সঙাল—হাত বাড়াও, বালিশ করি। বটো—উদ্ধব—নাসির পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গোপনে—প্রত্যেকের অজানতে, ক্ষিপ্ত। একজায়গায় শুয়েছে—পাগুলোর গতি ভানুর পায়ের দিকে। অর্থাৎ লাথি মারো ঢ্যামনার বাচ্চাকে।

এতগুলো লোকের রান্না করবে বেচারা রঘু।

চন্দ্র জুয়াড়ি লকড়িটাই যা দেয়নি—আশেপাশে লকড়ির অভাব নেই এদেশে, বাদবাকি সবই দিয়েছে। রঘু পাঁজাকরা পাটকাঠি এনে জড়ো করেছে। জমিদারবাবুর

বাড়ি পাশে খুঁজে ইট এনেছে। তাই দিয়ে উনুন। প্রকাণ্ড একটা কড়াই চাপানো। আউষের মোটা চাল সেদ্ধ হচ্ছে। বাঁধাকপি আছে, আলু আছে, ওস্তাদের খাতিরে সের দেড়েক একটা মাছ পাওয়া গেছে আর মুশুরীর ডাল সেরটাক। আনাজপাতি অঢেল মেলে। এ মাটিতে ধান হয় কম, ফলে নানারকম শাকসব্জী ফলমূল আর চৈতালী। দামও কম। মেলার কয়েকটা দিন আশেপাশের গরিব-গুরবো মানুষেরা ভাত খাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পায়। নৈলে সেই সপ্তায় একবেলা—বাকি খাদ্য মাসকলাইয়ের রুটি, ছোলার ছাতু—আর গ্রীষ্মকালে অঢেল আম কাঁঠাল। সে সুদিনও শেষ হয়ে আসছে তখন। জমিদারবাবুরা জমিদারী উচ্ছেদের হিড়িকে আর কাঁঠাল আর লিচুর বাগান কেটে সবুজ শ্যামল দেশটা খাঁ খাঁ করে ফেলেছে। সাদা মাটি যেন ভীষণ হাসি হাসছে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা নেশায় টলছিল। টলতে টলতে রঘুকে বলেছে, কী রান্না হচ্ছে রে? রঘু কথা বলে কম। হাসে মাত্র। সে হেসেছিল।

তখন ওস্তাদ বসেছে কফি কাটতে। মোটামোটা ফালি করে ভাতের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রঘু হতভম্ব। বারণ করার সাধ্য নেই। ওদিকে ওস্তাদ ডাল আলু—এমনকি মাছটাও কেটে আধোয়া টুকরোগুলো ভাতে ফেলেছে। তারপর সে কি হাসি!...দেখিস যে শালার ব্যাটা শালা, আজ অমৃতভোগ খাওয়াব।

...অমৃতভোগ একটা চেহারা পাচ্ছে এখন। রঘু বিমর্ষ মুখে খুন্তী দিয়ে ঘুঁটছে। ওস্তাদ দুলতে দুলতে আমবাগান পেরিয়ে ওদিকে চলে গেল কোথায়।

সূর্য ঢলেছে। ওদের জাগাতে হবে এবার। রঘু ওঠে। প্রথম সে বাঘা মিয়াকেই ডাকে। মিয়া, উঠ হে। ও খলিফা! ইদিকে সব্বোনাশ! ঘণ্ট রান্না হয়ে গেছে, খলিফা। উঠ, উঠ।

এ নদীর নাম পদ্মা।

সামনে দাঁড়াতেই বুক হু হু করে ওঠে। আদিগন্ত মুক্ত মাঘ শেষের আকাশ। নীচে ধু ধু বালির চড়া—অনেকগুলো হাল্কা নীল জলের ধারা এখানে ওখানে চরের গা ঘেঁষে বইছে। হাওয়া তোলপাড়। জলপাখিদের চিৎকার আছে। নৌকা আছে। সব মিলিয়ে এ অগাধ শূন্যতা যেন কোনদিন ভরবার নয়। খালি মনে হয়, কী যেন হারিয়ে গেছে। কী বুঝি ভেসে গেছে এমনি বিস্তৃতির শূন্যতার স্রোতে।

দলের লোকেরা দাঁড়িয়ে পরস্পরকে আঙুল তুলে দেখায়, ওই পাকিস্তান। ওরা কিছুক্ষণ পাকিস্তান দেখে। কিছু দেখা যায় না স্পষ্ট। আবছা কুয়াশার মধ্যে ঘন কালো একটা রেখার মতো। আলকেপেরা হিন্দুস্তান পাকিস্তান নিয়ে ছড়া গায়। কাপ দেয়। সেই পাকিস্তান! যতবার পদ্মার পাড়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়, বলে হুই পাকিস্তান।

এই তো কিছু দিন আগে কালীতলা বর্ডারে গান হল। ওস্তাদ গান গেয়েছিল,

হায় রে হায়, কেমনে বাঁচব জান।
হল হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান।।
ভাই রাখে না ভাইয়ের মান,
কেমনে বাঁচাব জান।।
মোরা, হিন্দু মুসলমান
এক মায়ের সন্তান
ভায়ের মুখ দেখতে ভাইকে
ওনারা সব পাসপোর্ট চান,
কেমনে বাঁচাব জান।।

দুপুরবেলা পদ্মায় নেমে স্নান করছে আর নিজের মনে বিড়বিড় করে কী বলছে ওস্তাদ। ফজল শুধিয়েছিল সকৌতুকে, ভুল বকছেন না কি জী?

নাঃ, ভুল বকি নাই। হ্যাঁ রে ফজল, ধর, যদি এমন হয় কোনদিন, দেশজুড়ে হিন্দু মুসলিম হানাহানি লেগে গেল, তুই—তুই ফজল কপে, আর আমি ওস্তাদ ঝাঁকসু, আমরা কী করব রে? অ্যাঁ? ও ফজলা! জবাব তো দে একটা। চুপ করে থাকিস নে শালার ব্যাটা শালা!

লোকটা ক্ষেপল কেন রে বাবা? ফজল বলেছিল, রাখেন জী, কী সব কুকথা।

চো-ওপ কুত্তাকা বাচ্চা। জবাব দে। আমার মাথায় লাঠি মারবি?

তুমি মারবেন জী?...

সঙ্‌দারের কথা—ওই রকম আপনি তুমি আর কণ্ঠস্বরে রসের বান। ওস্তাদ ঝাঁকসা দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। মাঝে মাঝে ভাবের ঘোরে লোকটা পাগল হয়ে যায় এমনি করে। আসর বাহির জ্ঞান গম্যিই থাকে না। সে বলেছিল, ফজল, মনিরুদ্দিন বিশ্বাসের সাগরেদ ওস্তাদ ঝাঁকসু বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশে মানুষ কথাটা লিখে যেতে এসেছে। ...পরক্ষণে হো হো হেসে, আয়রে, দুই শালা পাপী একসঙ্গে ডুব দিই!

সেদিন সারাবিকেল গুন গুন করে বানাল নতুন একটা গান,

আমার এমন জনম আর কী হবে।
মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে।।

আর সেই গান এখন দেশ থেকে দেশান্তরে সবার মুখে ফিরছে। কতদিন ফিরবে। হালের কৃষাণ গাইবে, মাঠের রাখাল গাইবে, হাটের ফিরতি হাটুরেরা গাইবে—আর খেয়াঘাটের মাঝি, রাঢ়দেশগামী 'বাঘড়ে' গাড়োয়ান, মাঠের ফসলপাহারাদার 'জাগাল' নিশিরাতের নিস্পন্দ পৃথিবীতে ঘোষণা করবে বারবার,

এমন জনম আর কী হবে, মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে।।

তবে মানুষ দেখাই সার। চেনা গেল কতটুকু? সামনের হাত বিশেক জলধারার ওপারে যে বালির ঢিবি, তার চূড়োয় বসে আছে কে—তাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ফজল। ওস্তাদজী না? তবে যে কে বলল, ওস্তাদজী মেলার কোন

দোকানে ঘুমোচ্ছে? ঘুম যার আদৌ হয় না—সে ঘুমোচ্ছে শুনলে জাগাতে ইচ্ছে করে না। তার ওপর ওস্তাদ ঝাঁকসা। তার ওপর সদ্য অপঘাত ঘটেছে—অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে যেত এতক্ষণ। ছোকরা গেল, প্রিয় মেয়েমানুষ মরল। ও ঘুমোক, প্রাণ ভরে ঘুমোক।

এখন ফজল বলে, আরে, ওস্তাদজী ওখানে কী করছে!

রঘু বলে, তখন আমি বললাম না, উনি মাঠের দিকে গেল! তোমরা বললে, ঘুমোচ্ছে। তোমরা কানই করলে না আমার কথাটা। গরিবের কথা—বাসি হলে...

থাম্ রে বুড়ো ভেড়া! ফজল ধমকায়! ...একটুখানি রসকস দিয়ে চাঙ্গা করে আসি লোকটাকে।

তারপর ধুতি খুলে পুরো উলঙ্গ হতেও তার বাধে না। চারপাশে এত সব লোক! বেহায়া ফজলের কীর্তি দেখে সবাই লজ্জায় মুখ ফেরায়। পরক্ষণে সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। হাতে ধুতিটা গুটানো—হাতটা তুলে রেখে ঝাঁপ দিয়েছে।

আন্ডারপ্যান্ট ফজল পরে না। 'শরীল' ভারি লাগে নাকি। কোন কাপের সময় তাই ছ্যাবলামি করে ছোকরা ওর ধুতির কোঁচা ধরে টান দিলেই...

দৃশ্যটা অশালীন—বিশেষত ভদ্রজন বা মেয়েরা যেখানে উপস্থিত, সেসব আসরে—কিন্তু সেদিকে লোকটা অসম্ভব সেয়ানা। সম্পূর্ণ ন্যাংটো হবার আগেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসে পড়ে। লজ্জা নিবারণ করে ফেলে। ব্যস, ওতেই হাসির তুফান ওঠে আসরে। ওই দিয়েই সীমারেখা রক্ষা করেছে সে, লঙ্ঘন তো করেনি একেবারে।

তবে বিদেশে গিয়ে স্নানের সময় সুযোগ বুঝলে ফজল ন্যাংটো হয়ে জলে নামতে দ্বিধা করে না। নির্বোধ সমান মুখভঙ্গী করে বলে, আমরা এমনিভাবে এসেছি দুনিয়ায়, যাবও এমনি ন্যাংটো হয়ে—আমি এইটুকুনই বুঝি ভাইসকল। তাছাড়া আমার বয়েস বেশি নয়—সামান্য 'বারো কি তেরো'...তারপর হঠাৎ কোন অচেনা লোক আসতে দেখলেই গতর ঢাকে সশব্যস্তে। এর নাম কপেমি। আলকেপেরা এই রকম মানুষ। সবাই তা জানে। গালমন্দও করে—আবার গানের আসরে যেতেও ভোলে না।

একগলা জল মাত্র। হেঁটে পেরিয়ে যায় ফজল। ওপারে গিয়ে ধুতিটা জড়িয়ে নেয় ফের। এক দৌড়ে উঠে যায় চূড়োর কাছে। গিয়ে ডাকে, ওস্তাদ, ওস্তাদজী!

ওস্তাদ ঝাঁকসা মুখ ফেরায় না। হাত তুলে ইসারায় ডাকে।

ফজল কাছেই বসে। পরক্ষণে চমকে ওঠে। নিঃশব্দে কখন থেকে লোকটা কাঁদছে। কী বলবে, ভেবে পায় না ফজল। সান্ত্বনা দেবার কথা হাতড়ায় সে। ন্যাংটো হবার মতো ছ্যাবলামি মন থেকে পলকে উবে গেছে। ভেবেছিল, এই নিয়ে রসিকতা করে সে ওস্তাদের জমিয়ে ফেলবে। বিদেশে গান করতে আসার আসল মজা তো এগুলোই।

কিন্তু ওস্তাদ কাঁদছে। কাঁদতে কি কোনদিন সে দেখেছিল ওস্তাদ ঝাঁকসাকে? মনে পড়ে না তো!

আর ওস্তাদ ঝাঁকসা আস্তে আস্তে বলে, কাঁদছি না ফজল। যদি বা কাঁদি এত আমার আনন্দের কাঁদন। ফজল, ঢপওয়ালীর বদলে যদি আমার শান্তি বিষ খেয়ে মরত, তাহলে কেমন করে বেঁচে থাকতাম! সে কথা ভেবেই আমি কাঁদছি।

চন্দ্রমোহন বলে, কে বলেছে ঝাঁকসুকে সত্তর টাকা রাত দিচ্ছি? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে গোপাল? দলের রেট আমার প্রাইভেট ব্যাপার—বলব না। তবে জেনে রেখো, তোমার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি হতে পারে। সেটা তুমিও স্বীকার করতে বাধ্য—ওর একটা নামডাক আছে বৈকি।

গোপাল ব্যঙ্গ করে হাসে। ...নাম ডাকের বহর যা দেখছি, আপনিও দেখছেন স্যার বলবেন না ওকথা। নেয্য বিচার করে বলুন দিকি, ওকি গান হচ্ছে? আসর রাখতে পারছে? লোকের মধ্যে গিয়ে বসে খবর নিন—ওরা রাত জাগছে, কখন আমরা আসর নেব সেই আশায়। বলুন, আপনিই বলুন।

চন্দ্রমোহন ভুরু কুঁচকে কথাটা যেন বোঝবার চেষ্টা করে। ঠোঁট দুটো জড়োসড়ো আর গোলাকার করে একটা অদ্ভুত শব্দ তোলে চুকচুক চুকচুক। তারপর বলে সেটা ঠিক। কাকেও বলে না—চুক্তিমত পুরো টাকা ওকে আমি দিচ্ছিনে। শান্তি—শান্তি কই দলে? তবে হ্যাঁ, তোমায় বরং বকশিস বাবদ বাড়তি কিছু পুষিয়ে দেব—কথা দিচ্ছি গোপাল। আরে ভাই, টাকাই কি সব। হলফ করে বলো দিকি, এই যে তুমি গোপাল—বড় ঘরের ছেলে বলেই শুনেছি, তুমি গান করছ শুধু টাকার জন্যে? আজ ঝাঁকসুর মত ওস্তাদকে ঘায়েল করে তোমার মাথায় তো এখন যশের মুকুট হে!

গোপাল বলে, কিন্তু কেমন করে দল চালাই দেখুন ইদিকে। হিসেব ধরুন—জাগুকে হায়ার এনেছি, দশ টাকা রাত নেবে। পাইপায়সা কমে ছাড়বে না। নিজের সেটের লোকজনকেও টাকা দিতে হয়। তবলচী নেবে তিন টাকা। হারমোনিয়ামদার দু টাকা। ছোকরা মধুর আগে ছিল মাস মাইনে এখন আসর পিছু টাকা দিই। তার পাঁচ টাকা। চারজন দোহার নেয় চার টাকা। কত হল? চব্বিশ। বাকি রইল ছয়। ইদিকে ছোকরার সাজপোশাক আছে, হাতখরচা আছে, পেন্টের জিনিসপত্তর আছে। এখন বলুন, ত্রিশ টাকায় আসর চালিয়ে আমার কী থাকল? আমি শালা কি বানের জলে ভেসে এলাম সার?

গম্ভীর হয়ে ওঠে চন্দ্র জুয়াড়ী। বলে, দেখ—সেটা বয়না নেবার সময় ভাবা উচিত ছিল।

ছিল। কিন্তু...আমতা হাসে গোপাল। ...বলেছিলেন ঝাঁকসুর সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারলে তখন বিবেচনা করবেন। এখন দেখুন, চালিয়ে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি, তবে প্রায় টিট করে ফেলেছি না?

চন্দ্রমোহন বলে, ফেলেছ। ঠিক আছে, ভেবে দেখছি। তুমি চালিয়ে যাও।

গোপাল ওঠে। ...ঝাঁকসুকে গঙ্গাপার না করে আমি থামছিনে চন্দ্রবাবু। দেখে নেবেন। শালা দেমাক হয়েছিল বড্ড। । জাতে চাঁই মোড়ল—সে আবার হেড মাস্টার সেজেছে, আলকাপ নাকি ওর কাছেই শিখতে হবে।

চন্দ্রমোহন হাসে। ...ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার বাবা আসর চালানো নিয়ে

কথা। যত বেশি লোক জমবে, তত আমার কাজ হবে। তোমার দিব্যি গোপাল, আর দু'একটা আসর যদি দেখি ওইরকম ঢিমে তেতালা শুরু হয়েছে—ঘাড় ধরে বিদেয় করব। বরং সোলেমানের দল এলে তোমরা দু দলেই মেলাটা শেষ করবে। শেষ দিকে দু রাত্রি মালদার রহিমপুর আসছে। ওরা একাই একশো।

যাবার সময় উৎফুল্ল গোপাল বলে যায়, আপনার আশীর্বাদ থাকলে রহিমপুরের সঙ্গেও লড়ে দেখতে পারি। চান্স দিয়ে দেখুন না সার।

চন্দ্রমোহন গলা থেকে মাফলার খুলে অস্ফুটে স্বগতোক্তি করে, এ শালার বাড় বেড়েছে দেখছি — রহিমপুরের সঙ্গে লড়বে।

কিন্তু গোপাল ওস্তাদের কথা সত্য। ঝাঁকসুকে সত্তর টাকা রাত দিতে হচ্ছে। অথচ গানের এই ছিরি! মেলায় উৎসাহ কমে আসছে লোকের। গোপালের দল যতটুকু জমাক, সেটা নেই-মামার চেয়ে কানা-মামার মত স্বস্তিমাত্র। কোথায় শান্তিচরণ আর কোথায় এই মধুচরণ! লোকের মন না ভরলে খেলা জমবার নয়।

চন্দ্রমোহন বেরিয়ে পড়ে।

খোলা মাঠের চট বিছিয়ে ঝাঁকসুর দল বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে। ধিঙ্গি ছোকরাটা একজনের উরুতে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছে। লোকটা তার চুলে বিলি কাটছে। তবলচী বা খলিফা বুড়ো পা দুটো সটান ছড়িয়ে মুণ্ডু সামনে ঝুঁকিয়ে ঝিমোচ্ছে আরামে। আশেপাশে দু-চারজন ভক্ত ঘুর ঘুর করছে। ভানুর সঙ্গে ভাব জমাতে চায়।

ওস্তাদ কই, ওস্তাদ? চন্দ্রমোহন ডাকে।

ওরা হুড়মুড় করে উঠে বসে। ...লায়েকমশাই যে! ওস্তাদ কোথায় গেলেন যেন ফজলের সঙ্গে।

ছোকরা ভানু কটাক্ষ হেনে হাত জোড় করে বলে, নমস্কার দাদা। আসুন।

কান করে না চন্দ্রমোহন। মেলার দিকে এগিয়ে যায়। একটু পরেই চায়ের দোকানে দেখা মেলে ওস্তাদ ঝাঁকসার। বেঞ্চে চুপচাপ বসে রয়েছে। পাশে দুজন লোক। এ এলাকার লোক নয়, তা অভিজ্ঞ চন্দ্রমোহন বুঝতে পারে। ...অমন ছিমছাম গড়ন, সুবেশ ভব্য চেহারা—গঙ্গাপারের রাঢ়ের লোক বলেই মনে হচ্ছে।

চন্দ্রমোহন ডাকে, এই ও ওস্তাদজী, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

মুখ তোলে ওস্তাদ ঝাঁকসা। কিছু বললেন চন্দ্রবাবু?

বলব। একবার আমার ঘরে আসুন দাদা। চন্দ্রমোহন স্মিত হাসে।

ওস্তাদ বলে, চলুন। এঁদের সঙ্গে কথা সেরে নিই।

বায়না বুঝি?

আজ্ঞে।

গঙ্গাপার?

আজ্ঞে।

চন্দ্রমোহন চলে যায়। মেলাপ্রাঙ্গণের মাঝামাঝি গিয়ে তার গতি বাড়ে। কী সর্বনাশ! থানা থেকে স্বয়ং বড়বাবু হাজির। অবশ্য সলিম আছে পাশে। আপ্যায়নের ত্রুটি হবার

কথা নয়। পাশের দোকানের সামনে চেয়ার পেতে বসতে দিয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চন্দ্রমোহনকে কত দিক সামলাতে হয়। নমস্কার করে বলে, আসুন স্যার! কী সৌভাগ্য।

জেদ করে ফজল গেছে ধনপতনগরে। মাইল দশেক পথ। পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। তবে সাইকেল থাকলে ভিন্ন কথা। ফজল মেলায় কার সাইকেল জোগাড় করেছিল। সন্ধ্যায় ফিরবে।

ব্যাপারটা জানতে গেছে সে। গঙ্গামণির গতি কী হল, ওস্তাদের স্বার্থেই তা জানা দরকার। এদিকে এমন গোঁধরা মানুষ, পৃথিবীতে ওলটপালট হলেও গ্রাহ্যি নেই। সেবার ফতেগঞ্জের মেলায় খবর এল, ওস্তাদের বড় ছেলের সাংঘাতিক অসুখ—মরমর অবস্থা! কী নিষ্ঠুর হয়ে বসে রইল ধনঞ্জয় সরকার। ফের যে এল, সে স্বয়ং মেজ মোল্লান সুখলতা। ছইবিহীন গোরুর গড়ি করে হাজির। এসেই তুলকালাম কাণ্ড। চাঁইবোলিতে চেঁচামেচি, মেলাশুদ্ধ মজা দেখতে দাঁড়িয়েছে—ধনঞ্জয় সরকার বিব্রত মুখে বলছে, তেরা সতীনকা ছেইলা গে মেঝকি, তে ক্যা? যা, যা, ঘর চলা যা।

সুখলতাকে হার মেনে যেতে হল। সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে গেল সে। ফজলের সেদিনও বড় তাজ্জব লেগেছিল। বলেছিল, তোমার মতো জ্ঞানী দেখি না ওস্তাদ। আসরে দাঁড়িয়ে তুমি জ্ঞান দাও মানুষকে। তোমার এ কি কাণ্ড! মুখে বল এক, কাজে কর অন্যরকম!

ওস্তাদ আর কী বলবে! সেই বাজখাঁই চেঁচিয়ে গালমন্দ। চুপ করিয়ে দেওয়া। তারপর জনান্তিকে একসময় বলেছিল, ফজল রে, আমার বড় জ্বালা! তুই বুঝিস না সেটা...

এবার অবশ্য প্রসন্নর পরে আর কেউ আসেনি। গরজই বা কার! অজাত-কুজাতের মেয়ে গঙ্গা পালিয়ে এসে রক্ষিতার মত বাস করছিল—নিলাজ বেশ্যা এত তাড়াতাড়ি বিদায় চুকিয়েছে। স্বস্তিতে হাসছে সারা ধনপতনগর। দেশজুড়ে ওস্তাদের সাগরেদ যে-যেখানে আছে, তারাও হাসছে। গ্রহণমুক্ত হয়েছে ওস্তাদ। রাহু সরে গেছে! মানসম্মান বেঁচে গেছে ধনঞ্জয় সরকারের।

গঙ্গাপার রাঢ় থেকে দুটি লোক বায়না এনেছে। মাত্র এক রাতের আসর। রাঢ়ের বায়না এলে ওস্তাদ ঝাঁকসা পারতপক্ষে ছাড়ে না। রাঢ় দেশ আমন ধানের দেশ। বড় সুখি ওরা। কত সুন্দর মিহি চালের ভাত খায়। প্রতিদিন তিন বেলাই ভাত—ছাতু রুটি নয়, ভুজা নয়, পশুখাদ্য নয়—ভাত। আর কত ঝকঝকে সব রাস্তাঘাট—ধু ধু মাঠ, বিরাট আকাশ, ইচ্ছে করে ফজলের ভাষায়, যবে যাই চলেই যাই যদ্দুর খুশি। সেখানে মানুষ কত সভ্যভব্য, শিক্ষিত আর বিচক্ষণ, শাস্ত্র বোঝে, তত্ত্ব বোঝে। আর এ গঙ্গার পূর্ব পার বাঘড়ী থেকে কালান্তর—পদ্মা থেকে সোজা দক্ষিণে নদীয়াকুজলার সীমান্ত অব্দি বিস্তৃত অঞ্চলটা এত গরিব, এত দুঃখী। রাঢ়ের দিকে সবার দৃষ্টি। তার এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে এরা বেঁচে থাকে। রাঢ়ে ফসলকাটা শুরু হলে দলে দলে বাঘড়ী থেকে গরিব

মানুষেরা বেরিয়ে পড়ে। ভিখ মাঙতে যায়, ভাত খেতে যায়—মুখে বলে, মুসাফির চনন্‌ (চললাম) সফরে—হামরা মুসাফির। যাদের জমি আছে—সব্জী আনাজপাতি ফলে, আম কাঁঠাল লিচুর গাছ আছে—তারা বছরের সবসময় গোরু মোষের গাড়িতে মাল বোঝাই করে যাতায়াত করে রাঢ়ে। তার বদলে ধান নিয়ে আসে। আর এক সম্পদ পাট। পাট ওঠার সময় অর্থাৎ শরতকালটা মোটামুটি সচ্ছল। গানবাজনার ঘরোয়া আসর—পূজায়-পার্বণে কি কোন অনুষ্ঠানে—তখনই যা কিছু জমে ওঠে। তারপর তো এইসব চন্দ্রমোহনদের মুখ চেয়ে বসে থাকা। একসময় জমিদারবাবুরা আসর দিতেন। উচ্ছেদের হিড়িক চলেছে, তার ওপর তাঁদের অবস্থাও পড়-পড়।

তবে রাঢ়ে ভদ্রসমাজ আলকাপের প্রতি এখনও মনে মনে বিরূপ। ওখানে আলকাপ বলে না, বলে, ছ্যাচোড় বা ছ্যাঁচড়া। দল আছে অগুনতি—কিন্তু তার মান এত নীচুতে যে ভদ্রসমাজের পাতে দেওয়া চলে না। ইতরজনে গায়, ইতরজনে শোনে। ওস্তাদ ঝাঁকসার বড় ইচ্ছা, রাঢ়ে আলকাপের কদর বাড়ুক। যখনই যাবার সুযোগ হয়, যায়। গিয়ে আলকাপের তত্ত্ব প্রচার করে। ভালভাল কাপ দেয় আসরে। অশ্লীলতা করে না। ভদ্রজন দৈবাৎ উপস্থিত থাকলে, লক্ষ্য করে বলে, আমাদের গাওনার বিষয় আধুনিক। আধুনিক শব্দটা রাঢ়ে বেশ চালু হয়েছে ততদিনে। যারা নিজেদের দলকে এতকাল ছ্যাচোড় বলত, তারা বলতে শুরু করেছে, শুধু আলকাপ নয়—আধুনিক। ভাল দল আসরে নামলে এখন শ্রোতারাই বলে ওঠে, আধুনিক লাগাও, আধুনিক।...

লোকদুটো এসেছে রাঙামাটি থেকে। জঙ্গীপুর থেকে রেলপথে খাগড়াঘাট রোড স্টেশনের পরে চিরোটি। সেখানে নামলে সামান্য পথ মাত্র। ছিমছাম চেহারার যুবকটি শিক্ষিত সভ্যভব্য। নাম পরিতোষ। পরিতোষ মণ্ডল। পরিতোষ বলেছে গিয়ে দেখে আসবেন ওস্তাদজী। রাঙামাটির নাম আছে ইতিহাসে। রাজা শশাঙ্কর রাজধানী ছিল ওখানে। আদিনাম কর্ণসুবর্ণ—কানাসোনা বলে লোকে। নিচে ভাগীরথীর মজা খাত। লাল মাটির বড় বড় ঢিবি—সে এক সিনারি!

সঙ্গের লোকটি মধ্যবয়সী। হাতের চেটো দেখে ধরা যায়, ও ক্ষেতেও গতর খাটায়, মোড়লীও করে গ্রামে; জামাকাপড়ে বিষয়বিত্তের প্রকাশ আছে। বড় বড় দাঁত বের করে বলেছে, আমার নাম হাতেম আলি। বড় সখ ছিল—কত বড় বড় দলের আসর তো দিলাম—একবার আপনার দিই। আপনার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে আজকাল। ধন্য হলাম দেখে। এবার কিনা আমার দেশবাসীকে ধন্য করুন।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলেছে—চোখ বুজে বলেছে, একশো টাকা লাগাবে। পারবেন?

...একশো? ওরা মুখ তাকাতাকি করছিল পরস্পর। আলকাপের দল একশো টাকা রাত! পাড়ায় পাড়ায় দল আছে সব—তারা তো তেল তামাকের বিনিময়েই গান করে বেড়ায়। কিছু চা-মুড়ি থাকলে তো কথাই নেই। সকাল অব্দি চালিয়ে দেবে। একটু ভাল বা নামী যারা—দশ পনের কি পঁচিশে মেলে। বীরভূমের মনকির ওস্তাদ এদিকে গাইতে এসেছে অনেকবার। তার বায়না ত্রিশটাকা। বরকত ওস্তাদও নেয় ত্রিশ। পাতু ওস্তাদ বাড়ির লোক। বারো পেলে বারো, আবার দশ পেল তো দশেই সই। তাছাড়া

কত দল ফেরিওলাদের মত যন্ত্রপাতি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গান করাবেন গো, গান?

এই তো অবস্থা। আর এই লোকটা চায় এ—ক—শো টাকা! রাঙামাটি থেকে কমাইল দূরে—সাঁওতাপাড়া দলের আজকাল নামডাক ভারি। ওরা একেবারে 'আধুনিক।' ওদের দলে যে ছোকরা আছে সে নাকি সাক্ষাৎ মেয়ে—মোহিনীদের রানি। আছে এক নতুন মাস্টার—এখনও তাকে ওস্তাদ বলে না লোকে—কিন্তু সে নাকি একেবারে সিনেমা দেখিয়ে দেয় আলকাপের আসরে।

তারাই বায়না নিয়েছে রাঙামাটিতে। পঁচিশ টাকা মাত্র রাত। আর ওস্তাদ ঝাঁকসা নেবে এ—ক—শো! মগজে আগুন জ্বলে ওঠে ধিকি ধিকি।

ওস্তাদ ঝাঁকসার মুখে অন্য কথা নেই। যা, বলেছি, লাগবে। যদি বলেন, ভাল যাত্রার দল পাবেন এ টাকায়, তাই নিয়ে যান। বহরমপুরের বীণাপণি অপেরার নাম শুনেছি। ওরা আশি টাকা নেয়—কমেই হবে।

পরিতোষ বলে, নাঃ, যাত্রা শুনবে না লোকে। পাড়াগাঁর লোক সব। শুনলেও মন ভরবে না। যাত্রাকে প্রায় ডুবিয়ে দিলে আলকাপ। একে সস্তায় মেলে—তার ওপর লোকও জমে যায় মশামাছিরই মতো। যাই বলুন ওস্তাদ, দেশ বলতে তো ওরাই সব—ওদের নিয়েই পাড়াগাঁ। যা করবার, ওদের বাদ দিয়ে চলে না। তাছাড়া আজকাল যে যুগ পড়েছে, বুঝতেই পারছেন—ওরা যেদিকে ঢলে, সেইদিকে সবটুকু জল গড়িয়ে যায়।...

তীক্ষ্ণদৃষ্টে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকায় ওস্তাদ ঝাঁকসা। তারপর একটু হাসে। কিন্তু বলে না কিছু। এ চরিত্র আজকাল এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। এদের মতিগতি গতিবিধি তার জানা। মানুষ তো কম দেখা হল না এদেশ-সেদেশে।

বলুন ওস্তাদজী!

বলার কী আছে ভাই? জনদরদী মানুষ আপনারা—জনসাধারণের চিত্তের খোরাক কিনতে বেরিয়েছেন। যা যোগ্য দাম, তাই দিয়ে কিনুন। ওস্তাদ ঝাঁকসা আস্তে আস্তে শান্তস্বরে বলে একথা। এখন তার বাচনভঙ্গী, তার কণ্ঠস্বর—সবকিছু শান্তিকাথিত হেডমাস্টারের মতো। উরুর সঙ্গে উরুর আঁকসি-লাগানো, পায়ের ওপর পা—তালিমারা কালো পাম্পসুটার ডগা দুলে দুলে মাটি ছুঁয়ে নিচ্ছে। ভারি সম্ভ্রান্ত আর ধীর গম্ভীর লাগে তাকে। ফের বলে, পরিতোষবাবু, আপনাদের মতো শিক্ষিত যুবকের ওপর আমার বড় ভরসা। আপনারা সাহায্য করলে আমি সারা বাংলাদেশে আলকাপকে মানের আসন দিতে পারি! যা রেট বলেছি, তা সাহায্য বলেই জানবেন।

পরিতোষ যেমন চুপ, তেমনি হাতেম আলিও। হাতেম আলি তার কোটের পকেট থেকে কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বের করে। অন্যমনস্কভাবে ধরে থাকে শুধু।

ওস্তাদ বলে, ঢিপেডাঙার যাত্রা দেখে যাত্রাগানের বিচার হয় না। কলকাতার যাত্রা দেখেই যাত্রার বিচার হবে। তেমনি কোন আদাড় গাঁয়ের 'আলকাটাকাপ' কিংবা রাঢ়ী মানুষদের 'ছ্যাঁচোড়' (রাঢ় অঞ্চলে আলকাপের নাম একদা ছিল ছ্যাঁচোড়) দেখে

আলকাপের বিচার করা উচিত নয়। ঝাঁকসুকে না মানুন, রহিমপুর দেখুন—দেখে বিচার করুন আলকেপেদের—সন্ধ্যায় জুড়ে দিলেন তো দিলেনই—সকাল হল, দুপুর গড়াল—তবু আসর ভাঙবার হুকুম দেবেন না। নিজেরা ভাঙলে বলবেন, পয়সা দেব না। ওদিকে, পাল্লার আসর হলে দুদলের মাঝখানে মাথার ওপর টাঙিয়ে দিলেন কলা আর মেডেল—জিতলে মেডেল হারলে কলা! বুঝুন ঠ্যালা। কোন শালা মাতব্বর তার মীমাংসা করে দেবে কী, মজা দেখবে বরং। আসর যে দল গোটাবে, সেই ভাগছে বলে কলা খাবে—এই তো বিচার আপনাদের! এখন বলুন, এই রক্ত শুকোনো গানের নগদ দক্ষিণা কত হওয়া উচিত, আপনারাই বলুন!

বিব্রত মুখে ওরা বলে, না, না—কলা মেডেল নয়। সে বাজে দলের বেলায় চলে—আপনি হলেন মানী লোক।

মানী লোকের মানের যোগ্য দাম চাই। নয়ত, কাটুন। ...সোজা জবাব—মুখটা লাল আর থমথমে।

আর একবার মুখ তাকাতাকি পরস্পর—তারপর হাতেম আলি কোটের পকেটে হাত চালায়। দশটাকার নোট বের করে। বলে, তাহলে বায়নাপত্র...

সে লোক আছে। পঞ্চানন ভলো মুসাবিদা করে। ওরা তিনজনে আড্ডার দিকে হাঁটতে থাকে। ততক্ষণে দলের সবাই মাঠ থেকে মেলায় হাজির হয়েছে। আমবাগানের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে ওদিকে; হলুদ ফুলে ভরা সরিষার ক্ষেত পেরিয়ে চলে গেছে কুঁড়েঘরগুলোর পৈঠায়। ধোঁওয়া উড়ছে উঁচু ভিটের বেড়াবিহীন ফাঁকা উঠোন থেকে। উনুনে লকড়ী গুঁজছে মেয়েরা। কানের সারবদ্ধ রুপোর আংটায় শেষ রোদের ঝিকিমিকি। তারপর এক সময় গাভীর ডাক, ছাগলের চিৎকার, আজানধ্বনি—তারপর আবছায়া এসে ঢেকে ফেলল সব মাঠ গাছপালা ঘরবাড়ি জনমানুষ আর প্রাণীদের। কুয়াশার ঠাণ্ডা বুরুশ চালিয়ে বাকিটুকুও মুছে দেওয়া হল পৃথিবীতে। কেবল জেগে থাকল মেলায় আসা পায়ের শব্দ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ। বাঁশের বাঁশি, টুকরো আলাপ, গানের কলি—সব ছাপিয়ে কে ডাকতে ডাকতে আসে, ছৈরদ্দি, ছৈরদ্দি হে! ...অমৃল্লো...ও...ও...! তারাচরণ, তারা হে!

ডাকটা বাইরের অন্ধকার বিপুলতা ভেদ করে আছড়ে পড়ে আলোর প্রান্তদেশে। ...ছৈরদ্দি হে...এ...এ! অমূল্লো ...ও ...ও...ও! তারা—চ—রো—ণ!

সাড়া যায় : আমরা আছি—আছি হে—এ—এ!

তারপর সব চুপ কিছুক্ষণ। তারপর মিঠে কাঁপানো গলায় আলকাপের গান ধরেছে কোন তুখোড় রসিক—

মজা লুটিয়ে লে না রে বন্ধু আমরা ও বিদেশী।

ক্রিং ক্রিং ঘণ্টি বাজিয়ে ফজল আসছে সাইকেলে। টর্চ জ্বলে উঠছে মাঝে মাঝে। চাঁদ উঠতে বেশ দেরি আছে। অন্ধকার পথের ঠাণ্ডা ধুলো ক্রমশ শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ভিজে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাড়ছে ধুলোয়। তার ওপর মজা লুটিয়েদের মিছিল চলেছে মেলার দিকে। নানা বয়সের নানা পোশাকের মানুষ। শাপুরের বাঁকে টর্চ জ্বেলে ফজল

অবাক। মাথায় গোল সাদা টুপি, হাঁটু অব্দি জোব্বা জামা পরা একদল যুবক আর কিশোর। ফজলের ঠোঁটে চাপা হাসি খেলে যায়। দলটা চেনা। শাপুরের ওদিকে এক মাদ্রাসা আছে—তার শিক্ষার্থীরা চুপিচুপি মেলায় চলেছে। গাছের আড়ালে বা ছায়ার প্রান্তে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে গান শুনবে। ওরা 'তালেবুল এলেম' (শাস্ত্র শিক্ষার্থী)—লোকে বলে 'তালবিলিম'। মৌলবীসাব শুনতে পেলে দশ হাত নাক ঘষতে হবে মসজিদের সামনে।

সেবারের এক কাণ্ড মনে পড়ে গেল ফজলের।

গান সেরে বিশ্রাম নিচ্ছে দল। এক তালবিলিম গাছের আড়াল থেকে শান্তিকে ইসারা করছে—শান্তি সেটা দেখতেই পায় না। ফজল তাড়া করতেই হাউমাউ করে বলে, বলে দেবেন না জী, আপনার গোড়ে ধরি।

ফজল হাসি চেপে বলেছিল, তা বলব না। কিন্তু ইদিকে ক্যানে জী? পালাও, পালাও, গোনা হবে।

যুবকটি হঠাৎ পকেট থেকে একমুঠো নোট বের করে বলেছিল, ইগুলোন সব দিয়ে দিচ্ছি—দলে নেবেন জী?

ফজল অবাক! দলে? তুমি গান গাইতে পারো? নাচতে পারো?

পারি বৈকি। শুনবেন? বলেই এক বিচিত্র হেঁড়ে গলায় গান শুনিয়ে দিল সে। সেই সঙ্গে কোমর দুলিয়ে সে কী তাজ্জব নাচন-কোঁদন!

ফজল আরও রসিকতা করতে যাচ্ছিল। দৃশ্যটা ওস্তাদের চোখে পড়ায় সেটা আর বেশি দূর গড়াল না। ওস্তাদ এসে প্রথমে এক চাঁটি বেচারার মাথায়—তারপর ফজলকে সেইসঙ্গে গালিগালাজ! যুবকটি জোব্বা-ঝাব্বা নিয়ে দৌড়ে জান বাঁচাতে হিমসিম!

—তবু দুর্ভাগ্য বেচারার। কীভাবে ব্যাপারটা রটে গিয়েছিল। সেদিন বিকেলে দলের লোক তো দেখলই, সারা গ্রাম সকৌতুকে দেখল—জোড়া কতক জুতো গলায় মালার মত পরিয়ে তাকে গ্রাম প্রদক্ষিণে নিয়ে চলেছেন খোদ মৌলবীসাব!

রাতের আসরে সেদিন আলকেপেরা এক জনপ্রিয় কাপ দিয়েছিল—'মৌলবীসাবের কাপ'। এক ভণ্ড মৌলবীর মুখোশ খুলে শ্রোতাদের বড্ড আনন্দ দিয়েছিল ওরা। শেষে ছড়া গাইল ফজল—সঙালও ছড়া গায়—

বাহবা মজা দেখছি দাদা ধন্য কলিকাল।

সে ছড়া আলকাপের এক জনপ্রিয় ছড়া। তাতে মোল্লাপুরুত—ধর্মের ভেকধারীদের সবংশে মস্তক মুণ্ডন করে সাধনোচিত ধামে পাঠানো হয়েছে। আলকাপ কাকেও ছেড়ে কথা কয় না। যা বলে স্পষ্ট বলে—মুখের ওপর বলে।...

সেই 'তালবিলিমে'র দল আজ পথের ওপর আলোর জিভে আটকে গিয়ে কাঠ পাথর।

ফজল টর্চ নিবিয়ে হাসতে হাসতে বলে, কুন্‌ঠে (কোথায়) যাবেন জী?

দলের জবাব নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেছে। ফজল কপেকে চিনেছে ওরা।

ফজল বলে, আজ কোন কেতাব পহড়বেন (পড়বেন) জী? আ মর! বাতচিৎ নাই যে ভাইজানদের! খাড়াও, মৌলবীসাবের কাছে যাছি হামি।

আচমকা দুদ্দাড় ধপধপ আওয়াজ—যেন একদল বাদুড় ভয় পেয়ে অন্ধকারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল! ফজল টর্চ জ্বেলে দেখে, পথ খাঁ খাঁ—ধুলোর ওপর শুধু একটা টুপি পড়ে রয়েছে।

সাইকেল থেকে নেমে টুপিটা সযত্নে ঝাড়ল সে। ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে মাথায় পরল। ফের ওই কিম্ভূত বেশে চলতে থাকল বিনোদিঘী মেলার দিকে।

এতক্ষণে একটু হাসবার সুযোগ পাওয়া গেছে। মনের বার কিছু হালকা লাগে। এতক্ষণ সারা পথ সে শুধু নিজেকে গালমন্দ করেছে, আলকাপকে অভিশাপ দিয়েছে, ওস্তাদজীকে আড়ষ্ট শীতকাঁপা দাঁতে শুকনো চালের মত চিবিয়ে চিবিয়ে পিষেছে আর থুথু ফেলেছে। এবার কেন সারা দেহ মনে তুখোড় রসের ফোয়ারা উথলে ওঠে। পড়ে যাওয়া টুপিটা মাথায় বসে যাদুর খেল দেখাচ্ছে যেন। হাসিতে শরীর ঘুলিয়ে উঠছে। এ গল্প ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে কতক্ষণে শোনাবে, তর সইছে না। আজ আসরে নামবে এই মুসলমানী টুপিটা পরে। আসর যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ এটা খুলবে না। খালি গায়ে তাকে বেশিরভাগ সময় আসরে উঠতে হয়। কপে হওয়ার ভাগ্যি এই—দুরন্ত শীতে হাড় অব্দি নড়ে যায়। তবু উপায় নেই। আজ কিন্তু খালি গায়ে, ফুলন্ত পেট, মাথায় টুপি ফজল কপেকে দেখলেই লোকের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে নির্ঘাৎ। শুধু বাকচাতুরী, কথার পাল্টা রসের কথা দিয়েই তো বড় কপে হওয়া যায় না—চেহারাটাও কিছু বেখাপ্পা থাকা চাই। এমনিতে না থাকলে করে নিতে হয়। শুধু কথা শুনে কতক্ষণ লোক হাসানো সম্ভব? অঙ্গভঙ্গীর অলঙ্কারও তো দরকার!

কতকদূর হাল্কা মনে যায় সে। তারপর হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা। ভয়ে বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে থাকে। লোকের সাড়া পেলে একটু আশ্বস্ত হয়। পথ নির্জন হলে সেই কঠিন ত্রাস! শুধু মনে হয়, সেই গঙ্গার ধারে শিমুলতলা থেকে সারাটি পথ তাকে অনুসরণ করছে চপওয়ালী। তার—

এলোমেলো অনেকটা চুলের নিচে—মুখের দুটো পাশে মাংস নেই, বড় বড় দাঁত—নাকটায় গর্ত, চোখে গর্ত, আধখানা দেহ, একটা পচা স্তন...

মাটি থেকে টেনে তুলেছে শেয়ালগুলো। শকুনের ঝাঁক যাচ্ছে ঝাঁপিয়ে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে ডানার ঝাপটায় কানে তালা ধরে যায়। দুর্গন্ধে বমি আসে। ঢিল মানে না, হাঁকডাক গ্রাহ্য করে না—একপাল ক্ষুধার্ত রাক্ষস কী কাণ্ড না করছে।

আফসোসে দাঁত কিড়মিড় করছিল ফজলের। এত অসহায় বলে কোনদিন মনে হয়নি নিজেকে। চোখ ফেটে জল এসেছিল। বলেছিল, হা রে মানবজম্মো! মানুষের জন্মকে ভেবে কাঁদছিল ফজল সওদার।

তারপর বাঁধের কাছে গিয়ে দেখেছিল, প্রসন্ন একা দাঁড়িয়ে আছে। ফজল বলেছিল, কয়েকখানা কাঠও জুটেনি রে ভাই। পাঠকাঠির তো অভাব নাই দ্যাশে! অমন করে পুঁতে দিলি মানুষটাকে! দিলি দিলি—খানিকটা কাঁটাও যদি গেড়ে দিতিস ওপরে।

কোন কথা বলেনি প্রসন্ন।

তবে পেসন্ন, ঝাঁকসু মানুষ নয়—একটা আজরাইল। কবে কোন বিদ্যাশে আমার যদি মরণ হয়, ও শালা ওস্তাদ আমার লাস পথে ফেলে রেখে বয়ানা মারতে যাবে।

তাকিয়েও দেখবে না, বুঝলে পেসন্ন? 'গেনে' লোকের লাস—জাতভাই মোছলমানে তো ছোঁবেই না, হেঁদুতেও ছোঁবে না—কাপড় তুলে দেখেই ঘেন্নায় পালাবে।—এইসব কথা বলেছিল ফজল। গভীর দুঃখে চলে এসেছিল সে।

সাইকেলে চাপবার সময় প্রসন্ন ডেকেছে, ফজলদা! ওস্তাদকে বলো—ধনপতনগরে যে এত মানুষ, এত আত্মীয়কুটুম বন্ধুবান্ধব তার—কেউ মড়ায় কাঁধ লাগায়নি। চিতের খরচ দেবে কে হে? আমার অবস্থা তো জানো—অনেক কষ্টে সংসার চলছে। চাট্টি সরবতী লাগালাম—ইঁদুরে খেয়ে শেষ করে দিলে। ইদিকে মরশুম এসে গেল—রাঢ়ে যাব ভাবছিলাম, কারুর গাড়িতে ব্যবস্থা করে নিতাম—কিন্তু যাবো কী নিয়ে? কন্দই নাই। শেষে বাজার থেকে খানিক পাউডার আনলাম—ইঁদুর মারা পাউডার। ...দম নিয়ে প্রসন্ন বলেছে, ওই হল কাল, ফজলদা, ওই কিনা কালবীজ!

চমকে উঠে ফজল বলেছিল, ক্যানে প্রসন্ন, ক্যানে?

প্রসন্ন বলেছিল, বউটা কবে বুঝি কথায় কথায় বলেছিল গঙ্গাদিকে—তোমার লাউগাছের গোড়ায় ইঁদুর লেগেছে তো ওষুধ দিও—ভয়ানক বিষ কিন্তু। আমাদের কন্দে লেগেছিল—খুব ভাল কাজ হয়েছে। ..কথাটা বুঝি মনের মধ্যে ছিল গঙ্গাবউদির। সেদিন সাঁঝবেলায় ঘাট থেকে দুটিতে দিব্যি এল গল্প করতে করতে। তাপরে হঠাৎ গঙ্গাদি বললে, হ্যাঁ রে নির্মলা—তোদের ঘরে সেই ইঁদুর মারা বিষ আর আছে? ফজলদা, তোমার দিব্যি, বাবান্দায় লম্ফ জ্বলছিল—সামান্য আলো—তার ওপর চাঁদের আলোর ফিঙ ফুটেছে—কেমন যেন ...কেমন ...শুখা শুখা চেহারা গঙ্গাদির! সদ্য চান করেছে, গায়ে ভিজে কাপড়—আর, বলতে নাই—অমন পিতিমার রূপ, তবু ওইরকম লাগল। গলার স্বরেও বেশ খসখসে ভাঙা—কেমন যেন...

রুদ্ধশ্বাসে ফজল বলেছিল, তারপর, তারপর?

... অমন পাড়ামাতানী মিশুক মেয়ে! তার অমন দশা দেখে সন্দ যে হয়নি, এমন নয়। কিন্তু সবই কপালের লেখা। প্রসন্ন হাউ মাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ...সারাজীবন এ দুঃখ থাকবে ফজলদা, আমি 'তিনি সাঁঝের' বেলায় নিজের হাতে অমন সুন্দর মেয়েটাকে বিষ দিলাম।

নাক মুছে প্রসন্ন টানল ওকে। ... চল, বাড়ির দিকে চল। বউটাতো আজ কদিন থেকে দাঁতে কুটোটি কাটছে না। শুধু কাঁদছে আর মাথা ভাঙছে। নিজের হাতে বিষ দিলাম দিদিকে!

ফজল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, থাক। যাবো না রে পেসন্ন। দেরি হয়ে যাবে।

কিছুদুর সঙ্গে সঙ্গে গেছে প্রসন্ন। তারপর বাকিটুকু বলেছে। ...সেই শেষরেতে অত জাড়ের মধ্যে কোন শালাশালী এল না—কেবল আমরা দুই মাগমরদ আর সুখিবউদি। মেভ· ওস্তাদিন? ফজল অবাক।

হ্যাঁ, তিনজনে ধরাধরি শিমুলতলা নিয়ে গেলাম। ভাগ্যে জ্যোসনা ছিল। তিনজনেই মাটি কোপালাম। পুঁতলাম মেয়েটাকে। পোড়াব কিসে? তা কাঁটা দেওয়ার কথা বলছ। খুবই উচিত ছিল হে! কিন্তু কথাটা তখন মাথায় আসেনি।...

পিছনে মেয়েলী গলায় একটা ডাক শোনা যাচ্ছিল। ...কা গৈলা হো ...হেই রসবতীকী ভাতিজা!

ডাক নয়, গালমন্দের বাড়া। ত্রস্তে প্রসন্ন দৌড়েছে। বউটা ডাকাডাকি শুরু করেছে ফজলদা। একলা ঘরে থাকতে ভয় লাগছে। হামি গেনু হে!...

নাঃ, বড় ছোট লাগছে নিজেকে। এটা অশোভন অসঙ্গত। জীবনে কিছুক্ষণের জন্যে আজ ফজল আর ঝাঁকসু ওস্তাদরূপী শয়তান রাজার ভাঁড় থাকবে না।

মাথার টুপিটা খুলে পকেটে রাখে সে। মনে মনে বলে, ছোটওস্তাদিন, প্রণাম লাও, মাফ করো। তারপর টুপিহারা সেই কমবয়সী লোকটির উদ্দেশে ও বলে, মাফ দিস্ ভাই। আসসালামু আলাইকুম!

পদ্মাভাগীরথীর সীমানাঘেরা চিরসবুজ বাঘড়ী অঞ্চলের আমবাগানে তখনও শীতের কুয়াশা মোছেনি, এখানে রাঢ়বাংলার রাঙামাটিতে গোরুর খুরে ধুলো উড়িয়ে বসন্তকাল এসে গেল। শিরিষ বট অশ্বত্থের শূন্য ডালপালায় শুরু হ'ল ফের সবুজ পাতার ঝাঁপি বোনার পালা। ঢেউখেলানো শস্যহীন ধূ ধূ মাঠে ঘূর্ণিহাওয়ায় খড়কুটো উড়তে থাকল। বাঁজাডাঙার একলা তালগাছের পাতা নড়ল খরখর সর সর। শুকনো ঘাসের নীচে ফের বেরিয়ে পড়ল কাঁকর ঘুটিঙ খোলামকুচি। কোচিঝোপ ফণিমনসা আর মাদারগাছের নীচে সাপগুলোর ঘুম ভাঙল। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার রঙিন ফুলে দিগন্তের আকাশ গেল রেঙে।

এদিকে মরশুমের ফসল ঘরে তুলে কিছুকালের জন্যে পাড়াগাঁয়ের 'রাঢ়ী মানুষেরা' নিশ্চিন্ত। অবসরের সুখ কানায় কানায় মনে ভরা। এবার স্ফূর্তি চাই। মজা লুটবার সময় কিছুদিন।

রোদের তাপ বেড়েছে। সূর্য একটু করে সরে এসেছে উত্তরায়ণের পথে। সামান্য কয়েকফোঁটা ঘাম জমে ওঠে ওঠে নাকের ডগায়, চিবুকে—অলক্ষিতে। অজয় ময়ূরাক্ষী দ্বারকা আর পূর্বসীমায় ভাগীরথী—বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জুড়ে হাজার পাড়াগাঁয়ে এবার খেলার ধুম, হল্লা-হুল্লোড়, রসের বান ডাকল। তালগাছের কচি মোচার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে তেড়েল মানুষেরা। ধূ ধূ নীরসতার দিন এসে গেলে শুধু জলপানেই তৃষ্ণা মেটে না।

বিকেলের মিঠে রোদে পিঠ রেখে, নিজেদের লম্বা-লম্বা ছায়া সামনে নিয়ে, হেঁটে চলেছে একদল 'আলকেপে' অর্থাৎ লোকনাট্যদল আলকাপের লোক। কাঁচারাস্তার দুপাশে কোঙাঝোপ নিশিন্দাগাছ শেয়ালকুলকাঁটার ঝাড়। ডাইনে বাঁয়ে মাঠ—রুক্ষ আর অসমতল। খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে সে-মাঠকে। উড়ছে বগাড়ী আর বনচড়ুইয়ের

ঝাঁক। ক্বচিৎ হাঁটছে দূরে কি কাছে কোন একলা শেয়াল। কিংবা ঘরে ফিরছে কোন কাঠকুড়োনী মেয়ের দল। গাঁইতিকাঁধে সাঁওতাল—হাতে তার তালপাতার শিরে গাঁথা কয়েকটা ইঁদুর, একটা ঢ্যামনা সাপের চামড়া—হয়ত মরা শালিকও।

আলকেপেরা তুখোড় মানুষ। হল্লা ছাড়া হাঁটে না। কিন্তু দলটা মোটামুটি নীরব। তীর্থযাত্রীদের মতো গম্ভীর। সাঁওতাপাড়ার 'আধুনিক' আলকেপেরা: কালো পাথরে তৈরি নিখুঁত গ্রীক ভাস্কর্যের মতো বিশালদেহী 'মেনেজার' আমির আলি। তার কাঁধে চিত্রবিচিত্র ব্যাগ। কোমরে একটা খয়েরী সুতী চাদর জড়ানো। শ্যাওলারঙের পপলিনের হাফশার্ট গায়ে। পরনে টাটকা কাচা ধুতি—হাঁটু অব্দি গোটানো। পায়ে পাম্পসু।

হারমোনিয়ামবাদক কাদু বা কাদের আলি সৌখিন ছিমছাম ধোপদুরস্ত বাবুটি। নীলচে ফুলশার্ট, হাতে ঘড়ি, ধুলোর কোঁচা লুটিয়ে চলে—বেঁটে শ্যামবর্ণ—মোটামুটি সুশ্রী চেহারা—তার কাঁধেও ব্যাগ।

ঘনশ্যাম বাগদী ওরফে কাবুলও আজ তকতকে জামাকাপড় পরেছে। বেজায় ঢ্যাঙা সে—রঙটা ময়লা, মাথায় বাবরী চুল, তবে জুতোর বালাই নেই। পাদুটো নাকি ভারি লাগে হাঁটতে। হাতে নিয়েছে একটা সুন্দর ছড়ি—কাপের সময় কাজে লাগে।

মুখুয্যেদের বকাটে ছেলে নন্দ। বড় চঞ্চল। কাবুলী চপ্পলে আওয়াজ তুলে হাঁটছে। হাতাগুটানো সাদা শার্ট, পাজামাস্টাইলে পরা ধুতি—কোমরে জড়ানো তুষের চাদর। কমবয়সেই নানান অত্যাচারের ছাপ পড়েছে মুখে। সামনের ডাঙাটার কাছে পৌঁছলেই সে একবার গাঁজা খেয়ে নেবে। আপাতত লক্ষ্য এটুকুই।

আর সুবর্ণ। দলের প্রাণপাখিটি। সবুজ বুশশার্টমতো গায়ে, পরনে সবুজ পাজামা, পায়ে সরুফিতের স্লিপার। দুহাতে তিনটে করে ছটা চাঁদির চুড়ি। খোলা চুল কোমর ছুঁয়ে নেমেছে। মুখ ফেরালে চোখে চমক লাগে। মেয়ে না ছেলে! ছেলে না মেয়ে! ...না, কিম্পুরুষদের কথা মনে হয় না। ওর চেহারায় কী একটা আছে।...

একটা চলন্ত নৌকায় একবার এদিক একবার ওদিক হাঁটলে যেমন দেখায়, সুবর্ণর আনাগোনা সেইরকম! সবার আগে চলেছে কালাচাঁদ বুড়ো—কালা বাউরি। দলের গুণীন—তুকতাক তন্তরমন্তরে সিদ্ধপুরুষ। একেলা ফাঁসানো, গলা বসানো, গান জমছে না—এমনতর দুর্ভোগ আসরবিশেষে ঘটেই থাকে। বিপক্ষের কারচুপি সেটা। বগাবগী বাণ ছেড়ে দিয়েছে হয়ত আসরে। সেটা আটকাতে কালা বাউরি সিদ্ধহস্ত। ...তবে, তোমরা মানো না—আজকালকার ছেলে সব, আমরা হলে 'আধুনিক'—আমি বাপু পায়ে হেঁটে যাবই সঙ্গে। তোমরা অবুঝ হতে পারো, আমি তো লই। সেই এতটুকুন বয়েস থেকে দেখে আসছি এসব। ছিলাম 'ছ্যাঁচড়া' দলের 'বালক'—ওই সুবন্নর মতো মাথায় ছিল ঘনকালো কেশ, গলাও ডাকত কোকিলের সুরে। ত্যাখন অবিশ্যি 'আলকাপ' বলত না—'ছোকরা'ও শুনিনি। বালক—ছ্যাঁচোড়দলের বালক! শাস্তর ধরে গান গাই। নাচন-কোঁদন করি কোমর ঘুরিয়ে। তার মধ্যে একটা সঙ—দুটো ছড়া। তাবলে শাস্তরের বাইরে যাবার উপায় নাই। বিপক্ষ যদি 'মা'কে বড় করে পাল্লা ধরল, আমরা ধরতাম 'বাবা'কে বড় করে। শুনবা নাকি ছড়াখান?

এই বলে ভাঙা কাঁপানো গলায় মাঠের মাঝেই জুড়ে দিয়েছে,

(তবে) মাথাছাড়া কত ছেলে জন্মেছে সংসারে গো
মাতাছাড়া কত ছেলে জন্মেছে সংসারে।।...

সুবর্ণ হাসি চাপতে সুন্দর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাতের তালু দিয়ে ঠোঁটদুটো ঢাকে। বলে, ওম্মা! তাই নাকি! এত সব জানতে তোমরা খুড়ো!

সোৎসাহে কালাচাঁদ মাথা নাড়ে। ... হুঁ হুঁ বাবা, গুহ্যতত্ত্ব। আজকাল তো তোমরা সব গুষ্টির পিণ্ডি চটকে দিলে গো সুবন্ন! যত্তসব অশাস্তুরী অকথাকুকথা। ধুৎ!

সুবর্ণ আরও হাসে। বলে, তা যাই বলো বাপু, তোমাদের আমালে সেই মাথার ওপর ছেঁড়া খেজুর তালাই, ভাঙা হেরিকেন ..পরক্ষণে জিভ কেটে থামে সে। বুড়োকে নিয়ে বেশি মজা করতে গেলে এক্ষুণি চেঁচামেচি লাগিয়ে দেবে।

কালাচাঁদ অবশ্য রাগ করে না। বলে, হ্যাঁ, যথার্থ কথা। তা ছিল। তোমাদের মতন সামিয়ানা ডেলাইট আমরা পেতাম না। বাঁশবনে কি গাছতলায় বাঘোৎ আমাদের মতন ছোটলোকের মাগীমদ্দর মিলে আসর জমিয়েছে। একবাণ্ডিল বিড়ি আর চাট্টি মুড়ি—ব্যস! ওই হল বিজিট (ভিজিট) দলের। ...কালাচাঁদ ফোকলা দাঁতে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। ...তবে বললাম—তাহলেও জাত ছিল বাবা সুবন্ন। ময়নাপাখির মতন পরের বুলি আমরা বলতাম না!

সুবর্ণ বলে, পরের বুলি মানে?

ক্যানে?...কয়েকমুহূর্ত ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে কালাচাঁদ। এত সহজ কথাটি বুঝতে পারে না দেখে ওঁর অবাক লাগে। তারপর সে বলে, যাই বলো বাবা সুবন্ন—তোমাদের ওই লতুনমাস্টার জাতকুল সব খেল। এ আমি পষ্ট বলে দিলাম। মেনেজারকেও বলো। মানিক রে! যদি ছিনেমার গানই তোমার কণ্ঠে শুনবে লোকে, তবে পয়সা খরচ করে বহরমপুর টকিবাজি বরঞ্চ দেখবে। কথাটি লতুনমাস্টারকেও বোলো। এটা সব্বনেশে কাণ্ড কিন্তুক।

সুবর্ণ একটুখানি অন্যমনস্ক। তারপর আস্তে বলে, শুনছে তো লোকে।

বুড়ো ভেংচি কেটে বলে, অভিলয় লয় গো, অভিলয় লয় ...হুঁ! গান কী!...

সুবর্ণ ফের হাসি চেপে পিছিয়ে যায়। বুড়ো হনহন করে হাঁটছে। মুখটা ধাবমান ঘোড়ার মত উঁচু। সামনে দলের 'বাহক' নফরআলি—মাথায় হারমোনিয়ামের বাকসো, তার ওপর তবলাজোড়া, পেন্টের ছোট্ট বাকসো। বুড়ো তাকে গিয়ে বলছে, সঙ্গ ছাড়িস না নফ্‌রা। যন্তর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুক।

'যন্তর' অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র আগলে নিয়ে চলেছে কালা গুণীন।

আমির আলি বলে, কী বকরবকর করছিল রে খুড়ো?

সুবর্ণ জবাব দেয়, ছেড়ে দাও খুড়োর কতা। আমিরভাই, আনিসরা কখন পৌঁছবে?

আনিস? ...একটু চুপ করে থাকে আমির আলি। একটু ভেবে নিয়ে বলে, মাস্টার নাকি গাঁতলায় আছে শুনেছি। যদি সেখানেই থাকে, ওনাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছবে

ঠিকসময়। না থাকলে ভাবনার কথা। তবে সাইকেলে গেছে—যে রাজ্যে থাক, ধরে নিয়ে আসবেই।

সুবর্ণ বলে, যদি না আসে?

আমির গোমড়ামুখে জবাব দেয়, না আসে না আসবে। অত ধরাধরি সাধাসাধির ধার ধারে না সাঁওতাপাড়া। বিশ-পঞ্চাশ ধারি না কারো। জন্মদাতা পাতুওস্তাদকেই পাত্তা দিলাম না—তো সনাতন মাস্টার!

বড় গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ এই আমির আলি। অকৃতজ্ঞ লাগে সুবর্ণর। সনাতন মাস্টারের সঙ্গগুণেই আজ সাঁওতাপাড়া ঝাঁকসু ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সুযোগ পেয়েছে। নয়ত রাঙামাটির লোকেরা পাল্টা দল আনতে চলে যেত নলহাটির মনকির ওস্তাদ অথবা তুড়িগ্রামের লাতুর কাছে। আজ যে লোকে সাঁওতাপাড়াকে এত বড় ভাবছে, তার মূলে তো ওই নতুন মাস্টারেরই দান সবটুকু। যদি না শেখাতো এমন সব সুন্দর গান, নাচের ভঙ্গী, কাপের রকমারি ফ্যাসান! সুবর্ণ কৃতজ্ঞ মনে মনে। সনাতনদাই তার চারপাশটা খোলামেলা করে দিয়েছেন। ইচ্ছেমতো এখন ফুল হয়ে ফোটো, গাছ হয়ে ডালপালা ছাড়াও—মাথার ওপর অনেক রোদবাতাস।

সুবর্ণ পিছিয়ে আসে। চাপাস্বরে ডাকে কাবুলকে। লম্বালম্বা পা ফেলে সে হাঁটছিল। গতি কমায়। কি রে শালা মুদ্দোফরাস?

গাল কানে নেয় না সুবর্ণ। ফিসফিস করে বলে, সঙাল সত্যি গেছে নতুন মাস্টারের কাছে?

কাবুল বলে, ক্যানে? পীরিতের লদী উথলে উঠেছে তোর? শালা চামার!

গাল দিও না বাপু। সুবর্ণ একটু হাসে।...

এগিয়ে আসে নন্দ। বলে, শ্যামচাঁদের বাঁশি না বাজলে তো রাধিকে নাচবে না রে কাবুল! সখি আসবেন, শ্যাম আসবেন। ধৈর্য ধরো। ...গুনগুনিয়ে ওঠে সে। .. 'রন্ধু ধৈর্যং রাই ধৈর্যং, শ্যাম গচ্ছং মথুরায়ে।' তা সুবর্ণ, ভাবিস নে রে ভাবিস নে। যা, কাদুর কাছে যা দিকিন। বেচারা এতক্ষণ পরীক্ষা করছে। সবার পিছনে ঢিমেতেতালা হাঁটছে—পরীক্ষা করে দেখছে, দেখি, সুবর্ণ প্রিয়তমা নিজে থেকে কাছে আসে নাকি ...অশ্লীল হেসে ওঠে সে। কাবুলের কাঁধে হাত রাখার চেষ্টা করে ফের বলে. চলো স্যাঙাত—একবার বাঁশিতে ফুঁ দিই। ভাল মাল আছে মাইরি— সারগাছির মাঠের তাজা জিনিস। শালা গবরমেন্ট শেষঅব্দি মাঠময় গাঁজা বুনে দিয়েছে হে! বড় জনদরদী আমাদের ভোটের সরকার।...

ওরা এবার ছিলিমে বসবে। দল এগিয়ে যাক কদ্দুর! বাঁকীনদীর পাড়ে অপেক্ষা করতেই হবে।

তবে মিথ্যে বলেনি নন্দ। সবার মন রাখতে প্রাণান্ত সুবর্ণর। একজন সঙ্গে একটু হাসাহাসি ঢলাঢলি দেখলে অন্যজনের মুখে আষাঢ়ের মেঘ। উঃ! ছোকরা হওয়ার কী জ্বালা রে বাবা! সুবর্ণ কাদের আলির পাশে এসেই বুঝেছে, মেঘ জমজমাট।

হাত বাড়িয়ে গলা জড়ানোর অপেক্ষা শুধু। কাদু হাতটা আলগোছে সরিয়ে দেয়

অবশ্য। মেঘ কেটেছে বলে মনে হল সুবর্ণর। এত সামান্যতেই মানুষ রাগ করে —আবার সামান্যতেই খুশি ওঠে। সুবর্ণ মিষ্টি হেসে কটাক্ষ হানে, কাদুভাই, ছিলিম টানবে ছিলিম?

নাঃ। কাদু মাথা নাড়ে। ব্যাগ দেখিয়ে বলে, সকালে বহরমপুর গেলাম। তোকে বললাম, আয়। গেলিনে। উনচল্লিশ টাকার বোতল এনেছি--খাস বিলিতি মাল।

সুবর্ণ চোখ বড় করে বলে, উ-ন-চ-ল্লি-শ!

তাচ্ছিল্য করে হাসে কাদু। দুমণ ধানের দাম। মহা ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা। তার মান রাখতে হবে না!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুবর্ণ। অনেক জোতজমার মালিক কাদের আলি। এত কমবয়সে সংসারের কর্তা হয়েছে। সব উড়িয়ে ফকির হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। ফারাজী (পিউরিটান) মুসলমানের ছেলে—সমাজে বড় কড়াকড়ি। একে আলকাপ, তায় ছেলেকে মেয়ে সাজানোর জঘন্য গোনা। কাদের যেমন একঘরে, তেমনি অন্যরাও। এখনও বুক কাঁপে সুবর্ণর। প্রথম যখন দল করল, সুবর্ণ সবে ছোকরা হয়েছে, লুকিয়ে বাউরিপাড়ায় মহড়া দেয়। মুসলমানপাড়ার লোকেরা এসে চড়াও হল একদিন। কে কোথায় পালিয়ে বাঁচে তখন। শেষঅব্দি বাবুপাড়ায় লোকেরা পাল্টা রুখে দাঁড়াল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার উপক্রম। থানাপুলিশ হল। সে এক কাহিনী।

এখন অবশ্যি সয়ে গেছে সব। ওদের সমাজেই ভাঙন ধরেছে। একদল মানুষ কাদের আলিদের সমর্থন করে। শুধু সমর্থন করে না—প্রকাশ্যে মুসলমানপাড়ার মধ্যে খোলামেলায় মহড়া দিতে বাধ্য করে। করুক, এ তো ভালই হয়েছে। সুবর্ণর চুল কেটে নেবার শাসানি আর শোনা যায় না মুসলমানপাড়ার। এখন সে অনেকের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় নির্বিবাদে। সব গেরস্থর হাঁড়ির খবর রাখে। মেয়েরা কেউ ওর বুবু, কেউ ফুফু, কেউ নানী—কেউবা ভাবী। আবার কেউ কেউ ওর 'সতীন'। মেয়েলীপনা করে বলে, কী রাঁধলে সতীন?...

সুবর্ণ বলে, ভাবী জানলে মুড়ো ঝাঁটা মারবে দেখে নিও।

কাদু জবাব দেয়, সে কোথায় আর আমি কোথায়! আজ তিন-চারমাস বউর কাছে শুইনি, তা জানিস? বাড়ি থাকলে খাবার সময় চুপচাপ খেয়ে আসি—তারপর তোদের সঙ্গে আড্ডা মারি।

হেসে ওঠে সুবর্ণ। ...ওম্মা! কেন, কেন?

দেখছি। মেয়ে ছাড়া পুরুষ বাঁচে কিনা সংসারে। তাই পরীক্ষা করে দেখছি।

ভাবী কিছু বলে না?

রাতে বাড়ি গেলে তো বলবে। আমি রিহারসালঘরেই শুয়ে থাকি।

কথা শুনে সুবর্ণ অবাক। একটু পরে বলে, এবার থেকে আমিও শোব তোমার কাছে। বাড়িতেই শুই—তার চেয়ে ম্যানেজারের বৈঠকখানার বিছানাটা নিশ্চয় ভাল পাব। খিলখিলিয়ে হাসে সে।

কাদু ওর হাতটা হাতে নেয়। বলে শুস্। আমি—আমি তো বনের পশু নই সুবর্ণ,

আমি মানুষ রে, মানুষ। তুই শুনে আমার ভালই লাগবে। পরক্ষণে সকৌতুকে বলে সে, আমি অবশ্যি নতুন মাস্টার নই। তোর কেমন লাগবে কী জানি! অত রসকষ আমার নেই। চাষার ছেলে!

সুবর্ণ আহত মনে মনে। বলে, নতুন মাস্টারকে কেন এত হিংসে তোমাদের কাদুভাই?

যাঃ! হিংসে কিসের?

না—তোমরা সবাই ওকে হিংসে করো। ও আমি বেশ বুঝি।

কাদু ব্যস্ত হয়ে বলে, যে করবে করুক, আমি করিনে। ছেড়ে দে ও-কথা। সেদিন কী গানটা গাইছিলি রে সুবর্ণ, সুরটা ঠিক জমাতে পারিনি যন্ত্রে—গা দিকিনি!

সুবর্ণ ক্ষুব্ধমুখে বিড়বিড় করে, আমি তো মেয়ে নই। আমার দশায় পড়লে মেয়েরা গলায় দড়ি দিয়ে মরত। কী করে বোঝাব, আমি কী?

কাদু অবশ্য তামাসা করে, ক্যানে? সেদিন দীঘির পাড়ে বসে বেশ তো বলছিলি রে সুবণ, আমি মেয়ে হলে আপনাকে ভুলতে পারতাম না—হি হি হি ...হাসির চাপে নড়ে ওঠে সে।

বলেছি, বেশ করেছি। সুবর্ণ পা বাড়ায়। ... ঠিক বলেছি। আর তোমরা বুঝি সবসময় গোয়েন্দার মত পিছনে লেগে থাকো? জানতাম না কথাটা—আজ জানলাম।

কাদু দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরে। ধুস্ শালা! ছেড়ে দে অকথা। তোকে আমরা খুব ভালবাসিরে সুবর্ণ, খু-উ-ব। নে, এবার ধর দিকিনি সেই মন-উড়ুউড়ু গানখানা...আহা, কী যাদু আছে রে! বুকটা খালি করে দেয় একেবারে। লাগা!...

সুবর্ণ জবাব দেয় না। ভাবছে। চুপচাপ ভাবছে। কালাখুড়োর কথাগুলো নিয়ে মনটা তোপাড় হচ্ছে তার। সেই যে আজেবাজে দলের আনাড়ি ছোকরারা সেকেলে একটা গান গায়,

> বালুচরে ঘর বাঁধিলাম, ভেসে গেল জলে হে,
> (ক্যানে) বালুচরে ঘর বানাইলাম।...

বালুচরের ঘর। আজ একটুখানি হেসে কথাবলা, অল্পখানিক ছুঁয়ে থাকা, পাশে শোওয়া—এমনকি অসভ্য ঠোঁটগুলোর লোভী নিলাজ অপেক্ষা সারাক্ষণ তারপর তো বয়সের দয়াহীন ভয়ঙ্কর বানের জল সুন্দর শরীরে ধ্বস ছাড়াবে। প্রতিমার রাংতা যাবে ভেসে। রঙ গলবে। গলবে মাটি। বেরিয়ে পড়বে খড়মাটির টুকরো। বিসর্জনের রুক্ষ নীরস টাটখানা যেন খরার শুকনো নদীর চরে পড়ে থাকা। কেউ নেই ধারেকাছে। তুমি একেবারে ন্যাংটো হয়ে গেছ। একলা হয়ে পড়েছ। তুমি তখন কঠোর পুরুষ। ভালবাসা কেন—দয়া করবারও মানুষ নেই। ...তাই, ভেবে ভেবে পাগল হই—ওই কালাখুড়োও একদিন বালক ছিল। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। খুঁজে দেখি। তোবড়ানো গাল, ভাঙা দাঁত, জোঁকের মত বিচ্ছিরি ঠোঁট—ওই ছেঁড়াখোঁড়া দলাপাকানো কাগজের মতো তামাটে মুখটা দেখে গা শিউরে ওঠে। অথচ একদিন তার ওই শরীরে বাস করেছিল এক মোহিনী নটী। ...কেউ না বুঝুক, আমি তো বুঝি—কেন আজও কালাচাঁদ খুড়ো

এ বয়সেও ধুঁকতে ধুঁকতে দলের সঙ্গে যায়! গুণ নয়, মন্তরতন্তর নয়—ওটা ছল। ওটা ওর অসহায় মুখোশ। কালাখুড়ো ভুলতে পারে না পিছনটাকে। পিছনের নটীর স্মৃতি ওকে উত্ত্যক্ত করে। পাগল হয়ে ছুটে আসে তখন। সেই জগতে ছুটে এসে নিশ্বাস নিতে চায়। মিলিয়ে দেখে, হাত বুলিয়ে পরখ করে—এই সেই পুরনো ঘরের দেয়াল! ওই সব খাটপালঙ্ক আসবাব তার অচেনা। দেয়ালের রঙ নতুন লাগে। মনোমত হয় না। আফসোস করে বলে, ইটা ঠিক লয়, ঠিক লয়! ...সে খোঁজে তার বয়সের অতলজলে হারানো কোন এক মোহিনী প্রতিবাস—যে নারী—কিংবা নারী নয়, পুরুষ তবু পুরুষ নয় — বিরল মায়া! তারপর তো আমিও একদিন কালাখুড়ো হয়ে যাবো তখন? ...

ধুর ছাই! কার কথা ভাবছে সুবর্ণ? কার চোখে দেখছে? নতুন মাস্টারের কথা—নতুন মাস্টারের চোখজোড়া! এতসব ভেবে বসেছে লোকটা! মাত্র বছরখানেকের আসা এ লাইনে—এরই মধ্যে কত কী ভাবা হয়ে গেল, জানা হয়ে গেল। রাগ লাগে, ভয় করে, চমক লাগে—আবার ভালোও লাগে শুনতে। .. সুবর্ণ, সাবধান। ওরা তোমার মজা লুটিয়েরা। চুষে ছিবড়ে হলেই ফেলে দেবে। তাকিয়েও দেখবে না। ...তাই বলছি সুবর্ণ, এখন থেকে তৈরি হও। গানকে সাধনার বস্তু বলে জানো। তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করো। কল্পনাশক্তি বাড়াও। রচনা শুধু শক্তি থেকেই হয় না, হয় অভ্যাস থেকে। এই যে দেখছ, আমি দিব্যি এক বছরের মধ্যে মুখে মুখে পয়ার বাঁধতে শিখে গেলাম—এ আমার অভ্যাস, সাধনা মাত্র। যখন চুল কাটবার দিন এসে যাবে, ঘরে ফিরে পুরুষেরা চিরকেলে মনখানি খুঁজে নিতে হবে, তখন যেন সংসারের বিস্মৃতির অবহেলা সইতে না হয়। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। ছিলে ছোকরা—তারপর হবে ওস্তাদ। কেমন সুবর্ণ?

সুবর্ণ হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার মনেই থাকে না যে সে পুরুষ, সতের বছরের কিশোর। সব বদলাবে ; তার এই মন—সাত বছর ধরে তৈরি মনটা কি বদলাবে কোনদিন? এই যে তার আয়নার সামনে সাজ করে সেজেগুজে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা, মুগ্ধ হয়ে ওঠা নিজের ওপর—নিজের ওপর অনন্ত ভালবাসায় প্রেমে অধীর হয়ে ওঠা—আর নিজেকে কেবলই কারো কাছে নিঃশেষে সঁপে দেবার গোপন সাধ, কেউ এ রূপের ললিত তরল স্রোতের ধারাকে নদীর মত নিজের বুক চিরে বয়ে যেতে দিক—এইসব অদ্ভুত ইচ্ছাবাসনা চিন্তাভাবনা কবে কোনদিন কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

আর একদিন—এক নিশুতি রাতে এমনি গভীর বিহ্বলতায় সে বলে উঠেছিল নতুন মাস্টারকে। ...সত্যি, আমার আজ এত ভালো লাগছে কেন বলুন তো মাস্টারমশাই? দেবার মতো কিছু থাকলে আজ তা সবটাই দিতে পারতাম। ...পরক্ষণে অন্ধকারে চাপা হাসির শব্দ। ...মেয়েরা এরকম বলে, না মাস্টারমাশাই? কাকেও কখনো ভালবেসে দেখেছেন? ...মেয়েরা এমন কথা জানে গো? আঃ, বলুন না! আমি আলকাপের ছোকরা, কাপের (নাটকের) মধ্যে বলে-বলে কত মজার কথা না রপ্ত করেছি! তাই না! নিজেই বুঝতে পারি, এ আমার ময়নাপাখির বুলি। কিন্তু বলতে বলতে যেন সত্যি বলছি

মনে হয়। মুখের কথা মনের কথা হয়ে যায়। যায় না?...ও মাস্টার? বলুন না, কোন মেয়ে আপনাকে কেমন করে ভালবেসেছে! কি বলেছে সে? বলবেন না? মাস্টারমশাই, ওগো!

নতুন মাস্টারের নাক ডাকছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবর্ণ অস্ফুট বলেছে, নাঃ, ঘুমোই বাবা! কাল আবার রাত জাগতে হবে।

এইজন্যেই ম্যানেজার আমির আলি ধমকায় তাকে। ...শালা ছোটলোকের জাত—বেড়াত মাঠেমাঠে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে খুঁজে—ভাগ্যিস পড়েছিল আলকাপের দলে। বুলি ফুটেছে। রা হয়েছে চোপায়। পণ্ডিতের মাগ হয়েছে সুবন্ন। শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর—ভ্যানর ভ্যানর—বকর বকর...

তখন 'বাহক' নফর আলির মন্তব্য : পায়রাটা মস্তেছে গো, মস্তেছে!

সুবর্ণ আহত হয় মনে মনে। পরে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, না, ম্যানেজার নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে আমাকে। আদর করে গাল দেয়।...

কিন্তু বাঁকীনদীর অববাহিকায় মাঠের পথে এতক্ষণে আমির আলির বাজখাঁই চীৎকারটা সত্যি গালিগালাজ। ... হেই গেনের ব্যাটারা! পা চালিয়ে আসবে নাকি?

সবাই প্রায় দৌড়ে সঙ্গে ধরতে চায়। দেমাকী ম্যানেজারটাকে সবাই ভয়ভক্তি করে।

সবে গোমস্তাবাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে চট টাঙিয়ে চারটে হেরিকেনের আলোয় ছোট্ট আসরখানা তৈরি হয়েছে। চারপাশের দাওয়ায় মুসলমান মেয়েরা তালাই পেতে অন্ধকারে বসেছে। আসরের আসরের চারপাশে জনাপঞ্চাশ লোকের জটলা। বাদ্যযন্ত্র গেছে। দু-দুটো অবোধ বালিকাবেশী ছোকরা সেজেগুজে বসে পড়েছে তার সামনে। মাস্টার আসবার অপেক্ষা শুধু।

এলেই সমবেত জয়ধ্বনি দিয়ে শুরু হবে আসব। শ্রোতাবা প্রস্তুত। প্রস্তুত আলকেপেরা। কোবাদ গোমস্তার ছেলে দলের ম্যানেজার। বুড়ো গোমস্তাও গানের নেশায় চিরকাল বুঁদ। এককালে ইমামযাত্রায় এজিদ বাদশা সাজত। 'বন্দে'র গানে বইয়ালি (স্মারক) করত। জারিগানের ছিল মুখপাত্র। কাজেই কালের হাওয়ার গতিকমত যে-আলকাপ আজ ছ্যাঁচোড় নামক ইতরামির পুরনো ডিম ভেঙে তাজা পাখির মত কাকলীতে দেশ মাতাচ্ছে, তার ব্যাপারে উৎসাহ তার স্বাভাবিক। তবে সমাজে-গাঁয়ে মানীভদ্রজনে দোষ দিচ্ছে। ছিঃ বুড়ো বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়লেন গোমস্তাসাহেব? ভিড়লেন যদি, তবে যাত্রাটাত্রা হলে কথা ছিল—ওই আলকাটাকাপ? ..কুলোকে আরও নিন্দে করে বলছে, জানো মজার কাণ্ড? বাপব্যাটা দুজনেই এখন ছোকরা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ধিক্! অনুকুল বাগদীর সেই নাকে ছিকনি পড়া পেঁচোটা আর গরিব শেখের খেঁকশিয়ালপানা ছেলেটা—গোমস্তা দুটোরই দায়দায়িত্ব নিয়েছে। মানে দশটাকা হিসেবে মাইনে, খোরাকী—পোশাক-আশাক যা লাগে! উঃ! মুনিশ খাটতে গিয়ে গরিবগুরবো মানুষ যদি এক টাকার বেলায় এক টাকা দু'আনা চায়, কঞ্জুসটা বাপ তুলে গাল দেয় হে! ধিক!

এইরকম সখের দলের সখের আসরটা মুহূর্তে বরবাদ করে দিতে হাজির হয়েছে একটা লোক। সনাতন মাস্টার চোখ বুজে সিগ্রেট টানছে তো টানছেই। মুখে কথা নেই।

গুজব ছড়াচ্ছিল টুকটাক। মুহূর্তে আসর নড়বড় করে উঠেছে। একজন দু'জন করে বাইরের ঘরের সামনে ভিড় জমাচ্ছে। আসর খালি হয়ে যাচ্ছে দেখে সামনের বড় ঘরের বারান্দা থেকে গোমস্তা চেঁচাচ্ছে, সবুর, সবুর, তোমরা সব যেও না। আরম্ভ হল বলে! ও হালিম, মাস্টারমশাইকে ডাক রে!

কে কাকে ডাকবে! রটে গেছে, সাঁওতাপাড়ার প্রখ্যাত সঙাল আনিস এসেছে বাইরে। মুখোমুখি দেখার জন্যে অনেকগুলো মুণ্ডু ক্রমাগত জিরাফের মত গ্রীবা বাড়াচ্ছে। বৈঠকখানা ঘরের ভিতর বসে আছে আনিস। বাসরে! সেই তুখোড় কপে—সুবর্ণর সঙ্গে ড়ুয়েটে উঠলে যেমন গানে তেমনি নাচে, আবার তেমনি হাসির কথায় আসরকে দুলিয়ে দেয় তোলপাড়! সেই আনিস! আহা, দেখি, দেখি, নয়ন সার্থক করে দেখি হে! ... নানা মন্তব্য, নানা ফিসফিস, গুজগুজ চারপাশে। ...তবে দ্যাখ হাতেমদা, বলেছিলাম না, আমাদের নতুন মাস্টার যেমন তেমন নয়। খুব বড় মাস্টার হে! ওস্তাদ, ওস্তাদ ! ...বক্তা অনুকূল বাগ্দী। তার ছেলে একদিন সুবর্ণ হবে। এই তার আনন্দ। একই শিক্ষাদাতা—হবে না কেন? ... কে ফুট কাটে পিছন থেকে, ...সুবন্নর মূল শিক্ষা পাতু ওস্তাদের হাতে। লতুন মাস্টার শুধু ফ্যাসান শিখিয়েছে মাত্তর! এত কম বয়সে ওস্তাদ হওয়া চাট্টিখানি কথা লয়। দেরি আছে।

অনুকূলের সঙ্গে লোকটার বচসা লেগে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।...

আনিস রুমালে মুখ মুছে বলে, কই, উঠুন। প্রথম আসর আমাদেরই নিতে হবে। নয়ত ঝাঁকসাকে বাগ মানাতে পারব না।

সনাতন মাস্টার ভাবছে। এদের ক্ষিদের মুখে ছাই পড়বে। নতুন দল—অ্যাদ্দিন মহড়া দিয়ে প্রথম আসরে নামছে। কাল সকালে চুক্তির বাকি টাকা পাওয়া যাবে। ...তাছাড়া, এমনি হঠাৎ বায়নার দিন—একেবারে বেরিয়ে পড়ার মুখে সাঁওতাপাড়ার ডাক এসেছে। কেন? বায়না তো আগেই হয়েছিল। তখন বুঝি মনে পড়েনি সনাতনের কথা? শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে ভেবেছে, নতুন ফ্যাসানের বাঁদর নাচাতে সেই লোকটিকেই চাই—যার লাঠি ছাড়া বাঁদর নাচবে না—কেমন?

সনাতন তক্তাপোষের কাঠে সিগ্রেটটুকু ঘষে নিভিয়ে দেয়। তারপর বলে, তা আনিস—বড় দেরি করে এসেছ হে! যাওয়া অসম্ভব। ম্যানেজারকে বলো—মাফ করে দেয় যেন।

আনিস একটু হাসে। সবই বোঝে সে। একটু চাপা গলায় মুখ নামিয়ে বলে, ওদের কথা বাদ দিন। সুবর্ণ—সুবর্ণর মান বাঁচাতে আপনাকে ডাকতে এসেছি মাস্টারমশাই। আজ দুদিন থেকে ও আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করছে, আনিসভাই, নতুন মাস্টারকে নিয়ে এস। ...আমির আলিকে কথাটা বলতেই রাজি হল অবশ্যি। তবে ও গোঁয়ার মূর্খ লোকটার কথা ছেড়ে দিন। ...বিশ্বাস করবেন, আপনি যদি আজ আমার কথা না রাখেন, এ জীবনে আমি আর গান করব না? তৌবা করে মসজিদে গিয়ে ঢুকব। আমি এক বাবার পয়দা ছেলে, মাস্টারমশাই।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। আনিস আরও বলে, যেদিন শুনেছি দলের লোকে আপনাকে আর সুবর্ণকে নিয়ে যা তা বলছে, সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—সনাতনদা বাদ গেলে সাঁওতাপাড়ার দলও আমি যেভাবে পারি, ভেঙে দেব।

জেলার নামকরা রোড কন্ট্রাকটারের ছেলে আনিস। ম্যাট্রিক পাশ। বাবার মৃত্যুর পর কন্ট্রাকটারী করতে গিয়ে লোকসান মেরে ফতুর হয়েছিল। তারপর হঠাৎ আলকাপের নেশায় মজে গেল একদিন। দলের মধ্যে এই একটি যুবকই জ্ঞানবুদ্ধিতে সততায় স্পষ্টভাষীতায় অনন্য।

সনাতন ভাবছে আর ভাবছে। ফের সিগ্রেট জ্বেলেছে। চোখ দুটো বোজা। ...বায়না হবার পর কথাটা উঠেছিল। কেউ গা করলে না। হোক ওস্তাদ ঝাঁকসা, চালিয়ে দেব। সুবর্ণ একাই একশো। তাছাড়া, কবিয়ালী তো আমরা ছেঁটেই দিয়েছি আপনার কথায়। বিনি ওস্তাদেই আসর চলে যাবে। তখনই আমার রাগ হয়েছিল। ধিক শালা নেমকহারামের দল। তবে হ্যাঁ, আপনাকে লুকোব না—ওস্তাদ ঝাঁকসাকে কখনও দেখিনি, তার সঙাল ফজলেরও নাম শুনেছি। বড় লোভ ছিল মনে, মাস্টারমশাই। বুঝলেন?

সনাতন চোখ খুলে মিটিমিটি হাসে। ...আমারও।

...তবে দেরি করবেন না। উঠুন। আমি গোমস্তাকে বুঝিয়ে বলছি। দরকার হলে হাতেপায়েও ধরে ফেলব। বলতে বলতে অবিকল আসরের কাপের ভঙ্গীতে হাসে সে। পলকে ভিড় হা হা হো হো করে হেসে ওঠে। আনিস করজোড়ে বলে, ভাই বন্ধুরা, আপনারা দয়া করে আজকের রাতটুকু ওনাকে ছেড়ে দেন। কথা দিচ্ছি, যেদিন বলবেন, আমি সুবর্ণকে শুদ্ধ এখানে এনে আপনাদের দলে মিশে গান শুনিয়ে যাব।

ভিড়ের ফাঁকে গোমস্তা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার বলে, আলবাৎ যাবে মাস্টার। বা রে! ঝাঁকসুর সঙ্গে পাল্লা—যাবে না মানে? যাও বাবা মাস্টার, গান করে এসো। আমাদের ঘরের দল, ঘরেই আসর—যখন খুশি শুনব। আমরা তো বাণিজ্য করবার জন্যে দল করিনি রে বাবা! যাও, যাও—দেরি কর না। তা বাপধন ইয়ে, কোথায় বায়না?

রাঙামাটি। বলে প্রায় লাফ দিয়ে আনিস বেরোয়। ভিড় সরে যায়।

সনাতন মাস্টার ব্যাগ গোছাচ্ছে।

বাইরে তফাতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেরিকেনের আলোয় তাদের কৌতূহলী মুখগুলো দেখা যাচ্ছে। ফিসফিস গুঞ্জন সেখানে। সঙাল, সঙাল! গত পুজোয় বারোয়ারিতলায় বায়না ছিল সাঁওতাপাড়ার। সবাই শুনে এসেছিল ওদের মনমাতানো গান। এক বুড়ি বলে উঠেছে, মর! ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়াটাকে নিয়ে নাচনকোদন করে বেড়ায় মুখপোড়ারা। এবং তা শুনে এক যুবতী খিলখিলিয়ে হাসছে। ...না না চোখের মাথা খেয়েছিস! মেয়া লয়, ছেলা।

বুড়ি বলছে, ছেলা! তবে কি ভেলকি দেখালে জাদুঅলারা? আহা, বড় সোন্দর মুখখানা!

অলিগলি কিছুদূর হেঁটে সদর রাস্তা। জনতা চলেছে সঙ্গে। বারোয়ারিতলায় তাসের আসর বসেছে। মুখ তুলে তাকায় ওরা। ...কারা যায়?

...সাঁওতাপাড়ার সঙাল। এসেছিল আমাদের মাস্টারকে নিয়ে যেতে। রাঙামাটিতে ঝাঁকসু চাঁইয়ের সঙ্গে পাল্লা হবে।

...কার সঙ্গে?

...ঝাঁকসু গো, ওস্তাদ ঝাঁকসু।

...ইয়ারকির আর জায়গা পেলে না?

সাইকেলের কেরিয়ারে চেপেছে সনাতন, আনিস অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে প্যাডেল ঠেলছে। যেতে যেতে ওদের কানে আসে, বারোয়ারীতলায় তর্ক চলেছে জোর। দ্বারকানদীর তীরে গাঁতলা গ্রামে। নদীর পাড়ে যারা থাকে, তারা সচরাচর দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হয়। বচসার সুর শুনে ভাবনা হয়, যথারীতি বুঝি লাঠি সড়কি নিয়ে বেরিয়ে না পড়ে শেষ অব্দি।

ফাঁকা মাঠে পৌঁছে সনাতন মুখ খোলে। সুবর্ণ ডাকে চিঠি লিখেছিল। কাল পেয়েছি।

সাইকেল চালানো পরিশ্রমের শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশে আনিসের কথা শোনা যায় : সুবর্ণ আপনাকে ভালবাসে।

ভালবাসে! কেমন ভালবাসা—কিসের ভালবাসা? ...সারা পথ ভেবেছে সনাতন মাস্টার। ব্যঙ্গে ঘৃণায় ঠোঁট কুঁচকে গেছে তার। মন বিস্বাদে কিছুক্ষণ ভরে উঠেছে। তারপর গলা ফাটিয়ে হাসতে চেয়েছে। হাসছেও। আনিস সীট থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে, কী হল? হাসছেন কেন?

সনাতন বলেছে, এমনি। আর কদ্দুর?

এখনও মাইল তিনেক তো বটেই। রাস্তাঘাট ভাল। কষ্ট হচ্ছে না তো?

নাঃ।

সুবর্ণ তাকে ভালবাসে! কী সব ভাবে এই লোকগুলো! সুবর্ণ যদি মেয়ে হত, কোন মানে খুঁজে পাওয়া যেত এ কথার। একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে ভালবাসে। বেশ তো, সেটার আসল নাম বন্ধুতা। সেটা সমবয়সী দুজনের মধ্যে সম্ভব! এখানে একজন ষোল-সতের, অন্যজন পঁচিশের মধ্যে। গুরু আর সাগরেদ। বন্ধুতা সম্ভব কদাচ নয়। একজনের শ্রদ্ধা, অন্যজনের স্নেহ। তা নয়, ভালবাসা! স্রেফ নির্ভেজাল 'ভালবাসা!' কী মানে হয় এর? কথাটার গুরুত্ব এত দিত না সনাতন মাস্টার। সুবর্ণর চিঠিতে ওই কথাটি লেখা ছিল। আনিসও ওই কথাটি স্পষ্ট বলে বসল।

যেন নবীনা রজকিনী সুবর্ণ। চণ্ডীদাসী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়। বাঃ রে, সুবর্ণ বাঃ! চমৎকার বুলি শিখেছিস তুই! একদিক থেকে ভাবলে তো, কথাটা ওইরকমই দাঁড়ায়।

...অথচ, হঠাৎ অবাক আর বিমূঢ় হয়েছে সনাতন মাস্টার। সুবর্ণকে তো সে আজ অব্দি কোনমতে পুরুষ ভাবতে পারে না। ভুল জেনেও চোখে মায়া জড়িয়ে থাকে—যেন সদ্য যৌবনাবতী কিশোরী মেয়ে! ওর হাসিতে, কটাক্ষে, বাকভঙ্গিমায়, চলনে সেই ছবি স্পষ্ট। এমনকি ওর দুই বাহু, আঙুল, কোমর, পাছা, উরু থেকে পায়ের পাতা অব্দি সেইমতো নিটোল, কমনীয় আর সুঠাম। ছাঁদে ছাঁদে গড়া নটীর দেহলতা। অপরূপ মুখশ্রী!

কণ্ঠস্বরেও ভুল হয়েছিল প্রথমদিন। সোনাডাঙার মেলার আসরে যে রাতে ওর গান শুনেছিল প্রথম। ঝুমুর মেয়ে ভেবেছিল।

হাতে বাঁশের বাঁশি নিয়ে সনাতন ঘুরে বেড়ায় তখন এদেশ সেদেশ—মেলা থেকে মেলায় ঘোরে। আলাপী বন্ধুমানুষের অভাব নেই কোথাও। দিনগুলো অকারণ বিভোল কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ সাঁওতাপাড়ার দলের আসরে ওর মুণ্ডু যেন ঘুরে গিয়েছিল। যেচে আলাপ করেছিল। গান গেয়েছিল অনেকগুলো। ফিল্মের গান। লোকগুলো মেতে উঠেছিল ওকে পেয়ে। তারপর ওই বাঁশের বাঁশি। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। ...ওরা সনাতনকে ছাড়েনি। সাঁওতাপাড়া নিয়ে এসেছিল। সবচেয়ে বেশি টান সুবর্ণ আর আনিসের। ওই সব গান শিখবে ওরা। আর বাঁশের বাঁশি বাজাবে সনাতন, সুবর্ণ নাচবে। একেবারে নতুন ফ্যাসান চালু হবে এলাকায়।...

কেন এসেছিল সনাতন? সুবর্ণর কণ্ঠের গানে কী যেন যাদু আছে। শুধু এটুকু মাত্র? তবে বলি, আমি বাঁশি বাজাই ও নাচে—এই আমার সুখ। ...তাও তো সব নয়। তবে কী? ...ওর নাচগানের মধ্যে কাকে যেন খুঁজে পাচ্ছিল। সে বড় আবছা। তাকে স্পষ্ট করার বড় লোভ জেগেছিল মনে। নিশুতিরাতে মাঠের মধ্যে একা বাঁশি বাজাতে বাজাতে তার সাধ হত, আকাশ থেকে পরী নামুক! সেই পরীকে টের পাচ্ছিল হয়ত। ওই সে দ্রুত উড়ে আসছে—কাছে, আরও কাছে!

হয়ত এগুলোর কোনটাই কারণ নয়। আসলে বাউণ্ডুলে চালচুলোহীন জীবনে একটা সুন্দর আশ্রয় খুঁজে মরছিল সে। হঠাৎ এই আশ্রয়টার দিকে ছুটে এসেছিল তাই। মিলবে দুমুঠো খাবার অন্ন, শোবার বিছানা, কিছু পয়সাকড়ি।

নাঃ, তাও হয়ত একপেশে।

নাকি মানুষের ভিড়ে নিজেকে জাহির করার দুরন্ত লোভ? চারপাশে যেদিকে তাকায়, মানুষ আর মানুষ আর মানুষ। এত সরল ওরা, এত সহজে সাড়া দেয়, বাহবা দেয়। যা পায়, তাতেই খুশি। আদি অন্তহীন লাগে মুখের মিছিল। বুকে আবেগ দুলে ওঠে। টালমাটাল হয়ে ওঠে মন। বাঁশি ফেলে চিৎকার করতে সাধ যায়, দ্যাখো, তোমরা দ্যাখো, আমি আছি—আমি সনাতন, সনাতন মাস্টার! কণ্ঠের গভীর থেকে সব আবেগ দুলতে-দুলতে স্তবকে-স্তবকে পাপড়িমেলা পূর্ণ ফুলের মতো গান হয়ে ছড়িয়ে যায় চারদিকে।

কিন্তু কী গান গাইবে সে? ফিল্মের গান আর ভাল লাগে না। আসরের পর আসর ঘুরে তার কাছে মনে হয়েছে, শেখা অন্যের গানে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব। চাই নিজের গান—নিজের কথা, নিজের সুর। সনাতনের সাধ গেছে, কবিয়ালের মতো কানে হাত

রেখে মরমী সুরে পদ বেঁধে-বেঁধে আত্মপরিচয় ঘোষণা করে। সেই সাধনার বিরাম নেই এই একটি বছর। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণশাস্ত্র কিনেছে। পড়েছে। তবে এপথও একঘেয়ে লাগে তার। নতুন তত্ত্ব চাই। কবিয়ালারাও তো নতুন কথায় কবিগানকে বেঁধে ফেলেছে দিনে দিনে। শাস্ত্রপুরাণের একঘেয়েমিতে মন ভরে না কারো।

সে কাপে অংশগ্রহণ করেছে খাঁটি ওস্তাদের মতো। এমনকি ডুয়েট দিয়েছে ছোকরার সঙ্গে। সুযোগ পেলে কাপের মতো লোক হাসানোর চেষ্টাও করে সে। আর, নাচে? যাত্রাদলে সারা ছেলেবেলাটাই তার কেটে গেছে। ছিল সখী ব্যাচের সেরা নাচিয়ে, (না, সেটা আলকাপের ছোকরা হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল না মোটে) শিক্ষা পেয়েছিল সে সময়ের প্রখ্যাত মাস্টার ভোম্বলবাবুর কাছে। ছন্দতাল মুদ্রা আছে জানা, জানা আছে অনেক রাগরাগিণী।

ছেলেবেলা থেকেই টের পেয়েছিল, একটা কিছু হতে পারে সে। পারছিল না। কিন্তু তাহলে সেই হতে পারাটা কি এই আলকাপের মাস্টারী?

না, মোটে তা নয়। সনাতন অতৃপ্ত। মন বলে, এ নয়, অন্য কিছু—অন্য কোনখানে। এক সময় লোকে পরামর্শ দিয়েছে, ওহে সনাতন—এমন খাসা চেহারা তোমার! এবং ভালো কণ্ঠখানা! চলে যাও সোজা কলকাতা কি বম্বে। ফিল্মে তোমায় লুফে নেবে হে, লুফে নেবে। পাড়াগাঁয়ে পড়ে মরছ কেন বাবা?

মজার কথা, পাড়াগেঁয়েদের এইসব ভূতদের কথায় পড়ে বেঘোরে ক'মাস কলকাতায় হন্যে হয়ে ঘুরে এসেছিল সনাতন। সে দরজা তার সামনে খুলে যাওয়া এক অলৌকিক ঘটনাই। ফিরল যখন, মাথায় রুক্ষু জটপাকানো চুল, মুখভরতি দাড়িগোঁফ, কতদিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—কংকালটি। ...লোকে বলল, বোম্বে গেলেই পারতিস। ওখানে চান্স একটা জুটতই। সনাতন বলেছিল, পরের জন্মে দেখব। উঃ. শহরে কি মানুষ বাস করে? সব দয়ামায়াহীন কাঠখোট্টা লোক। লোক নয়, যেন ঘরবাড়ি। গাঁয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

লেখাপড়া বেশি শেখার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সুযোগ পেলেই বই সে পড়ত। এখনও পড়ে। আর বিশেষ কথা কী, রকমারি মানুষের সঙ্গে মেশা—নানান জায়গায় ঘোরাফেরা, সংসারের আর মানুষের অনেক গভীর কথা শেখাবার পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট।

এ নতুন জীবনে মিলেছে কিছু আশ্রয়, খাওয়াপরার সুযোগ, যশ সম্মান শ্রদ্ধা। পথে তাকে দেখলে লোকে ফিসফিস করে ওঠে, ওই যাচ্ছে সনাতন মাস্টার। এগিয়ে এসে আলাপ করে। ডেকে নিয়ে গিয়ে চা পান সিগ্রেট দিয়ে আপ্যায়িত করে। সোনাডাঙার ওদিকে ভদ্রপুরে তার ভিটেয় এখন ঘুঘুর বাস। ছাগল চরে। মাটির-ঘরের দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে কতকাল—ধ্বসে যাচ্ছে না। কী শক্ত মাটি! সোনাডাঙ্গা ভদ্রপুর এলাকার অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তারা বলে, কেমন আছ সনাতন? খুব যে নামডাক শুনছি! ভদ্রজনে বলেন, আরে, সনাতন যে! ...সনাতন তখন লজ্জায় পড়ে যায়।

তা, হ্যাঁ হে সনাতন, শেষঅব্দি ছ্যাঁচড়া দলের মাস্টার হলে? ছি, ছি, ছি!

সনাতন হাসে মিটিমিটি।

সদ্বংশের ছেলে—তোমার অনেক গুণ ছিল বাপু। ভেবেছিলাম, দেশ ছেড়ে বেরিয়েছ, তখন দিগ্বিজয় না করে ফিরছ না। খবরের কাগজে তোমার ছবি ছাপা দেখব। ...হা কপাল! শেষে এই কোমরদোলানির পাল্লায় পড়লে! অনেক আশা ছিল আমাদের—হ্যাঁ, অনেক আশা!

কিসের আশা ছিল? প্রশ্ন করতে সাধ যায় তার। এর জবাবই তো সে খুঁজছে। একটা কিছু হওয়ায় কথা ছিল তার। বিরাট অভাবনীয় মহত্তম কিছু। তা আর যাই হোক, এ আলকাপ নয়।

আজ পাড়াগাঁয়ে 'দলশিক্ষা' দিতে গিয়ে এইসব কথা ভেবেছে সে। গভীর রাতে লাফ দিয়ে উঠে বসেছে। পালিয়ে যাবে কোথাও? ফের কলকাতা যাবে? বোম্বে? ...এখন তার উপযুক্ত বয়স হয়েছে। যদি মিলে যায় কোনকিছু?

সেইসব সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কতমাইল দূরের এক মাটির ঘরে এখন শুয়ে স্বপ্ন দেখছে যে, তার—

গায়ে সবুজ বুশসার্ট, পরনে সবুজ পাজামা, মুখে জ্যোৎস্নার রঙ, চুলে অন্ধকার, সে পুরুষ—তবু পুরুষ নয়, নারী—তবু নারীও নয়—তার নাম সুবর্ণ।—

তাকে সাধ যায় ডাকতে—সুবর্ণলতা!

কত জন্মের আরব্ধ দায়িত্ব রয়েছে সনাতনের কাঁধে, একটা অসম্পূর্ণ প্রতিমাকে সম্পূর্ণ করে তোলার দুশ্ছেদ্য দায় আছে চেপে। আর সেই সম্পূর্ণতা হয়ত সনাতনকেও সম্পূর্ণ করে তুলবে সঙ্গে সঙ্গে।

তাকে ফেলে যেতে বড় বুক টাটায়। পাদুটো ভারি লাগে! মুহূর্তে পৃথিবী শূন্য হয়ে পড়বে মনে হয়। তখন মনে হয়, এই তো ক'দিন হলো এসেছে সাঁওতাপাড়া থেকে—আবার ফিরতে হবে সেখানে। সেখানেই আপাতত স্থায়ী আড্ডা সনাতনের।

তবে আজ দিন পনের হল, রাগ করে চলে এসেছে। মনে মনে ঠিক করেছিল, আর ওখানে ফিরবে না সে। চার-পাঁচটা নতুন দল পেয়েছে হাতে—মাস্টারীর জন্য। তার কোনটায় স্থায়ী থেকে যাবে। নিজের দল বলে জানবে সেটা। দলওয়ালারাও খুশি হবে! হাতে আকাশের চাঁদ পাবে। বেছে নেবে একটা তাজা কচি ছোকরা—তাকেই গড়ে তুলবে মনোমত।

তবু সুবর্ণর জন্যে মন কেমন করছে। একমুহূর্ত শান্তি পায়নি মনে। সুবর্ণ ছায়ার মতো সঙ্গে থেকেছে এতদিন! ওকে ছেড়ে এলে এত একলা লাগে। সাঁওতাপাড়া যাবার দিন কী উত্তেজনা আর আনন্দ তাকে টালমাটাল করে রাখে! যাবার সময় টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যায় সুবর্ণর জন্য। সাবান স্নো চুলের ফিতে—জামা-পাজামার রঙিন ছিট। একবার ভুল করে কানের দুলও কিনে ফেলেছিল একজোড়া। আসলে, কেনবার সময় দোকানদার গছিয়ে দিয়েছিল।—নিন না, রোলগোল্ডের জিনিস। দুটাকা মাত্র দাম! সে কি ছাই জানত যে কার জন্যে এগুলো কেনা হচ্ছে? যে ফিতে বাঁধে, সে তো দুলও পরে।

দেখে সুবর্ণ হেসে খুন।—ওমা দুল কে পরবে? চুড়ি পরেছি, কবজি গোল থাকবে, তাই। দুল পরলে লোকে কী বলবে?

লজ্জা পেয়েছিল সনাতন।—থাক, ফেরত দিয়ে আসব।

সুবর্ণ কিন্তু নিয়েছিল দুলজোড়া।—বারে! আসরে তো পরা যাবে! তখন আমার দুল চাই না?

সনাতনের লজ্জা মুহূর্তে ঘুচল।—আরে, সেইজন্যেই কিনেছিলাম বোধহয়। অমন ভুলটা কি মিছেমিছি হয়?

তখন, খচ্চর সুবর্ণটা, অপরূপ হেসে, ভ্রূভঙ্গী করে বলেছিল, ভুলটা সবসময় হলেই ভাল লাগাবে আমার।—

সেই ভাল লাগা, ভালবাসা! ন্যাকামি লেগেছে একদিন। আর তো লাগে না। মনের মধ্যে কে যেন মাথা কোটে, ভুলে ভরে থাক, ভুলেই জীবনটা ডুবে থাক। এই মিথ্যে নিয়েই চিরকাল যেন বাঁচতে পারি।—

সাইকেলের সীটে বসে আনিস টর্চ তোলে সামনে!—সামনে রেললাইন। তার ওদিকে ওই-ই আলো দেখছেন?

কাত হয়ে উঁচুতে আলো দেখে সনাতন ...আরে বাবা! আকাশে গানের আসর বসছে নাকি?

আনিস জবাব দেয়, কতকটা ডাঙার ওপর মনে হচ্ছে।

যেদিকে তাকায়, শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ! এত মানুষের আসর কখনও দেখেনি ওরা। এর নাম তবে জনসমুদ্র। তীরে দাঁড়িয়ে বুক ঢিপঢিপ করে সনাতনের। বিস্তীর্ণ একটা বাঁজা ডাঙ্গার ওপর অনেকগুলো সামিয়ানা ঝোলানো হয়েছে। অজস্র পেট্রোম্যাক্স আর ডেলাইট জ্বলছে! গুঞ্জন নয়, সমুদ্রের কল্লোল উঠছে। খুঁটিতে রঙিন কাগজের ঝালর, ঝালর সামিয়ানার তলায়, বেড়া দিয়ে ঘেরা আসরটা আলাদা করে সাজানো। সতরঞ্জি পড়েছে আসরে। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা রয়েছে দু-দলের মাঝখানে। তখন সবে দুটি দলই আসরে ঢুকেছে। দুইপ্রান্তে বসেছে নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। লায়েকদের হুকুম পেলেই যে কোন দল প্রথম শুরু করবে।

চারপাশে আলোর ছটায় আবছা ঘরবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। স্কুলের প্রাঙ্গণ এটা। বিশ্রামের সময় নেই। ওরা একফালি পথ বেয়ে দলে ঢুকছিল। কুঁজো হয়ে জনমণ্ডলী পেরিয়ে আসরে যাচ্ছিল। এত দীর্ঘ লাগে পথটা।

চারপাশে ঢেউএর মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চাপা, গুঞ্জন, আনিস কপে, আনিস! সনাতন একটু ক্ষুব্ধ! তাকে কেউ চেনে না! নতুন মাস্টারের নাম যতটা ছড়িয়েছে, লোকটার চেহারা এখনও কালে স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। হয়ত তাই।...

'বাহক' নফর আলির বানরের মতো চেহারা। তার চাউনিও তদ্রূপ! কখন থেকে আলো গুনছে আঙুল তুলে। চোদ্দটায় গিয়ে ফের গুলিয়ে যাচ্ছে। হাল ছেড়ে দিয়ে তখন বলছে, চোদ্দটার বেশি।

আনিস দোহারদের মধ্যে বসে পড়ে। সনাতনকে দেখেই ম্যানেজার সরে বসে শশব্যস্তে। ...আসুন, আসুন। ভাবলাম,...

কী ভেবেছিল, তা বলার আগে সুবর্ণ দুহাতে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। ঠোঁটে আলতো হাসি। কিন্তু মুখটা জ্বলে উঠেছে হঠাৎ। ...রাগ পড়েনি এখনও? কী মানুষ রে বাবা!

কাদের আলি হারমোনিয়ামের সামনে বসে রয়েছে। তার পাশেই বসে সনাতন। কাবুল হাসছে। নন্দ হাসছে। আমিরের মুখে হাসি। কালাচাঁদ খুড়ো সোৎসাহে মুখ বাড়িয়ে কী বলার চেষ্টা করছে। তারপর অবাক হয় সনাতন। ...আরে, দেখনহাসি যে! কেমন আছেন?

শরত চাঁই—পাতু ওস্তাদের আমলের বিখ্যাত সঙালও এ দলে আমন্ত্রিত আজ। আনিস সঙাল হবার পর কালেভদ্রে শরতকে ডাকা হত। আয়োজন চূড়ান্ত তাহলে। শরত বলে, আপনাদের আশীর্বাদ।

সুবর্ণ দিকে তাকাতে পারে না সনাতন। এখন সুবর্ণ আর পুরুষ নয়, মেয়ে। শুধু মেয়ে নয়—নটী। ঠোঁটে আলতার টকটকে লাল রঙ, আঁকা ভুরু চোখের পাপড়ি, পদ্মকলির ফোঁটা, চোখ জ্বলে যায় দেখতে। আড়চোখে একবার দেখে নেয়, সুবর্ণ তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

শরত বলে, মরে গেলে সাতদিন হত দেখনহাসি! পটল তুলতে বসেছিলাম প্রায়।

অসুখ হয়েছিল? সনাতন শুধোয়!

হ্যাঁ। কলাডাঙার ওখানে গান করতে গিয়ে সে এক বিপদ। খাবার জিনিসে বিষাক্ত কিছু ছিল নাকি—মারাত্মক কাণ্ড একেবারে! রাতজাগা গেনে মানুষ আমরা—যা দেয় সামনে, গোগ্রাসে খাই। কে রাঁধল, কী রাঁধল তো দেখি না। তারপর...

আমির তাড়া দিয়েছে হঠাৎ। ...আমাদের প্রথম আসর। মাস্টারমশাই, কাদু হারমোনিয়াম চালাক এখন।...

কয়েকজোড়া কত্তাল একটানা রিনঝিনি আওয়াজ তুলেছে। 'আধুনিক' রীতির কত্তাল বাজনা। ঝমর ঝম নয়। মিঠে, শান্ত, অলঙ্কারে ভরা বোল। ডুবু তবলচী বাঁয়া-তবলার গুরগুর ধ্বনি দিচ্ছে! কাদুর আঙুল হারমোনিয়ামের এগারো পর্দায়। অবিকল সনাতনের যা সব নির্দেশ, নিখুঁত পালন করছে দল। যন্ত্রের মতো। বুকে ভরে গেল সনাতনের।

সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল একটি মাত্র পর্দায়, একটানা, গম্ভীর—

জয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ তানসেন কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ পাতু কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ সনাতন কী জয়!!

ওস্তাদ সনাতন। ...চমকে উঠেছে সনাতন মাস্টার। হারমোনিয়ামের ওধারে হাঁটুর দুমড়ে বাঈজীদের মতো বসে সুবর্ণ মিটিমিটি হাসছে। জয়ধ্বনির মূল গায়েন ছোকরা। সুতরাং কথাটা জুগিয়ে দিয়েছে সুবর্ণই। ...ফিসফিসিয়ে সে বলে ওঠে, আপনার আজ প্রমোশন হল। আর মাস্টার নয়—ওস্তাদ। সনাতন একটু হাসে মাত্র।

রসিকতার সময় নেই। কোলাহল থেমে গুঞ্জন উঠেছে জনসমুদ্রে। এবার কনসার্ট।

বাঁশের বাঁশিটা হারমোনিয়ামে রেখেছে সনাতন। এখন নয়, চমক দেওয়া যাবে না। হারমোনিয়াম টেনে নেয় সে। তবলা কত্তাল স্তব্ধ। হারমোনিয়ামটা ভারি চমৎকার; যেমন জোর আওয়াজ তেমনি মিঠে। তবে সেও সনাতনের আঙুলের যাদু।

উদারা-মুদারা-তারায় চমক দিয়ে আঙুল ছোটে, দমকে দমকে জটিল কী সুর বেজে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। একপলক ঝট করে ওদিকের দলটা দেখে নেয় সে। ওরা কান খাড়া করেছে। ঝাঁকসা ওস্তাদ কোনজন? ওই বুঝি ছোকরা। ছ্যাঃ ধুমসো এক মাগী যে!

বড় বড় ঝাকড়ামাকড় চুল নাড়া দিয়ে সনাতন অস্ফুট একটা চিৎকার তোলে, আ-চ্ছা! পরক্ষণে বেজে ওঠে কত্তালগুলো, বাজে তবলা। তরঙ্গ থেকে দোলে সুর। একমিনিটে আসর অনেকটা সায়েস্তা।

ধুয়োতে ফেরামাত্র ইসারা পেয়ে ঘোমটাঢাকা মুখে বন্দনা ধরেছে সুবর্ণ। তান প্রথমে। তারপর কথা।

...মনমন্দিরে তোমার আরতি বাজে মা।

সনাতনের নিজের রচনা। দুবার কলিটা গেয়ে ছেড়ে দেয় সুবর্ণ। এবার দোহারকিদের কণ্ঠে চলে গেছে কলি। এখানেই সনাতনের নতুনত্ব। প্রথম ধীর শান্ত লয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমশ দ্রুত হতে হতে দ্রুততর। তারপর দ্রুততম গতি—প্রচণ্ড গম্ভীর ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়ে তোমার আরতি বাজে মা... তোমারই আরতি বাজে, তোমার আরতি মাগো বাজে,..

সুবর্ণর মুখটা নামানো। সনাতনের অকারণে চোখ ছলছল করে ওঠে। ...মাগো, তোমার আরতি বাজে, শোন তোমারই আরতি বাজে মা...

না, এমন কোনদিন হয় না। এত আবেগ, বিহ্বলতা, এত তোলপাড়। কানের কাছে ফিসফিস করে ওঠে অভিজ্ঞ কালাচাঁদ খুড়ো— গান লেগে গেছে। বাকবাদিনী এসে গেছেন। জয় মা, জয় মা!

বন্দনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিপ্রহাতে বাঁশি তুলে নেয় সনাতন। মুহূর্তের দেরি নয়। কাদু হারমোনিয়ামে আঙুল রেখেছে। বাঁশি বেজে ওঠে। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত। কে যেন কেঁদে উঠল কোথায়। কে যেন ডাকল।

নাচের ভঙ্গীতে প্রণাম করে—প্রথমে নিজের দলের সকলকে, তারপর ওদলে গিয়ে সামনে যাদের পেল, তাদেরকে—তারপর ঘোমটা নামিয়ে দিল মাথাটা সামান্য দুলিয়ে—চুলে বেণী বাঁধেনি সুবর্ণ, লাল ফিতে আটকানো রয়েছে—চারদিকে করজোড়ে নমস্কার করে হাসল। ব্যস, জনসমুদ্র স্তব্ধ—নিথর!...ঝুমঝুম নূপুর বাজছে। বাঁশির সুরে রাতের আসর উথাল-পাথাল।

বাঁশি শেষ করে ঘর্মাক্ত মুখে সনাতন ফের হারমোনিয়াম নেয়। গান ধরে সুবর্ণ। রাতের পর রাতজাগা আলকাপের ছোকরার গলা—একটুখানি ধরা, একটু যেন চিড় খাওয়া—তবু সুবর্ণর ছলাকলার অভাব নেই। ঠাটে-ঠমকে, ভঙ্গিমায়, আধোআধো উচ্চারণে, সব ঢেকে দেয়। বরং ওইটুকুই তখন আর খুঁত নয়, মাধুর্য।...

ডুয়েটে সনাতন নিজেই ওঠে। এত বড় আসরে এই প্রথম। কিছু কিঞ্চিৎ হাসানোর

রীতি আছে। সে কাজের মধ্যে অছিলা করে আনিসকে ডাকে সে। আনিস উঠে বাঁদরের মত মুখভঙ্গী করতেই হাসিতে দোলে শ্রোতা। খানিক পরেই সনাতনের গান শোনে তারা।

উত্তেজিত কে চেঁচিয়ে ওঠে, ছিনেমা, ছিনেমা! আর টকিহাউছে যাবো না হে!

কারা বলে, সাবাস ভাই! বলিহারি!

সুবর্ণর সঙ্গে নাচে সনাতন। সে শার্টের ওপর দিয়ে ধুতির একটা দিক বেড় দিয়েছে কোমরে। মুখের কাছে মুখ আনে নটীবেশী সুবর্ণ—বারবার। ইচ্ছে করে—এই জনমণ্ডলীকে মিথ্যে করে অরণ্য জেনে দেহে দেহ মেশায়। ...ভুল, ভুল। মিথ্যে! ধিক, তোকে শত ধিক সনাতন! নিজেকে ধমকায় সে। সুবর্ণর দেহ দোলে— ভাঁজে ভাঁজে ধূপের ধোঁওয়ার মত পা থেকে কোমর পেরিয়ে ঊর্ধ্বে তরঙ্গ বয়। ...সুবর্ণ, নাকি সুবর্ণলতা—কিংবা তুই কী! আমিই বা কে? কোথায় যেন ছিলাম আমরা—কার শাপে পৃথিবীতে চলে এলাম।

...সত্যিসত্যি বলে ফেলে সনাতন। শ্রোতাকে শুনিয়ে নাচের মধ্যেই কথায় বলে (আর আলকাপের এই তো মজা! মনের কথা কত সহজে বল যায়, যা-ইচ্ছে বলে আনন্দ দেওয়া যায়।) ...কোথায় ছিলাম আমরা,—কার শাপে পৃথিবীতে এলাম।

পায়ের কাছে কে বলে ওঠে চাপা গলায়, বহুত আচ্ছা মাস্টার! ভাল, ভাল!

একপলকে লোকটাকে দেখে নেয়। মাথায় অল্প কাঁচাপাকা চুল, খাড়া নাক, উদ্ধত চোয়াল, চওড়া কপাল, উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি—তার গায়ে হাফশার্ট, কাঁধে চাদর, পরনে ধুতি। বিপক্ষ দলে বসে আছে। কে লোকটা?

বিপক্ষ দলের লোকে তো কদাচ এমন সাবাসধ্বনি দেয় না! বরং দমিয়ে দেবার চেষ্টা করে। নাকমুখ সিঁটকে বসে থাকে। কিন্তু এ লোকটি হাসছে। এখনও বলেছে, চমৎকার, চমৎকার!

আজ আসরের অবস্থা সে বোঝে। তাই ছোট্ট একটা কাপ দিয়েই পাল্লা শেষ করে। কবিয়ালীর যখন তাগিদ নেই—তখন থাক। লোকে ভিতর ভিতর ওস্তাদ ঝাঁকসার গান শুনতে নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এবার। অত বড় ওস্তাদ—কত নাম শোনা গেছে এতদিন ধরে!

সাত-পাঁচ চিন্তা করেই আসর ছাড়ে সনাতন। লোকটাকে ফের লক্ষ্য করে। মুখ ফিরিয়ে বসেছে এবার। ওদের দলে কোন বাইরের লোক এসে বসে আছে নাকি? কিন্তু চেহারাটা ভোলা যায় না। কেমন যেন—কেমন—ধীর গম্ভীর, পুরনো গাছের মতো, অনেক ডালপালা ছড়ানো—

একটু পরেই সেই লোকটা কানে হাতে দিয়ে তান ভাঁজতে ভাঁজতে আসরে উঠে দাঁড়াল। চারদিক ঘুরে নমস্কার করে বলল, অধমের নাম শ্রীধনঞ্জয় সরকার—আপনারা বলেন, ওস্তাদ ঝাঁকসা।...

চারপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাততালির শব্দ। হাততালি আর হাততালি। থামতে চায় না। মাথা একটু নামিয়ে, চোখ বুজে, করজোড়ে—একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। শ্রোতার অভিবাদন গ্রহণ করেছে। শান্ত, নম্র, ধীর।

ছলাৎ করে রক্তের ঢেউ পড়ল ভিতর। সনাতন বিড়বিড় করে বলে, আশ্চর্য, আশ্চর্য!

সুবর্ণ ঝুঁকে এসেছে।...কী আশ্চর্য ওস্তাদ?

সনাতন হাসে।...আমি ওস্তাদ? ওই দ্যাখো—ওস্তাদের রাজা দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওঁকে প্রণাম করব সুবর্ণ।

আলকাপ দলের আসরে এ দৃশ্য অভাবিত। চারপাশে নানারকম মতামত শ্রোতাতরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে অবিচ্ছিন্ন। ...যাঃ বাবা! নিজে থেকেই হট মানলে নতুন ওস্তাদ!

...সাঁওতাপাড়ার ইজ্জত ডোবালে হে! রাঢ়ের মাথা হেঁট হল বাঘড়ীর পায়। ধুৎ!

...নাঃ। রাতজাগা সার হল রে দাদা। পাল্লা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জমবে না! এখন তো আপোষে রাতটি ভোর করে কড়ি গুনে ঘর পলাবে শালারা। ...মধু, বিড়ি দে রে, মন ভরল না মাইরি। উভয়ে উভয়কে পাল্টাপাল্টি 'ঠেস' মারবে—তা নয়, গা চাটাচাটি! সেইজন্যে আশয়-বিষয় ধরলে না কোন পক্ষ।

...চুপ করো মানিকরা, আলকাপ হয় এই রকমই হয়। চুপচাপ দেখ না, কী করে।

ওরা অবশ্য গরিবগুরবো অভাজন অপাংক্তেয় মানুষ বেশির ভাগই। খাটে খায় চলে যায় এমনতরো গতরজীবীর দল। চায় একটু অশ্লীল ধরনের উত্তেজনা—রাত জাগা মানেই তো পরের দিনটি ঢুলুঢুলু লাল চোখে গতর খাটানো, এদিকে লুটিয়ে পড়ার ঝোঁক আসছে বারবার হয়ত চাষজমির চাঙড়েই, ওদিকে তেজী সতর্ক গেরস্থ আশেপাশে টেরচা তাকাচ্ছে! এই কষ্টটা উসুল না হলে শান্তি পায় না মনে। তবে, অতি অল্পেই তুষ্ট সব। যা জ্বলজ্বলে দেখে নিজেদের রহস্যময় অন্ধকার জীবনে, তাই ভাবে মানিক। যা মাতায় তাদের সামান্য মন, তাই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রসকুম্ভ থেকে চুইয়ে পড়া। সত্য ত্রেতাদ্বাপরের কথা তার শুনেছে। তখন নাকি অঢেল সুখশান্তি ছিল মানুষের জীবনে। এখন তো কলি—শুধু কলি নয়, ঘোর কলি। আলকাপের ওস্তাদের মুখে তার শুনেছে, পঞ্চমরঙের ডালি। ছোকরার কোমরদোলানি, ডুয়েট ফার্স, কপের কাপ, 'আলগা' ছড়া আর ওস্তাদের কবিয়ালী—এই হল কিনা সেই পঞ্চরঙ! দলে দলে রঙে ডুব দিতে রাত জাগতে আসে।

পিছনের সারিতে বেঞ্চে বসে আছে যারা, তাদের মন্তব্য অন্যরকম।

...গ্র্যান্ড! দেখবার মত সীন মাইরি! গুরু-শিষ্য সংবাদ!

...যাই বল্ সুকান্ত, ওই নাচিয়েটা...ইস্, মেয়ে হলে যা হত না একখানা!

...পাল্লাফাল্লা বুঝিনে বাবা, নাচিয়ে তোলাও। কোমরদোলানি দেখি বরং।

...মহী, এক টাকার পেলা ধর্ না, জমে যাবে।

বয়সী মাতব্বর মানুষেরা চারদিকে বাজখাঁই চেঁচাচ্ছে, এই গোল, চুপ, চুপ। রসিক কে বলে ওঠে, এই গোল, মেরে চ্যাপটা করে দোব।

একজন চুপ বললে সবাই চুপ চুপ করতে থাকে। সেটা বিস্ময়কর রকমের তাণ্ডবের সূত্রপাত বটে। জনসমুদ্রে ঝড় বয়ে যায়। চুপ, চুপ, চোপরাও চো-ও-প! লাঠি ঘোরাতে থাকে লায়েকমশাইদের লোকজন।

তারপর ওস্তাদ ঝাঁকসা রাগিণী ধরেছে। মুহূর্তে স্তব্ধতা আসরে। দূরতম প্রান্তে ফিসফিস করলেও শোনা যায়। ক্রমশ ফিসফিসানিগুলোও মুছে যেতে থাকে।

প্রণাম করে সনাতন নিজের দলে এসে বসেছে। দলের সবার মুখ গম্ভীর—কেবল দু'জন বাদে। আনিস আর সুবর্ণ। সনাতন তা জানত। জেনেও লোভ সম্বরণ করতে পারেনি।

গান থামিয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলছে, ভুল, ভুল! আপনাদের ধারণা ভুল, ভাইসকল! আমি ভাঙা দালান, ওরা বটের চারা। আমার বুক ফাটিয়ে একদিন মাথা তুলবে আকাশের উঁচুতে। আমি ওদের সঙ্গে পারি?...পরক্ষণেই নতুন করে ধুয়ো বেঁধে নিল সে—

তোমরা দেখ গো ভাঙা দালানে,
বটের চারা বাড়ে কেমনে।।
আমার বুকে বাড়বে সুখে
যাব আমি শমন ভবনে—
বটের চারা বাড়ে কেমনে।।

দুহাত তুলে ছুটে আসছে এক বুড়োমানুষ। লোকের কাঁধের ওপর কেডস্ জুতো তুলে, শশব্যস্ত কিন্তু সাবধানে, তারপর আসরে। মাথায় শনের মত চুল, তেমনি গোঁফদাড়ি, গায়ে মোটা ছিটের ধূসর জামা চাদর, হাতে ছড়ি। প্রাইমারী স্কুলের হেডপণ্ডিত মশায়। ঝাঁপিয়ে এসে কাঁপানো গলায় বলেন, শুনেছিলাম—রূপে ইন্দ্র গুণে সব্যসাচী, জিহ্বামূলে সরস্বতী অধিষ্ঠাত্রী—মরি, মরি, এ মানুষের তুলনা নাই গো, সাক্ষাৎ কিন্নর নরকুলে জন্ম। আশি বছর বয়ঃক্রম হল আমার—কখনও আলকাপ গান শুনি নাই, আজ শুনলাম। ধন্য হলাম। ধন্য হল আমার এই দুঃখিনী পল্লীগ্রাম....

ফের গোলমাল! ...বুড়োকে সামলাও, বুড়োকে সামলাও।

কাঁপছে লোল চর্মসার ডান হাতটা। বুকপকেটে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে যাচ্ছে। ...কিছু বের করতে চান—খুঁজে পাচ্ছেন না। পকেটভরতি কাগজ। একটা কিছু দিতে চান। ছিল, ছিল, গেল কোথায় গো।

তার আগেই কারা বাঘের মতো হালুম করে এসে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল পণ্ডিতমশাইকে। প্রায় আর্তনাদ করছেন আর হাত-পা ছুঁড়ছেন সারাপথ।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কি একা ছড়া গেয়েই আসর চালাবে? মতিগতি সেই রকম। ফের প্রসঙ্গ বদলেছে। কথায় মিল দিয়ে বলছে।

...বড় দুঃখ বয়ে গেল মনে, সঙ্গে নাই নিজের অস্ত্র—নিরস্ত্র এ রণে, শুনে তাকবেন আমার শাস্তির নাম, সে বিহনে পূর্ণ হল না মনস্কাম, এখন...

ফের নতুন ধুয়ো।...

কী দিয়ে মন বুঝাব, এখন আমি কার কাছে যাব!
আমার হৃদয়মন্দিরে
বাঁশি বাজত দিনো-রাতে রে
এখন আমি কী নাম ধরে

বাঁশরী আর বাজাব—
এখন আমি কার কাছে যাব।।

শুধু গান নয়, ছড়ার কলিপরকলি অন্তরা নয়, কান্না। সারা আসরে মূর্ছার আবেশ এসে গেছে। কথা আর সুর মিলিয়ে এক ব্যর্থ সব খোয়ানো মানুষের বিষণ্ণ ছবিটি শ্রোতার চোখে। বিচ্ছিন্নভাবে এ গানে কী হত কে জানে, আলকাপ এমন এক জগত—যেখানে শ্রোতা-গায়ক দুই মিলিয়ে—দুয়ের জীবন ইচ্ছা বাসনা একাকার হয়ে রয়েছে।

আহা রে আহা। কে ককিয়ে ওঠে। কে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাই তো! তুখোড় রসিক, ছোকরাকে পেলাধরা ইয়ারসম চ্যাংড়া ছেলে, অভাজন গতরজীবী, সবাই বিষণ্ণ। চুপি চুপি নাক ঝেড়ে কে বলে বেশ, ওস্তাদ, বেশ! ...আর, তার এই বলা, এই বিষাদের অনুভূতিটিও আসরের অর্কেস্ট্রায় একটি অবর্জনীয় আর অত্যাবশ্যক সুর—যা না হলে এখনই সব বড় অকারণ আর অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এদলে সনাতন সুবর্ণকে বলে, আমার আমার চোখ খুলে গেল সুবর্ণ। গানের যাদু কাকে বলে, জানলাম। আমার মন ভরে গেল রে! এ আমি কোথায় আছি রে সুবর্ণ, কোথায় আছি!

সুবর্ণ মিটিমিটি হাসে। আলতারাঙা ঠোঁট দুটো সামান্য কাঁপে। ভুরুতে মায়া, ওর চাহনিতে মায়া, ওর লাল রেশমী শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে মায়া। ফিসফিস করে বলে, যদি কোনদিন আমি না থাকি, ওই গানখানা গাইবেন, ওস্তাদ। শিখে রাখুন!

সনাতন হঠাৎ চমকে ওঠে। বুকের ভিতর রক্ত চিৎকার করে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর সে ক্ষিপ্রহাতে সিগ্রেট ধরায়। ধুঁয়োর রিঙ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না।

সুবর্ণ বলে, রাগ করলেন? থাকব গো, থাকব। যাব কোথায়?

সনাতন মাথা নাড়ে শুধু।

আর এতক্ষণ পরে ম্যানেজার আমির আলি চাপা ক্রোধটা উদগীরণ করে লাল চোখে বলে, বামুন হয়ে ওই নিচু জাত চাঁইয়ের পায়ে প্রণাম করলেন আপনি? ছিঃ!

সনাতন কান করে না। তার চোখ এখন সুবর্ণর দিকে। মায়া দেখছে। মায়ায় আটকে যাচ্ছে।

...মায়া বলে একটা জিনিস আছে, তার কথা বলি শুনুন।

চৌদ্দটা উজ্জ্বল বাতির আলোয়, হাজার হাজার বিমুগ্ধ মানুষের মাঝখানে, সারাটি রাত ধরে মায়া আস্তে আস্তে, চুপিচুপি, মনের গভীরে জাল বিস্তার করে। অভ্যাসকে করে তোলে সংস্কার। তারপর একদিন চোখদুটো বদলে যায়। আমি আছি, কিন্তু কোথায় আছি? মায়ার মধ্যে আমার থাকা।...

প্রতিটি দিন আসে। কুশীলবেরা পোশাক বদলায়। মোহিনী নটী পুরুষ হয় আবার। ছটফট করে উঠি—জালের কঠিন বাঁধনে বাঁধা—বেরোন যায় না। আসরে যা সত্য বলে নিজে মানবার চেষ্টা করছিলাম, লোককে ধোঁকা দিচ্ছিলাম—তা অবশেষে নিজেকে কাছে অভ্যাসের বশে সত্য হয়ে উঠেছে। বারবার মিথ্যে বললে সেটা সত্যি লাগে নিজের কাছে—একসময় তাই সত্য হয়ে ওঠে।...

আসর ভাঙে। সভা শূন্য হয়। সামিয়ানা গুটিয়ে নেয় ওরা। আলো যায় নিবিয়ে। সাজ খোলে সুবর্ণরা। কিন্তু মনের ভিতর আসর ভাঙেনি, সভা হয়নি শূন্য, সেখানে কালে সামিয়ানার নীচে সারবদ্ধ বাতি জ্বলছে। সুবর্ণরা নাচছে। ওস্তাদেরা মরমী পদ গাইছে। কত্তাল বাজছে ঝমর ঝম। তবলায় কার্ফা বাজছে—ধেগে নাকে নাকে তিন, ধেগে নাকে নাকে তিন! হারমোনিয়ামে আঙুল নাচছে, সুরে তরঙ্গ উঠেছে—দোহারকিরা দ্রুততালে ধুয়ো গাইছে, আর ঘুঙুরের আওয়াজ উঠছে ঝুম ঝুম ঝুম... সুবর্ণরা নাচছে। নেচে চলেছে অনন্তকাল ধরে।...

ট্রেনে তো চেপেছেন মাস্টার। নামবার পরও গা থেকে গতিটি মুছে যায়নি। মনে হয়, নামা হল না গাড়ি থেকে ইহজীবনে। তেমন মায়া-গাড়ির বেগ নিয়ে বেঁচে আছি। ফুরোয় না—রেশ বহে চলে।...

সনাতন অভিভূত। ওস্তাদ ঝাঁকসার এ তত্ত্বকথা শুনে সে মুগ্ধ।

তাই তো! যখন ডুয়েটে উঠে গানে বলে... জলকে যাচ্ছো গরবিনী আওলা তোমার কেশ, আর নারীবেশী সুবর্ণ জবাব দেয়, ...পথ ছেড়ে দাও নিলাজ নাগর কোথায় তোমার দেশ—ওরা তো পরস্পরকে নারী আর পুরুষ ধরে নেয়—ধরে নেবে বলেই ওরা আসরে প্রতিশ্রুত, আসরও ধরে নিচ্ছে সেটা—বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই কোথাও। সনাতন জানে, সুবর্ণ পুরুষ—কিশোর পুরুষ। সুবর্ণ জানে, সনাতন পুরুষ—যুবাপুরুষ। তবু সনাতন সুবর্ণকে নারী ধরে নিচ্ছে, আর সুবর্ণও নিজেকে তাই ধরছে—ধরে সেইমতো ভঙ্গিমায় তার আত্মপ্রকাশ। এই ধরে নেওয়াটাই যত মজা। 'ধরে নেওয়া' একদিন অভ্যাস থেকে রক্তের ভিতর, বোধের ভিতর সত্য হয়ে ওঠে হয়ত। তা না হলে...

সনাতন চুপ করে ভাবে। নিঃশব্দে সিগ্রেট টানে। কানের ভিতর এখনও সারারাত্রির আসর চলেছে। হারমোনিয়াম বাজছে, সুবর্ণ গাইছে, দোহারকিরা ধুয়ো ধরেছে—ধারাবাহিক সেই ধ্বনিপুঞ্জ মোহিনী সুবর্ণর ঘুঙুরে ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম।

দুপুরে খাওয়া শেষ করে ওরা স্কুলের বারান্দায় বসেছে। একটু পরেই দুটো দল দুদিকে চলে যাবে। এখন পরস্পর মেলামেশা গল্পগুজব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পালা। ওস্তাদ ঝাঁকসা বসেছে বেঞ্চে—পায়ের কাছে সতরঞ্চির ওপর সুবর্ণ। সনাতন বেঞ্চটার অন্যপ্রান্তে বসে আছে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কথা শুনছে। মাঝে মাঝে ওস্তাদ ঝাঁকসার টিপ্পনী : এ শালা নির্ঘাৎ অনেক মানুষের বুকে ছুরি মারবে। পরক্ষণে হো হো স্বভাবসিদ্ধ হাসি। ...সুবর্ণ, রাগ করলি রে? ছোকরাদের আমি ওই নামে ডাকি। কিন্তু বাবা, দোহাই তোকে, এ বুড়োর কথা রাখিস। ওই ভদ্রলোক ব্রাহ্মণসন্তানকে আর ভেলকি দেখাস নে!

সুবর্ণ বলে, সে আমার খুশি। কিন্তু ওস্তাদজী, নিজেকে বুড়ো বলছেন কেন বাপু? আপনি রাজপুরুষের মতো দেখতে। চোখের দিব্যি।

ওস্তাদ ঝাঁকসা হাসে। ...খচ্চর মাতালে বে ফজলা! আমার সামনে ঢ্যামনাগিরি—অ্যাঁ? হা রে সুবর্ণ, জানিস, তোর মত কয়েকগণ্ডা ছোকরা জন্ম দিলাম আজ অব্দি? ইস্, বলে কিনা আমি রাজপুরুষ!

ফজল বলে, শান্তি বলত হেটমাস্টের!

সবাই হাসে এ কথায়। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, রাজপুরুষ—ওই দ্যাখ্, বসে রয়েছেন সামনে! কী মাস্টারজী, ঝাড়ুন দুচাট্টে বুলি। গেনেদের গেনেমি বুঝি রপ্ত হয়নি এখনও? মশাই, এর নাম আলকাপ। আসরে যা বললেন—তারপর তো এই খিস্তির আসর নিজেদের জন্যে! প্রাণ খুলে খিস্তি করুন। এখানে সবাই গেনে—শ্রোতা নাই।

আশ্চর্য, এতক্ষণ, কী সভ্যভব্য ভদ্রলোকটি—কী সব তত্ত্বকথার খই ফুটছিল মুখে! হঠাৎ কেমন কটু হয়ে উঠল পরিবেশটা যেন। ওস্তাদ ঝাঁকসা কী? বড় দুর্বোধ্য লাগে লোকটাকে। হয়ত মুখোশ দেখছিল এতক্ষণ। এবার মুখ দেখছে। কেমন খারাপ লাগে সনাতনের। এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসেছিল সবার সমক্ষে! নিজের ব্রাহ্মণত্বের কোন স্মৃতিই ছিল না যেন কিছুক্ষণ অব্দি।...

সনাতন বলে, আমি শুনি—আপনারা বলুন।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, আপনার দিব্যি মাস্টার, আসরে প্রথম এই সুবর্ণকে দেখে আমি তো অবাক। খেমটাদলের মেয়ে এনেছে নাকি? ...এখনও আমার মনে সন্দেহ আছে মশাই। ...ইচ্ছে করছে, ...হঠাৎ চুপ করে যায় সে।

সুবর্ণ কটাক্ষ হানে। ...বলুন, বলুন, কী ইচ্ছে করছে?

শুনবি?

হুঁ-উ। আপনি ওস্তাদদের রাজা। আপনার কথা আবার শুনব না?

তবে ওই ঘরের মধ্যে চল তো বে। পরখ করে দেখি, তুই পুরুষ না মেয়ে!

দলশুদ্ধ হাসছে। কিন্তু সনাতন গম্ভীর। ছিঃ, কী কদর্য সব কথাবার্তা লোকটার! আলকাপের এসব ইতরামির দিক তো জানা ছিল না তার। হয়ত বড়দলগুলোর সঙ্গে মেশেনি—তাই জানে না। সনাতন সুবর্ণর দিকে ক্ষুব্ধদৃষ্টে তাকায়।

সুবর্ণর চোখ ওস্তাদজীর দিকে। হঠাৎ সে অশোভনভঙ্গীতে বুকটা চিতিয়ে বলে, বেশ তো—বুক দেখলেই বুঝবেন। অত ডাক্তারীর দরকার কী?

সত্যিসত্যি ওস্তাদ ঝাঁকসা বুকের দিকে হাত বাড়িয়েছে—মুখে একরকমের নিষ্ঠুর অমানুষিক হাসি! আর সনাতনের মনে হয়—যেন ওস্তাদ ঝাঁকসা সত্যিসত্যি পরীক্ষা করতে চায়। বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও।

সুবর্ণ কিন্তু তারপরই সরে গেছে। ...অত সোজা, তাই না?

খানিক পরে ওরা উঠে পড়ে। পয়সা কড়ি চুকিয়ে দিয়েছে। বিদায় দিতে মাঠ অব্দি এগিয়ে এল কত মানুষ।

সনাতন যতই ক্ষুব্ধ হোক ম্যানেজার আমির আলিকে যে ওস্তাদ ঝাঁকসা বশীভূত

করে ফেলেছে, তা ঠিক। ঝিঝিডাঙায় ক'আসর বায়না আছে ওস্তাদ ঝাঁকসার। এদের দলের কয়েকজনকে হায়ার চায়। আসর পিছু পঞ্চাশ টাকা দেবে! ওস্তাদ ঝাঁকসা আর কজন থাকবে সঙ্গে। ভানু আর অন্যান্যদের বিদায় দেবে। খুব বড় জায়গার আসর। গুণীমানী ভদ্রজনের সমাবেশ। সুবর্ণর মতো ছোকরা আর এইরকম টাটকা সুন্দর সেট থাকলে ওস্তাদ ঝাঁকসা রহিমপুরকেও কেয়ার করে না। তাছাড়া সাঁওতাপাড়ায় এমন একটা ভাল দল আছে সেটাও তো প্রচারিত হবে দেশে-দেশে। ও অঞ্চলে একবার গেলে বায়নার ছাড়ান থাকবে না। চোখে পোকা ধরে যাবে রাত্রি জেগে। টাকা বয়ে আনতে পারবে না আমির আলিরা! আর ওই সুবর্ণর বুকটা টাকায় আর মেডেলে ভরে যাবে একেবারে।

আমির আলি রাজী। সুবর্ণর মাইনে আছে, সাজপোশাক আছে, খোরপোষ আছে—চিরকাল কি গাঁট থেকে চাঁদা করেই দিতে হবে সেগুলো? এখনও দলের নাম ভালমত ছড়ায়নি। বড় ওস্তাদের সঙ্গে থাকলে শিক্ষা যেমন হবে, তেমনি প্রচারও কম হবে না। তার ওপর বলে কী! আসরপিছু পঞ্চাশ টাকা! এ যে যাত্রাদের 'বেতন'! বেচারা তখনও জানে না, রাঙামাটির আসরেই ওস্তাদ ঝাঁকসা একশো টাকা রাত নিয়েছে।

দলের লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সবাই রাজী। কেবল, —কেবল যেন সনাতন কেমন নিরুসাহী। খামখেয়ালী লোক—আমির চোখ টিপেছে সুবর্ণকে, ...তুই সাধলেই যাবে। বল না গিয়ে।

সনাতন বলে, গেলে আমারও শিক্ষা হবে, বুঝি। ওস্তাদ ঝাঁকসাকে আমি নিজেও ওস্তাদ বলে মেনেছি। কেমন করে আসর রাখতে হয়, গান গাইতে হয়, কাপ জমাতে হয়—সে ব্যাপারে উনি সেবার ওস্তাদ। কিন্তু এদিকে যে অনেক সব দল ধরেছি—তাদের কাছে 'দলশিক্ষার' টাকাও নিয়ে বসে আছি। যাই কী করে!

সুবর্ণ বলে, কথা বুঝি তাই ছিল ওস্তাদ? কেন দল ধরলেন অত? যদি সাঁওতাপাড়ার এরা কোনদিন আপনার অসম্মান করে...

চাপা গলায় সে বাকিটুকু বলে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমি পালিয়ে যাব।

চোখ জ্বলে ওঠে সনাতনের। পালিয়ে যাবি? আমার সঙ্গে? ...পরক্ষণে সে হাসে। ...তুই কী সব বলছিস! ঘর বাঁধবার জন্যে পালানো শুনেছি—আমরা কী বাঁধব রে সুবর্ণ?

দলের লোকেরা এগিয়ে গেছে সামনে। দুটো দল এখন মিছিলে এক। এরা পিছিয়ে পড়ছে। সুবর্ণ ওর হাতটা ধরে গা ঘেঁষে পথ হাঁটে। বলে, ঘর বাঁধব না, দল বাঁধব।

অজানা ভয়ে সনাতনের বুক ঢিপঢিপ করে। পাদুটো অবশ লাগে। সে বলে, তারপর?

...তারপর আর কী? গান করব।

...তারপর?

...গান করব।

...তারপর?

হাত ছেড়ে ভুরু কুঁচকে হাসে সুবর্ণ। ...যান! তারপর আর কিছু থাকতে নেই। চুপ করে হাঁটে সনাতন। কথা বলে না।

সুবর্ণ বলে, গান ছাড়া আর করব কী বলুন! মরে যাবো না?

সনাতন বলে, একদিন বয়স হবে। বুড়ো হতে হবে। চুল পাকবে। দাঁত ভাঙবে। তখন—তখন কী হবে রে সুবর্ণ?

সুবর্ণ কপট ক্ষোভে বলে, ও বুঝেছি! আমার যখন চুলকাটবার বয়স হবে, তখন আমাকে আর ভাল লাগবে না আপনার। এই তো বলছেন?

সনাতন ওর হাতটা নেয়। নরম নিটোল হাতের চুড়িগুলো নাড়াচাড়া করে। বলে, কে জানে কী হবে! অতদূর আমি দেখতে ভয় পাই রে সুবর্ণ।

আনিস এক ফাঁকে পিছিয়ে আসে। সাইকেলটা গড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে। এসে বলে, চলুন মাস্টারমশাই—থুড়ি, ওস্তাদ হয়ে গেছেন আজ থেকে, ওস্তাদই বলি। চলুন ওস্তাদ, ঘুরে আসি ঝাঁকসার সঙ্গে। ক্ষতি কী? এতদিন তো আদাড়-বাদাড়ে শেয়ালরাজা হয়ে কাটালাম, এবার দেশেদেশে দিগ্বিজয় করে আসি। যত নাম তো হবে সুবর্ণ আর আপনার! আমরা মশাই চিরকাল 'তলপেট' (নিচের তলার) হয়ে থাকব।

সনাতন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি বলছ যেতে?

কেন বলব না? এমন সুযোগ ছাড়া কি ঠিক?

বেশ, যাবো।

সুবর্ণ দৌড়ে যাচ্ছে। ম্যানেজারের কাছে খবরটা দেবে।

ঝিঝিডাঙা। নামটা চেনা মনে হচ্ছে। নলহাটির ওদিকে কোথায় যেন। ...মনে পড়েছে সনাতনের। খুব বড় মেলা বসে ওখানে। চৈত্রমাস অব্দি থাকে মেলাটা। বিস্তার বাউল-বোষ্টম আসে। আসর হয়। নদীর ধারে ভারি সুন্দর জায়গাটা। খুব বড় গ্রাম! একবার গিয়েছিল সেখানে। বাউলদের দলে মিশে সারারাত্রি গান গেয়েছিল। হরিপদ বাউল—তার বোষ্টুমীর নামটা কী যেন ছিল, ...সোনা বোষ্টুমী—ভারি মিঠে গলা। কোথায় তাদের আখড়া আছে যেন। তিনচার বছর আগের কথা ...আহা, বড় ভাল লেগেছিল সেখানে।

সনাতন যাবে। সেদিন সেখানে সে ছিল অখ্যাত—অজ্ঞাতকুশীল এক বাউণ্ডুলে নিতান্ত গায়ক। এবার সেখানে সে সনাতন ওস্তাদ—আত্মপ্রকাশ করবে নিজের পূর্ণ মহিমা নিয়ে। থাকনা ওস্তাদ ঝাঁকসা—সে নিজেও তো কমকিছু নয়। সুবর্ণর সঙ্গে ডুয়েট দেবে। স্বাধীনভাবে ছড়া গাইবে। আত্মপরিচয় ঘোষণা করবে জনমণ্ডলীতে।

বুক ফুলে উঠেছে সনাতনের। গুনগুন করে এখনই সে-আসরের ছড়া বাঁধতে থাকে সে। ...হঠাৎ চমকে ওঠে খানিক পরে। এ কোন সুরে গুনগুনানি চলেছে তার? সেই—

কী দিয়ে মন বুঝাব, এখন আমি কোন পথে যাব।।

এসে গেল যখন, ছাড়তে পারল না। মুখস্থ হয়ে গেছে কলিগুলো। গাইতে লাগল সে। মন কেমন উড়ু উড়ু লাগছে। উদাস আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে মনটা। গাইতে গাইতে ভাবছে, কী হারিয়েছে তার জীবন থেকে—কেন এত পরিচিত লাগে গানখানা? যেন

নিজের নাড়ীতে বাঁধা—অচ্ছেদ্য মর্মবাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে এমনি করে। নাকি ভবিষ্যতে কী অনিবার্য হারানোর বিশ্বাসে আগে থেকেই তার আত্মা এই গান সুরখানিকে ছিন্ন করে রাখছে! নাকি আলো পড়ে গেছে সামনের অন্ধকারে—সবহারানো আগামী সনাতনকে দেখে বর্তমান বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে ?
...ভাবতে ভাবতে গাইছে সনাতন। ...'আমার হৃদয়মন্দিরে, বাঁশি বাজত দিনরাতে রে—এখন আমি কী নাম ধরে'...ঠিক এখানেই একটা মারাত্মক, বিষণ্ণ, দরদী ভাঁজ আছে—মোচড় পড়ে সুরটার—তানেতানে সাতটা স্বর কড়িকোমলে ঘুরে আসে, কতকটা কীর্তন—কিছু যেন বেহাগ রাগের স্পর্শ...স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না—মর্মবাণী রক্তের সঙ্গে উগরে পড়ে, 'কী নাম ধরে'...কী, নামটা ছিল কী তাহলে! ছিল, একটা কিছু ছিল। সূর্য ডোবার পর কিছুক্ষণ জুড়ে মাঠ নদী গাছপালা দিগন্তে নীলাভ আবছায়া দেখে, হঠাৎ ভিড়ের একাকারে কোন একটি মুখের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ সনাতনের বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে কতদিন। কী যেন ছিল, কে যেন এল—ঠিক সেই রকম। ভুলে থাকার অভ্যাসে সব কবে ভুলে গেছে।

ব্যাগ থেকে বাঁশিটা বের করে সনাতন। চলতে চলতে মাঠের পথে বাঁশি বাজাতে ভারি ভাল লাগে। কিন্তু ফুঁ দিতে গিয়ে রেখে দেয়। ওস্তাদজী বলছিল, বাঁশি ভাল জিনিস। তবে দেখবেন, আপনার দামী গলাটা খুন করবে শালা। অ্যাদ্দিন করে নি কেন, অবাক হচ্ছি। হুঁশিয়ার মাস্টারজী, শরীরের এক যন্ত্র দিয়ে ডবল কাজ করাবেন না।

তা শুনে ফজল কী বুঝল কে জানে, হেসে বলছিল, মনে তো বোঝে না রে ভাই! কী বলেন মাস্টার?

ওস্তাদজী তেড়ে গিয়েছিল তাকে, চুপ, বেহুদা খবিস, চুপ! সবসময় ইতরামি।

এখন সনাতন ফজলের রসিকতাটা বুঝতে পেরেছে। জঘন্য! গানবাজনার মত পবিত্র ব্যাপারে ওরা এত কদর্য জিনিস জুড়ে দেয়! বড় খারাপ লাগে তার। সেও কি একদিন এদের মতো ইতর হয়ে পড়বে?

ফের সে গুনগুনিয়ে ওঠে, ...কী দিয়ে মন বুঝাব—

পবিত্রতর—পবিত্রতম বিষণ্ণতায় মন ফের সব ধুলোমাটি ছাড়িয়ে সামনের আকাশের দিকে চলে যেতে থাকে। না, সে আর কিছু আশা করে না—শুধু গান, শুধু 'শুনিয়ে' মানুষ, শুধু সেই আসরের মোহিনী নটী—কিশোর সুবর্ণ নয়। সে এক অমর্ত সুবর্ণলতা।

স্টেশনের দিকে সবার গতি। সন্ধ্যার ট্রেনেই ঝিঝিডাঙা পৌঁছবে। অদূরে স্টেশনের লালবাড়ি, টেলিগ্রামের তার, সিগন্যাল পোস্ট, রেললাইন—শেষবেলার আলোয় সনাতনের মনে একঝলক সহজ খুশি ছাড়িয়ে দিল এতক্ষণে। এত ভাল লাগবে এইরকম যাওয়াটা! বাকি জীবন শুধু যাবে, যাবে আর যেতেই থাকবে—পিছু ফিরবে না সে।

পাশ থেকে আনিস ফিসফিসিয়ে ওঠে, শালা ফজলার কাণ্ড দেখছেন! সুবর্ণর মতো ভাল ছেলেটার ও সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

সনাতন নিরাসক্ত চোখ তুলে একবার দৃশ্যটা দেখে নেয় মাত্র। ফজল সুবর্ণর কাঁধ

ধরেছে—অসভ্যের মতো সুবর্ণর বুকে হাত রেখেছে—কী বলছে আর দুজনেই হাসির চোটে ভেঙে পড়ছে। ...

তাতে কী! সুবর্ণ তো মেয়ে নয়। ...সে মনে মনে এইকথাটা বলে নেয়।

ঝিঁঝিডাঙা।

কি অদ্ভুত নাম! এখানে বুঝি সারাটি রাত ঝিঁঝিপোকা ডাকে? ...সুবর্ণ কয়েকবার বলেছে কথাটা। কেউ কান করেনি। সবাই ক্লান্ত। পিছনে মেলা—প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে বিরাট চটানে অজস্র দোকান, সার্কাস. ম্যাজিক আর সিনেমার তাঁবু—লোকসমুদ্র গর্জন করছে। কাছারিবাড়ির একটা ঘরে ওদের আড্ডা। কেউ হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখেছে—কেউ দেয়ালে হেলান দিয়েছে। বাহক নফর আলি শুয়ে গেছে যথারীতি। ওস্তাদ ঝাঁকসা দিব্যি হারমোনিয়াম বাক্সের ওপর বসে রয়েছে দেখে ম্যানেজার আমির আলি বিরক্ত। সনাতন এত ক্লান্তিবোধ কোনদিন করেনি। ক্ষিদে পেয়েছে। লায়েকপক্ষ সেই যে গেছে ফেরার নাম নেই। আপাতত চা-মুড়ি আসবার কথা, তারপর রান্নার ব্যবস্থা। আসর দেবে সেই শেষরাত্রে। এখন সেখানে স্থানীয় দলের যাত্রা চলেছে।

দরজার সামনে ভিড়। সবাই ছোকরা খুঁজছে। সুবর্ণ মাথাটা চাদরে মুড়ি দিয়েছে—নয়ত হাজাররকম রসের তুবড়ি ফাটবে ভিড়ে। তবে কণ্ঠস্বর শুনে কেউ কেউ বুঝি ধরে ফেলেছে। বলছে, ওই তো, ওই যে ...একজনের তীব্র প্রতিবাদ—ধুর, শান্তিকে আমি চিনি, ঝাঁকসুর ছোকরা শান্তি। গতবার গান করে গেল না?—হয়ত বদলেছে। —এই দাদু, মুখটা আলোয় ঘোরাও না, দেখি আমরা! বুঝতেই পারছ ঝিঁঝিডাঙা নাম—আসর না জমাতে পারলে ঝিঁঝিপোকা ডাকিয়ে দেবে মাথায়। বড় বড় দলের গান হয় এখানে। বিখ্যাত সব ছোকরা মেডেল নিয়ে যায়। হুঁ হুঁ বাবা।

হ্যাসাগটার শোঁশোঁ শব্দ এককোণে। ঘরের ভিতর আর কোন শব্দ নেই। শেষরাত্রে আসর? কী নিয়ম এদেশে! আমির আলি একবার অস্ফুটকণ্ঠে একথা বলেছে। জবাব না পেয়ে চুপ করে থেকেছে।

কতক্ষণ পরে লায়েক পক্ষের লোক এসে গেল। মাথায় মাড়োয়ারী টুপি, পরনে প্যান্টশার্ট—যুবকটি প্রথমে ফজলকে খোঁচা মেরে 'বাঘড়ে ভাষায়' (ফজলের যা ভাষা) বলে, উঠনা জী! ভুজা খাবা, ভুজা! ভিড় হাসছে। হাসতে হাসতে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। পুরো এক বস্তা মুড়ি। এনামেলের হাঁড়ি ভরতি নতুন গুড়। কয়েকটা কাচের গ্লাস। একবোঝা শালপাতা। আর একবালতি জল। দলশুদ্ধ লাফিয়ে বসেছে।

কেউ-কেউ কোঁচড়ে নিয়ে নিজের জায়গায় সরে যাচ্ছে। বাদবাকি সবাই বস্তার সামনে গোলাকার। নন্দ মুখুয্যের হাত সবার আগে বস্তার ভিতর। তারপর 'বামুনব্যাটা জাত মারলে রে' বলে স্বয়ং রাশভারি আমির হুমড়ি খেয়ে পড়ে তারপর 'আমি বাগদী হে মামু' বলে কাবুল—ঘনশ্যাম তার অসাধারণ লম্বা হাতটা ঢুকিয়ে দেয়।

সনাতন ইতস্তত করছিল। আনিস বলে, আরে সর্বনাশ! আপনি—

ওস্তাদ ঝাঁকসা মাথা তুলল বস্তার চার পাশের ভিড় থেকে—মুখে একগাল মুড়ি, চিবুকে গুড়, খপ করে বাঁহাতে সনাতনের একটা হাত টেনে ঢুকিয়ে দিল সে।

সনাতন চোখ বুজে চিবুচ্ছে। স্বপাক খায় এখনও—যেখানেই যাক। আজ সব বিধি ভেঙে গেল যে! যাক গে। মন্দ লাগছে না! কিন্তু সুবর্ণ কই? সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, সুবর্ণ কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে কোণের দিকে বসেছে। তার হঠাৎ লোভ হয়, সুবর্ণর সঙ্গে এককোঁচড়ে খাবে—কিন্তু পারে না।

যে পারল, সে ফজল। দুহাতে যতগুলো পারে, তুলে নিয়ে সুবর্ণর কাছে গেল সে। বলল, কই রে, আঁচল খোল।

সনাতন অবাক। সুবর্ণ হাসতে হাসতে কোঁচড়ে নিয়েছে মুড়িগুলো। ফজলের সঙ্গে খাচ্ছে। কেমন কটু লাগল দৃশ্যটা। মুসলমানের সঙ্গে খাচ্ছে সুবর্ণ!

বাইরে থেকে কে মন্তব্য করল, গেনেরা খাচ্ছে। গেনেরা গেনে—আর কোন জাত নেই তাদের! সনাতন তার চারপাশে গেনেদের দেখে। ছায়াগুলো দেয়ালে একাকার হয়ে নড়ছে—কচরমচর চিবুনোর আওয়াজ শুধু, অস্ফুট মন্তব্য মাঝে মাঝে, বাইরে থেকে হঠাৎ ভেসে আসে মেলার কলরোল, নাগিন বাঁশির সুর, আসে পাঁপরভাজার গন্ধ, ... পরিব্যাপ্ত এক বিরাট স্পন্দন সব মিলিয়ে, এক বিচিত্র রঙের সমাবেশ, তবু এক বই দুই নয়।...

ঘুম এসেছিল সনাতনের। বারান্দায় ইটের উনুন পেতে রান্না হচ্ছে। রাঁধছে নন্দ। ছিলিমও টানছে মাঝেমাঝে। কাদের আলির বিলিতি বোতলটা শেষ হয়নি—তাই নিয়ে চলে গেছে আনিস ফজল আর সে। ওস্তাদ ঝাঁকসা বাইরে কোথায় বেরিয়েছে। হয়ত মেলায় ঘুরছে। আমিরকে ডেকে নিয়ে গেছে। সনাতন ঘুমোচ্ছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। কোথায় শুয়ে আছে সে? এবড়োখেবড়ো মেঝে—মাত্র সতরঞ্জী পাতা রয়েছে, পায়ের ধুলোয় তা বিশ্রী হয়ে উঠেছে, তার ওপর শুয়ে পিঠ ব্যথা করছে। মাথায় ব্যগটা বালিশ করেছিল। কিন্তু এখানে কেন সে? কয়েক মুহূর্ত সবকিছু অস্পষ্ট লাগে তার। উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকে অন্ধকার ঘরে। আলোটা বাইরে রান্নার কাছে নিয়ে গেছে ওরা। দরজার বাইরে কাছারির প্রাঙ্গণে একটা কুকুরের মস্তো ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেলার আওয়াজ কানে আসে!

পরক্ষণে সে দেখল, তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুবর্ণ শুয়ে আছে। কে জানে কেন, তক্ষুণি কী এক হঠকারিতায়, প্রবল মায়ায় আত্মমগ্ন ব্যাকুলতায়, হয়ত চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ঘুম থেকে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে এবং জলে ডুবে যাওয়া মানুষের অসহায়তায় খড়ের টুকরো আঁকড়ে ধরার মতো—এক অজানা আবেগে খুব জোরে চেপে ধরল সুবর্ণকে, তারপর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে চুমু খেয়ে বসল ঘুমন্ত দুটি ঠোঁটে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কী ঝাপটা এল—সেটা অসম্ভব কোন অমর্ত ফুলের গন্ধ ভেবে সে তন্ময় হল কয়েকটি মুহূর্ত—তারপরই সুবর্ণ জেগে উঠল। জড়ানো গলায় বলল, আঃ, ফজলদা, সব সময় ইয়ারকি ভাল্লাগে না...

সনাতন ফিসফিস করে বলে ওঠে, আমি. আমি রে সুবর্ণ!

সুবর্ণ মুখটা তুলে একটু শব্দ করে হেসেছে। তারপর ওকে সামান্য আকর্ষণ করে বলেছে, আসরের অনেক দেরি। শুয়ে থাকুন, চুপচাপ।

শুল না সনাতন। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল সে। প্রাঙ্গণে হেঁটে পথের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ ঝুলে আছে তালগাছের মাথায়। ঝমঝম করে বাঝছে রাত্রিবেলাটা।

মনে মনে তেতো—ভারি, আর ক্লিষ্ট সনাতন ডাইনে ঘুরে মেলার দিকেই যাচ্ছিল। আফসোসে ছটফট করছিল সে। কী ভাবল সুবর্ণ? কেন সে এমন ইতর হয়ে পড়ল? মুখ দেখতে লজ্জা করছে সুবর্ণকে।

সামনের বটগাছের নিচে কারা বসে রয়েছে। সনাতনকে দেখেই ডেকছে, মাস্টারজী! আরে আসুন, আসুন।

ফজল, আনিস আর কাদির। সনাতন দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। মদ খাচ্ছে ওরা। তারপর হঠাৎ সনাতন বসে পড়ে। ফিসফিস করে চাপা উত্তেজনায় বলে, দাও—একটু ফুর্তি করা যাক।

আনিস বলে, বাঁচলাম দাদা। সবাই লেজ কাটলাম—তা নাহলে খুব খারাপ লাগত। কিন্তু, আপনি খান—তা অ্যাদ্দিন বলেন নি তো! আমরা তো প্রায়ই খাই।...

সনাতন এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে গুনগুনিয়ে উঠল,

আজ, কী আনন্দ দেখলাম রে নভে নবীন চাঁদের উদয়।
মায়ায় মায়ায় জন্ম যাক না, যদি আরেক জন্মে সত্যি হয়।।

ওরা লাফিয়ে উঠল, বাহবা ওস্তাদ, বাহবা!

তারপর ঠিক কী কী ঘটেছে, মনে পড়ে না সনাতনের। অনভ্যাসের ফলে—একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিল ওস্তাদী ঝোঁকে—এখন খুব খারাপ লাগে। কষ্ট হয়। মুখ তুলে ফ্যালফেলে চোখে চারপাশে তাকায়। আসরে বসে আছে সে। যন্ত্রগুলো বাজছে। ওপাশে বুঝি বিপক্ষ দল। কার দল, মনে পড়ল না তার। সুবর্ণ এখন নারীবেশী। আসরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাহলে যন্ত্রের মত নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে। কারণ, এখনও বাঁশিটা তার কোলে রয়েছে। ...ফের ঘুম পেল তার। কুঁকড়ে অপরিসর জায়গায় শুল সে। কে বলল, শরীর ঠিক হয়নি এখনও?

ঘুম ভাঙল গানের আওয়াজে। কী কাপের গান ধরেছে ওস্তাদ ঝাঁকসা। শেষ রাতের আসরে আবিষ্ট শ্রোতা চারদিকে—সনাতনের কানে আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আসে, পালাটা তখন তার অপরিচিত, পূর্বাপর কিছুই জানে না—শুধু মনে হয়, একটা কিছু ভয়ঙ্কর ঘটে গেছে কারো জীবনে, সেই মহাকাশের সাগর উথলে উঠেছে চারপাশে, সনাতন হুড়মুড় করে উঠে বসল।

জোর জমে গেছে কাপটা। মাথার চুল ছিঁড়বার ভান করে ওস্তাদ ঝাঁকসা বিলাপ করছে কার জন্যে।

সুবর্ণ হাঁটু দুমড়ে বসে আছে হারমোনিয়ামের সামনে। ফিসফিস করে বলে, নেশা ছুটল? সুবর্ণর চোখে ভর্ৎসনার কুঞ্চন। ছিঃ, ওই খায় নাকি মানুষ! কতক্ষণ মাথায় জল

ঢেলে তবে সুস্থ হয়ে ঘুমোলেন! ক্ষিদে পায়নি? থামুন, আমরা বসলে ওরা উঠবে—তখন গিয়ে খেয়ে আসবেন। খাবার রেখে দিয়েছে আপনার।

সনাতন হাসে। মনে পড়ছে এবার। কখন ঝোঁকে আসরে চলে এসেছিল হুড়মুড় করে। হ্যাঁ, সব মনে পড়ছে। সে বলে, বিপক্ষে কে যেন সুবর্ণ?

...বিপক্ষ দল এই এলাকারই। নলহাটির মনকির ওস্তাদ। ওই যে বসে আছে, গলায় লাল মাফলার, জহরকোট আর শার্ট গায়ে—দেখছেন? ছিপছিপে, পাতলা চেহারা? ...সুবর্ণ দেখায়। তারপর মন্তব্য করে, মন্দ নয়। ওর গানের সুর আলাদা! কথাও অন্যরকম। ছোকরা গাইবে, শুনবেন। অবশ্যি আপনার মত 'আধুনিক রীতি' ও জানে না। ...সুবর্ণ হেসে ওঠে।

সনাতন বলে, খাবো না কিছু।

হঠাৎ ফজল ঝুঁকে আসে তার কানের কাছে। বলে, জুবেদাবিবির কাপ দিচ্ছে। এবার আপনি উঠুন। ইসা পয়গম্বর সেজে উঠুন। বলুন, কাঁদিওনা বাদশা, তুমি যা চাইছ—তাই হবে। তোমার আদ্ধেক আয়ুর বদলে তোমার বেগমের প্রাণ ফিরে পাবে। কবরে হাত দিয়ে বলো, আমার আদ্ধেক আয়ু তোমাকে দিলাম...দিলাম...দিলাম।

সনাতন হাঁ করেছে। বলে কী? আগামাথা জানা নেই। সে ইতস্তত করে।

ফজল ধমকায়, উঁহু। আপনার রাজপুরুষ চেহারা—আপনাকেই উঠতে হবে। আগামাথা জানবার দরকার নেই। উঠেই দেখবেন—সব ঠিক হয়ে যাবে। ওস্তাদজী যা বলার আপনাকে বলিয়ে নেবে। ...ব্যস, হ্যাঁ—উঠুন!

এরই নাম আলকাপ। সনাতন টের পায়। পরক্ষণে সে ফজলের চিমটি খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুহূর্তে মাথায় খেলে যায় তার—সেও তো সমর্থ ওস্তাদ, গান বাঁধতে পারে, পাল্লা তৈরিও হয়ত করতে পারে—অভিনয়েও সে পটু, কথার পিঠে কথা জুড়তেও সে সক্ষম—তাহলে তার ঝিঝিডাঙা আসরে এই প্রথম উদয়টুকু শ্রোতার মধ্যে উজ্জ্বল হবে না কেন? সনাতন ধাঁ করে ধুয়ো বেঁধে নেয়—তান দিয়ে আসরকে উচ্চকিত করে তোলে সে, মদ খেলে নাকি গলা ভালো খুলে যায়...সে গায়,

হেথা—বাদশা ফকির সবায় সমান
হিন্দুরা শ্মশান বলে, মুসলমানে গোরস্থান।।
আবার—এইখানেতে যিনি খোদা
সেইখানেতেই ভগবান।।
সনাতন রায় ভেবে বলে
মুদলে চক্ষু যাব চলে
হিন্দু ভাইরা বলুন হরি, আল্লা বলুন মুসলমান।।

অমনি যথারীতি চারপাশে একই সঙ্গে হরিবোল আর আল্লাবোল মিলেমিশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল কিছুক্ষণ। আলকেপে রীতিতে কথায় বলে সনাতন, তবে—এ ভীষণ গোরস্থানে আমার উদয়, মনে বড় চিন্তা হয়, কে হারাল প্রিয়জন, না জানি কী অমূল্যরতন, তারে দিতে আশা, আমি পয়গম্বর ইসা...সুনিপুণ অনভ্যস্ত মিল দিয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসার মত বলতে চেষ্টা করে সে। আর ওস্তাদ ঝাঁকসা টেরা চোখে তার

দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি। কাছাকাছি হতেই সে ফিসফিসিয়ে ওঠে, বাঃ মাস্টার! ভাল।

অর্ধেক আয়ুর বললে বেগমের প্রাণ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দেয় শ্রোতারা। কে কেঁদে ওঠে বিশ্রী শব্দ করে। কে ফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ে। কে বলে, আহা হা গো!

সুবর্ণ—জুবেদা বেগম যেন ঘুম থেকে চোখ খোলে, চারপাশে শরীর ঘোরায় নাচের ভঙ্গীতে। দুটো বাহুর ওপর আলো খেলে। লাল ঝকমকে ব্লাউজ। হাতে চুড়ি—চুড়ি বাজে। কানের দুলে আলো। শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে— দেহের ভাঁজে ভাঁজে আলো খেলে। লাল ঠোঁট ঈষৎ কাঁপে। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত—চোখে তুলনাবিহীন দৃষ্টি। মায়া জীবন্ত হচ্ছিল ক্রমশ।...আঃ, কোথায় আমি ঘুমিয়েছিলাম। কেন? সে বলে ওঠে অপরূপ কণ্ঠস্বরে...

সনাতনের কানের কাছে ওস্তাদজী বলে, বসে পড়ুন। কাজ শেষ। সনাতন মোহগ্রস্ত যেন। হঠাৎ আলকেপে রীতিতে ওস্তাদজী শ্রোতার দিকে বলে, কেমন লোক দেখুন...প্যাট প্যাট করে আমার বেগমকে দেখছে। এবার আসেন মিয়াসাব, আমার বিবি নিয়ে এখন ঘর যাই!...

হাসির ঝড়ে বিস্রস্ত হয়ে সনাতন বসে পড়েছে।

সকালে তখনও আসর চলেছে। দুপুর অব্দি চলবে। কে একজন আসরে এসে সনাতনকে বলে যায়, বাইরে আসুন—একটি মেয়ে আপনাকে ডাকছে।

মেয়ে? সনাতন অবাক। বাইরে গিয়ে সে দেখে, মনোহারী দোকানের সামনে একটি মেয়ে তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছে যেতেই সে বলে ওঠে, চিনতে পারছ তো? আমি সুধা।
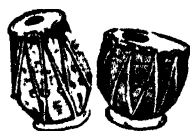
সুধা! কয়েকমুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে সনাতন। তারপর হেসে ওঠে। ...আরে কী মুশকিল! তোমায় চেনাই যায় না যে! এত বড় হয়েছ তুমি! ইস আমি ভাবছি — কে রে বাবা!

সুধা ভুরু কুঁচকে হাসে। হাতে একগাদা পাঁপরভাজা। ঠোঁটের কোণে তেলের ছোপ। আঁচলে ঠোঁটটা মুছে নেয় সে। বলে, তুমি। সেই কখন থেকে দেখছি—অত চেনা মানুষ, চেনা গলা! অথচ তুমি যে আলকেপেদের দলে ঢুকেছ, তা কেমন করে জানব বাপু! আর কিছু পেলে না—এই মিস্নোনাচানো! যাও।

সনাতন সুধাকে দেখতে থাকে। বেশ দামী ঝকমকে শাড়ি জামা পরেছে সুধা, গলায় হার, হাতে রুলি, কানে পাশা, সবই সোনার—আলতা পরা পায়ে স্যান্ডেল। শ্রী খুলেছে মুখের। সুধা তো অমন স্বাস্থ্যবতী ছিল না কোনদিন। রোগা হাল্কা গড়ন ছিল ওর। কী মোটা হয়েছে সে তুলনায়। সনাতন দেখতে দেখতে ওর কথার জবাব দেয়, তা তুমিও তো মিস্নোনাচানো দেখতে এসেছো।

নাঃ। সুধা মাথা দোলায়। ...সেই প্রথম রাত্রে যাত্রা শুনে ঘরে গেছি। সকালে আমার দেওরপো বায়না করল, সাইকেল কিনবে...ফিক করে হাসল সে, ...সাইকেল না কী বলে জানে বাপু...ওই যে রয়েছে, চাকার মাথায় লাঠি লাগানো। দাম শুনে অস্থির। কী রে পেঁচো, কী হল? মিটল সাধ?

সুন্দর চেহারার সাত আট বছর বয়সের হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটিকে পেঁচো বলছে শুনে সনাতন হাসে। তবে সুধার এই অভ্যাস। সনাতন বলে, ঝিঝিডাঙ্গায় তোমার বিয়ে হয়েছে তাহলে? বাঃ। কদ্দিন?

এক বছর হবে আসছে জষ্ঠিতে। সুধা বলে। ...তুমি তখন ছিলে নাকি ভদ্রপুরে যে জানবে! শুনেছিলাম, কলকাতায় গান রেকর্ড করাতে গেছ। দেশে দেশে নাম ফুটবে এবার। তা ওমা—আলকেপেদের দলে।

ঠাট্টা কেন? সনাতন ম্লান হেসে বলে। ...কেমন আছ বল?

বড় বড় চোখ তুলে শান্তভাবে সুধা বলে, খুব ভাল। তুমি? রাত জেগে চেহারাখানা তো একেবারে হাড়গিলে করে ফেলেছ! ভদ্রপুর থেকে কবে এসেছ? দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি? বৌদিরা কেমন আছে সব?

সনাতন বলে, আমি অনেকদিন যাই নি বাড়ি। ...আর...একটু ইতস্তত করে সে বলে, বাড়ি যে ছিল না, সে তো তুমিও দেখেছ। গেলে এর-ওর চুলোয় রাতটা কাটাতাম।

কয়েক মুহূর্তে সুধা মেলার বাইরে চোখ রাখে—দূর দিগন্তের দিকে কোথাও—তারপর উদাস চাহনিতে একটু শান্ত হাসে সে। অস্ফুট চাপা প্রশ্বাস ফেলে বলে, আমারও তো তাই। কতকটা!

কেন? তোমার দাদা আছেন—

সে কথার জবাব না দিয়ে সুধা দেওরের ছেলের দিকে হামলা করে, হ্যাঁ রে, এরই মধ্যে গাড়িখানা ভাঙবি নাকি? বাড়ি গিয়ে চালাস যত খুশি। আমার তো আবার শতেক জ্বালা—বলবে ইচ্ছে করে ভাঙা গাড়ি কিনে দিয়েছে। বললেই হল—না কী?

প্রশ্ন সনাতনকে। সনাতন বলে, জামাইদা কী করেন?

সুধা হাসতে হাসতে জবাব দেয় এবার, ছেলে ঠ্যাঙানো পণ্ডিত। তোমার বাবা যা ছিলেন!

সনাতন একটু কাসে। একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, ওনাকে নিয়ে গান শুনতে এসো আজ। সন্ধ্যার পরই আসর পড়বে। দেখবে খারাপ লাগবে না। আসবে তো?

সুধা জিভ কেটে বলে, তাহলেই হয়েছে! আলকাপ শুনতে এসেছি শুনলে টি টি পড়ে যাবে না চারিদিকে! তার ওপর, গাছপাথরের মতন মানুষটি—খায় দায়, ছেলে ঠ্যাঙায় আর ঘুমোয়। গানটানের দিকে ঝোঁকই নাই। যাত্রা কেত্তন হলে কারো সঙ্গে আসি—সেও খানিকক্ষণ!

সনাতন হেসে ফেলে কথার ভঙ্গীতে। বলে, তুমি কিন্তু গানের নামে একেবারে মেতে উঠতে। গোরাদার ঘরে যখন হাবুল গোঁসাইকে নিয়ে আখড়া দিতাম—

সুধা বাধা দিয়ে বলে, থাক। আর সে রামায়ণ গেয়ে লাভ নেই। এরা যদি শোনে

যে পণ্ডিতের বউ গান গাইত, পষ্ট বলে বসবে, ওম্মা, এ যে ঘোমটাওলী গো!... সুধা হেসে ওঠে।...

সনাতন বলে, সেকি! আজকাল নাচগান না জানলে তো মেয়েদের বিয়ে হওয়াই মুশকিল।

সে তোমায় বোঝাতে পারছি না বাপু। ...সুধার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে।...বাড়ির লোকেরা সব মানুষ তো নয়, বলদ—বলদ! কী রে ভুতো, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছিস যে? বলে দিবি নাকি? উইদ্যাখ, বলদ চরছে দীঘির পাড়ে—তাই বলছি। বুঝলি?

পেঁচো বা ভুতোর মন অবশ্য নতুন খেলাগাড়িটার দিকে বেশি। সে এদিক ওদিক ঠেলছে গাড়িটা। মাঝে মাঝে বুভুক্ষু চোখে সুধার হাতের পাঁপরগুলোর দিকে তাকাচ্ছে এই পর্যন্ত।

...তা ওই রকম সব মানুষ। ...সুধা জের টানে কথার। ...তিন বউতে যা বলে, তিনটি মানুষ তাই শুনেই বেদম্ভ। বলদ নিয়ে আমার হয়েছে ঠেলা।

সনাতন বলে, তোমারটিও তাই তো?

সুধা সলজ্জ কটাক্ষ হানে। ...যাও! ইয়ারকি করো না। আমার সঙ্গে যেতে বলতাম—তাতে আবার চোখ পড়বার ভয় আছে। বরং...একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে বলে, এই এমনি ধরো তুমি নিজে থেকেই গেলে—কি না, গাঁয়ের মেয়ের বিয়ে হয়েছে ঝিঁঝিডাঙায়—ঠিকানা বলে দিচ্ছি। তুমি কিন্তু বাপু দরজায় ডেকে বলবে, ভদ্রপুর থেকে আসছি গো, এখানে চারভেয়েদের বাড়ি বিয়ে হয়েছে, ঘোষ মাশাইদের বাড়ি... কেমন?

সনাতন বলে, বা রে! এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হল—পাড়ার কেউ নিশ্চয় দেখবে সেটা।

এ অব্দি শুনে সুধা শশব্যস্ত ঘোমটা টানল। ফের জিভ কেটে বলল, দ্যাখো, কী জ্বালা। আমি যাচ্ছি বাপু, তুমি কিন্তু এস। এতক্ষণ হয়ত ঢাক বাজতে শুরু করেছে।

বলে সে হিড়হিড় করে ছেলেটির হাত টেনে হাঁটতে লেগেছে। সনাতন দাঁড়িয়ে থাকে। ভারি অদ্ভুত এই সুধা মেয়েটি! বিয়ে হয়েও এখনও মনের দিকে বিশেষ বদলায় নি। ...পরক্ষণে সে লাফিয়ে ওঠে। ওই যা! ঠিকানা বলবে বলছিল, বলে গেল না তো! এত বড় আঠারো পাড়া গ্রাম, কাঁহাতক খুঁজে হয়রান হবে রাতজাগা শরীরে!

সনাতন দ্রুত হেঁটে সুধাকে অনুসরণ করার আগেই ভিড়ে সুধা অদৃশ্য। বিরাট মেলার প্রাঙ্গণে তাকে খুঁজে বের করা এখন সময় সাপেক্ষ। ওদিকে ফের একপাল্লা গাইতে হবে বিপক্ষদলের শেষ হলে। কিছুদূর হেঁটে ফিরে এল সনাতন। থাক, আছে তো আরো দুটো দিন—দেখা যাবেখন।

লোকের ভিড় ঠেলে আসরে ঢোকে সে। নিজের জায়গায় বসতেই সুবর্ণর দিকে চোখ পড়ে তার। সুবর্ণ ছোট্ট আয়নার সামনে ঝুঁকে মুখে পাউডার বোলাচ্ছে। দিনের আসরে হাল্কা মেক-আপে ব্যস্ত সে। সফেদার ফোঁটা দিচ্ছে কপালে গালে চিবুকে। ঠোঁটে আলতা দিয়ে ঠোঁটদুটো নেড়ে নিচ্ছে। ভুরু বা চোখের আঁকনটা ঠিকই আছে। ...দেখে নিয়ে চোখ ফেরায় সে। তারপর চোখ টিপে একটু হাসে। কেমন অশ্লীল লাগে ভঙ্গিটা।

সনাতন কিছু বলে না। বিপক্ষের মনকির ওস্তাদ ছড়া ধরেছে আসরে। গমগমে গলার আওয়াজ। ছড়ার তালে তালে কবিয়ালের মত নাচছে। ধুয়োটা বেশ সুন্দর—

মন কি মিলে রে,

মনের মানুষ না হইলে, মনের কথা না কইলে।।

সুবর্ণ ঝুঁকে আসে। ফিসফিস করে বলে, মেয়েটা কে ওস্তাদ?

সনাতন বলে, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। এখানে বিয়ে হয়েছে!

সুবর্ণ বলে, বাবা। মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ বকতে পারে মানুষ! যত হাসি তত কথা!

সনাতন অন্যমনস্কভাবে বলে, সুধা ওইরকমই।

নাম বুঝি সুধা! ...সুবর্ণ ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হাসে। ...অমন সুধা ছোকরা হলে কী হত ওস্তাদ? শ্রোতারা কী করত? ওস্তাদরাই বা কী করত? উঃ, সে এক মজার কাণ্ড না বেধে যেত!

খারাপ লাগে সনাতনের। বিরক্তভাবে সে বলে, ঝুমুর শুনেছ কোনদিন? ঝুমুরে মেয়ে থাকে।...

সুবর্ণ বলে, নাঃ ওস্তাদের মেজাজ এখন ভাল নেই বাবা, ইয়ারকি করব না। 'তুমি' বললেই বুঝতে পারি চালে কাঁকর আছে।

সনাতনের মনে সুধার ছবিটি তখনও স্পষ্ট। সুবর্ণর কথাগুলো সে ছবিকে আরও স্পষ্ট করেছে। তাই তো! সুধা একসময় গান শিখত হাবল গোঁসাইজীর কাছে—সনাতন ছিল গোঁসাইজীর বিনি মাইনের ছাত্র। আর সুধার দাদা দু'পাঁচটাকা সেলামী দিত সুধার জন্যে। তার পিছনে কারণ অবশ্যি একটাই ছিল—আজকাল গানটান জানা পাত্রীর পক্ষে অন্যতম গুণ। কিন্তু সুধা সত্যিসত্যি ভাল গাইতে পারত। গোঁসাইজী বলতেন, ওর ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল। আর তুই সোনা (সনাতন)—তোর ওই মেঠোগাওনা ছাড়া বরাতে কিছু নেই। শোন রে শালা, কান করে সুধা ভজনখানা গাইছে শোন। তোকে গাইতে দিলে তো তুই মাঠময় করে ছাড়বি। ...সনাতন সেই দিনগুলো ভাবছে। গুরুজী সত্যি কথাই বলতেন। সনাতন আসরের গাইয়ে—সুধার মত ঘরের গাইয়ে নয়। সুধার গান ছিল যেন তার একান্ত নিজের জন্য, সনাতন শ্রোতার কথাই ভাবত। ...সেই সুধা, ঝিঝিডাঙার কোন পণ্ডিতের বউ! ...আচ্ছা, এমন যদি হত, সুধা—সুধা আর সনাতন...।

সনাতনের মনে পুরনো কথার ভিড়। ঝড় ঢুকে ঘরের ভিতরটা বিস্রস্ত করে ফেলেছে যেন। কলকাতা যাবার সময় সনাতন কল্পনা করেছিল, সিনেমায় চান্স হয়ে গেছে—সে নায়ক, আর নায়িকা—নাকি ভদ্রপুরের মেয়ে সুধামুখী—বাঃ, বেশ চমৎকার দৃশ্য হয় কিন্তু!

সেই সুধা। সময় সময় স্বপ্ন দেখতে সনাতন—ওইরকম দিবাস্বপ্ন। প্যান্ডেলে বসে হাজার মানুষের সামনে দ্বৈতসঙ্গীত গাইছে সে আর সুধা।

পরে একদিন সবই ছেলেমানুষী মনে হত সনাতনের। সেটা কি ভালবাসার টান? সে ছিল একটা নেহাৎ ভাবের টান! রোগা হতশ্রী একটা কিশোরী মেয়ের জন্যে

ওইরকম কথা ভাবা চলে বড়জোর—রক্তেমাংসে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগেনি কোনদিন। কোনদিন মনেও হয়নি, সুধাকে সে জড়িয়ে ধরবে বা চুমু খাবে—কিংবা আরো ঘনিষ্ঠতর কিছু। না, না। তা হয়নি কোনসময়। ...সনাতন মাথা নাড়ে।

তবে আজ এ সুধা সে সুধা নয়। দেহমনে বিস্তর ফারাক এখন। সুধার দেহটাই চোখে এল বেশি। সে মন নেই—দিন তার সেই মন, তার সে স্মৃতিকে নিয়ে পালিয়েছে পিছনে। দিন যত আসছে, সুধাকে মেরে যেন তার দেহটাই বুদ্বুদের মতো মোটা করে ফেলছে।

আর, কত পাতলা ঠোঁট ছিল সুধার। কত নীরস খসখসে গাল, কোটরগত চোখ! সনাতন দেখল। পুরু হয়েছে ঠোঁটদুটো, গাল ড্যাবডেবে হয়েছে, চোখদুটো ভারি—ঝকঝক করছে নক্ষত্রের মত। হলুদ রঙ মুছে কমলা হয়েছে—রক্তের ছটা পড়ে মুখ দোলালে।

হঠাৎ নিজের উপর অসম্ভব রাগ হতে থাকে সনাতনের। নিজেকে এত দীনহীন ছন্নছড়া লাগতে থাকে।...চণ্ডাল, চণ্ডাল! হরিশচন্দ্র চণ্ডাল! কিছু নেই—কেউ—নেই। যেদিকে তাকায়, শুধু ইতর অভাজন চাষাভূষা ছোটলোকের ভিড়। সামান্য তানেই বাহবা ওঠে। তার রুক্ষ মলিন শ্রীবিহীন চেহারাটা ডেলাইটের সামনে দেখে ওরা চিৎকার করে, রাজপুরুষ, রাজপুরুষ! সিনেমার ঢঙে কিছু গাইলেই ওরা বলে ওঠে, ছিনেমা ছিনেমা! ...ধুৎ ওস্তাদ ঝাঁকসা আবার ওই নিয়ে গর্ব করে! ওই নিয়ে তার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। ধেৎ, ধেৎ!

সনাতন তা নয়! তা হতে পারে না—হওয়া উচিত নয় কদাচ। আরো বড় কিছু যে আশা করেছিল। আরো বেশি মানুষ—শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী মানুষ তাঁরা—শহরে নগরে যাঁদের বিচরণ, যাঁরা না থাকলে ওস্তাদ ঝাঁকসার ওই 'বাংলা মা'র কোন মানেই সনাতন খুঁজে পায় না। আর, এত যে চিৎকার করে মরল এই ওস্তাদটা, কজন কী বুঝল, কী তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করল? যত্তোসব!

তেতো মুখে বসে সনাতন। ইচ্ছে করে, এখুনি পালিয়ে যায় এখান থেকে। সুধার সেই ভর্ৎসনা—'মিঙ্গেনাচানো' কথাটা যেন মৌমাছির দংশনের জ্বালা দিচ্ছে এতক্ষণ।

...ওস্তাদ! রাগ করেছেন?

চমকে দ্যাখে, সুবর্ণ তার হাতটা আলগোছে নাড়াচাড়া করছে। আসরে সামিয়ানার ছায়া —একটু আগে রোদ পড়ছিল। ছায়ার মধ্যে নিস্পন্দ শব্দহীন একটা সাগর—তাতে ভেসে আছে পদ্মফুলের মতো সুবর্ণর মুখটা। পুরুষ? অসম্ভব। ...মনের ভিতর মন আছে। সেই মনের গভীরতর ছায়ার কার চলাফেরা—কার ঘুম থেকে জেগে ওঠা টের পায়। সনাতন আর আস্তে আস্তে তার শরীরটা ভারি লাগে, ক্লান্ত লাগে, রাতজাগা শরীর প্রতিবারের মত কী একটা দাবি করছে। সে বুঝতে পারে দাবি মিটছে না বলে যেন এইরকম খারাপ লাগা, এই ক্লান্তি। ওস্তাদ ঝাঁকসার কথাগুলো মনে পড়ে সনাতনের। ... রাত জাগার পর মানুষের শরীরে কামভাব বৃদ্ধি পায় মাস্টারজী। হুঁশিয়ার। আলকেপের বিষয়ে যত কুশ্রী কথা, যতরকম অনাছিষ্টি কেচ্ছা শোনেন—তার সত্যিমিথ্যে যতটুকুই থাক—ওদের আমি দোষ দিতে গিয়ে কতবার ভাবি!

হাতটা ছাড়িয়ে নেয় সনাতন। বলে, তাহলে মনকির ওস্তাদ পাল্লায় (প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) টিকে গেল দেখছি! বাহাদুর!

সুবর্ণ সেকথায় কান করে না। চাপা গলায় বলে, সুধাদির জন্যে মন খারাপ করছে?

সুধাদি? কী বলে সুবর্ণটা। সনাতন না হেসে পারে না। কেন? তোর বুঝি রাগ হচ্ছে তাতে?

আমি মেয়ে নাকি যে রাগ হবে? সুবর্ণ ভ্রূভঙ্গি করে।

তবে যে বলেছিস।

মুখ দেখেই বুঝেছি। সুবর্ণ জবাব দেয়। মেয়ে নই—মেয়ের মত থাকি। পুরুষ মানুষের কত কী বুঝতে পারি। আমার সবাই মেয়ে বলে ধরে নেয় কি না!

সনাতন ধমকে ওঠে হঠাৎ। রাখ! আর ন্যাকামি ভাল্লাগে না রে!

আর সুবর্ণ আহত মনে সোজা হয়ে বসে। একটা নোটবই খুলে গান মুখস্থ করতে থাকে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কাছে লিখে নিয়েছে গানটা। খোট্টাই বুলির গান।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বিকেল।

শীতের আমেজ ছিল শেষ রাতে—তারপর লোকের ভিড়ে বেশ গরম গেছে। সকাল থেকে দুপুর অব্দি গরমটা বেড়েছিল। কিন্তু দীঘির জল অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। রাত জাগলে স্নানের সময় জল এরকম ঠাণ্ডা লাগে। তাই খাওয়ার পর কাছারিবাড়ির প্রাঙ্গণে রোদে জিরোচ্ছে গেনেরা।

মনকির ওস্তাদের আড্ডা গ্রামের ভিতর—মুসলমানপাড়ায়। সেখানে থেকে চলে এসেছে ছোকরা নিয়ে। ওস্তাদ ঝাঁকসার দলে আড্ডা দিতে এসেছে। নন্দর সঙ্গে জমে গেছে খুব। কারণ দুজনেই ছিলিমের ভক্ত। চোখ লাল করে মনকির গল্প জুড়েছে। সনাতনকে কী কারণে সে 'দোস্ত' বলে শুরু করেছে। সনাতনের খারাপ লাগছিল না। লোকটি বেশ সঙ্গী হবার মত। কত অভিজ্ঞতা, কত কথা জানে। পউসের মেলায় 'শান্তিনিকেতনে' গান করে এসেছে—সেই গল্প বারবার বলছে। রবীন্দ্রনাথের নামে নমস্কার করছে করজোড়ে। যাই বলুন দোস্ত, মহাকবি বেঁচি থাকলে এ গানের কদর বাড়ত। তিনি এখন গত হয়েছেন। যেসব বাবুমাশাইরা সেথা রয়েছেন, হেসি (হেসে) খুন...মনকিরের কথায় নলহাটি এলাকার টান স্পষ্ট। 'করে'কে বলে 'করি' 'ধরে'কে 'ধরি'। সনাতন একপলক ভাবল, সুধাও কি এই করে কথা বলে নাকি? লক্ষ্য করা হয়নি তো?

...তবে হ্যাঁ, দোস্ত, এই ওস্তাদ ধনঞ্জয়দা যদি সেথা যেতেন, ওনারা বুঝতেন জিনিসটে কী। আমরা—মুখে যাই বলি, ওনার কাছে তো শিশু! পাল্লায় দাঁড়িয়ে দুটো কড়া কথা না বললি শ্রোতার মন পাব না—তাই বলতি হয়, বললাম। কিন্তু হাঁ করে গিলেছি ওনার কথাগুলা। কাপ বাজেকথায় যে উড়ি যাবে, লেট হবে—তার সাধ্যি নাই বাবা! যেন হাত বাড়িঞি ধরি রেখেছেন 'নাট্যখানা'। 'পাশকপে'দের (সহঅভিনেতা) সামলে রাখছেন। নাঃ, শেখবার কত কী আছে। ...হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনের কথা

বলছিলাম। মহৎ জায়গা হে দোস্ত, পা দিলি জীবন সার্থক হয়। বুকে বল আসে। কলিযুগের মহামুনি বাল্মিকীর আশ্রম।

ওস্তাদ ঝাঁকসা ঝিমোচ্ছিল মোড়ায়। ঝিমোতে ঝিমোতে চোখ না খুলেই বলে, ও, হ্যাঁ।

...পরক্ষণে গুনগুনিয়ে ওঠে সে।

আমরা যত মাঠের কবি, কবি তুমি রাজসভার
ধন্য ধন্য বিশ্বকবি বিশ্বেরো মাঝার।।
(আমরা) ছোটলোকের ছোট কবি
বড়লোকের তুমি রবি
দশদিকে যদি করলে আলো
আমরা কেন অন্ধকার
হায় গো, আমরা কেন অন্ধকার।।

মনকির হোসেন ছুটে গিয়ে পয়ে প্রণাম করে। ...ধন্য, ধন্য ওস্তাদজী! তবে আমি হলাম ক্ষুদ্র মানুষ, ততদুর রচনাশক্তি নাই। গেয়িছিলাম বটে একখান পদ।...

(বড়) ভাবের জায়গা ভাবের ভবন শান্তিনিকেতন।।
কত মহারথী বিদ্যাপতি দিয়েছেন চরণ।।

ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ খোলেনি। সে বলে, ভাল, ভাল! তবে ওনারা কখনো আমাকে ডাকেন নি। ডাকলে যেতাম।

মনকির সোৎসাহে বলে, সবায় যায় সেথা। না ডাকলেও যায় মেলায়। সে এক জায়গা! ভাবের জায়গায় রসের নদী গো ওস্তাদজী। 'অবগাহনে' শান্তি আছে।

হুঁ! রাখেনজী শান্তি। ...হঠাৎ বিরক্ত ঝাঁকসা। ...মাস্টার, ওস্তাদ ঝাঁকসা বিনে আমন্ত্রণে স্বর্গের দেবরাজের সভায় যাবে না।

ফজল মনকিরের কানে কানে বলে, শান্তি কথাটা উনি সইতে পারে না। শান্তিচরণ ছিল ওনার ছোকরা—নাম শোনেন নি?

মনকির অপ্রস্তুত হেসে বলে, শুনেছি। সে তো নাকি চণ্ডিতলায় আছে। আজ সকালে আসরের বাইরে লোকে বলাবলি করছিল। চণ্ডিতলার ওদিকে মদনপুরে গোরুর হাট আছে। সেখানে গিয়েছিল গোরুর পাইকার—তারাই বেলছিল। হাটের ওদিকে দেখেছে শান্তিকে।

ফজল লাফিয়ে ওঠে, ওস্তাদজী ওস্তাদজী! শুনছেন, জী, শুনছেন?

ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ খুলেছে। কিন্তু বলে না কিছু। মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে।

সনাতন উঠে দাঁড়ায় এতক্ষণে। আড়মোড়া দিয়ে পা বাড়ায়। পাঁচিলঘেরা প্রাঙ্গণের ভাঙা গেটের কাছে যেতেই সুবর্ণ ডাকে, চলুন না, বেড়িয়ে আসি কোথাও।

সনাতন বলে, নদীর ধারে যাই। মন্দির আছে রুদ্রদেবের। শ্মশান জায়গা। অনেক সন্ন্যাসী থাকে।..

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। হাতে হাত দুজনের। রাস্তাটা চেনা সনাতনের।

দুলেবাগ্দীপাড়া ঘুরে ছোট্ট মাঠ। তারপর নদী। লোকে বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে। মেয়েরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকছে। সবাই যেন চেনে সুবর্ণকে। কী সুবন্ন কোথা চললে? ...সুবর্ণ মাথা দোলায় আর হাসে।

ছোটখাটো একটা ভিড়ে আটকে পড়ে ওরা...আপনি বুঝি সুবন্নর ওস্তাদ? সব শুনেছি। ওস্তাদ ঝাঁকসুর দলে হায়ার এসেছেন আপনারা? ঝাঁকসুর ছোকরাও ভাল ছিল—তবে সুবন্নর পায়ের কাছে লাগে না। দেখবেন, সামনেবার আপনার দলের বয়না হবেই।...

জবাবে হাসি ছাড়িয়ে ওরা কোনরকমে বেরিয়ে মাঠে পড়ে। একসময় পিছন ফিরে কী দেখে নিয়ে সুবর্ণ বলে. একটা মেয়ে—মাইরি পাগল হয়ে গেছে। সক্কালে আসরে দেখেছি, দুপুরে চান করতে গেলাম, তখনও দেখি ঘুর ঘুর করছে আর হাসছে। ওই দেখুন, দাঁড়িয়ে আছে। দেখছেন?

সনাতন দেখে নিয়ে বলে, তোর প্রেমে পড়েছে।

যান! বলে সুবর্ণ ক'পা এগিয়ে যায় ...গা জ্বলে যায় শুনলে। কাছে আসুক না, গলাটা টিপে দেব।

সনাতন ফাজলেমী করে।...কেন রে? ভিড়ে যা।

সুবর্ণ কি ভান করছে? মুখটা গম্ভীর। নিঃশব্দে সামনে গটগট করে হাঁটছে। সনাতন সঙ্গ নিয়ে বলে, কেন রে শালা? পুরুষ নোস?

গাল দিলেন! সুবর্ণ কেমন হাসে।

দিলাম। সনাতন বলে। ...আমি ওস্তাদ হয়েছি—গাল দেবার অধিকার হয়নি?

দেবেন। তবে 'শালা' কেন?

কী বলব? শালী বলব? তুই কি মাগী নাকি রে সুবর্ণ?

সুবর্ণ ফুঁসে ওঠে! যান, যান! অত যদি ইয়ে, তবে রাত্তিরে 'কিস' করলেন যে বড়? তখন বুঝি মনে ছিল না?

কী করলাম? সনাতন থমকে দাঁড়ায়।

কিস, কিস! সুবর্ণ অবশ্য হাসতে হাসতে বলে একথা।

আচমকা এক চড় মেরে বসেছে সনাতন। সুবর্ণ গালে হাত চেপে মুখটা নামায়। স্থির দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ওর হাতের ওপর দিয়ে দু'ফোঁটা চেখের জল গড়িয়ে পড়ে।

সনাতন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখে কোন কথা নেই। তারপরই ব্যাপারটা খারাপ লাগে তার! নিজের হঠাৎ চটে ওঠার প্রতি অবাক হয়। এ তো অকল্পনীয়: সুবর্ণ—সুবর্ণকে সে নিজের হাতে ঠাট্টার ছলে কতদিন সাবান মাখিয়ে দিয়েছে! চুল আঁচড়ে দিয়েছে—সেই সুবর্ণকে সে চড় মারা দূরের কথা, কোনদিন কটু কথা বলবে—ভাবতেও পারেনি!

মুহূর্তে হো হো করে হেসে ওঠে সে। বলে, কী রে! বড় সাধ করে ওস্তাদ বলে ডেকেছিলি যে! জানিস নে, ওস্তাদের হাতে মারও খেতে হয়! তোকে এত নাচ গান শিখিয়েছি। কোনদিন মারিনি তো—সেটা আজ উসুল করে নিলাম!

সুবর্ণ চোখ মুছে ভারি মুখে বলে, হাড়িমুদ্দোফরাসের ছেলে। মার খেতে খেতে তো এত বড় হলাম। মার খেতে কি দুঃখ লাগে ওস্তাদ? লাগে না!

বড় বড় তত্ত্ব কথা রাখ তো! আয়, একটা নতুন গান শেখাই। সনাতন ওর হাত ধরে টানে। পিঠে হাত বুলিয়ে ফের বলে, পৃথিবীতে আর কার ওপর রাগ ঝাড়ব বল? তোরা আছিস, সইবি জেনেই মারলাম একটা। না সইলে মারব না। অধিকার তো নাই কিছু।

সুবর্ণ বলে, অধিকার আছে বইকি। ওস্তাদ হয়েছেন, 'দলশিক্ষা' দিচ্ছেন নানান দলে—মারতে হবে, না মারলে—ছাত্রের জ্ঞান হয় না। তবে এ মার সে-মার তো নয়।

সনাতন বলে, নয়! খুব জানিস!

না। আপনি 'কিস' করেছেন—তার জন্যে আমি তো রাগ করিনি! সুবর্ণ বলতে থাকে। ...ওই কপাল তো ছোকরা হওয়া অব্দি জুটে গেছে। ওটুকু পাবার জন্যে দলের মধ্যে দলাদলি। ওদের বউরা আমায় দিনরাত্রির শাপমন্যি করছে—ওদের স্বামীগুলোকে আমি নষ্ট করেছি! কী ভাগ্যি আমার ওস্তাদ!

চমকে ওঠে সনাতন। ...তুই কাঁদছিস সুবর্ণ? এখনও কাঁদছিস!

...কাঁদব কেন? কে দেখবে আমার কান্না? কদিন পরে চুল কাটতে হবে, চুড়ি ভাঙতে হবে—গলা যাবে নষ্ট হয়ে, তখনই তো কাঁদবার দিন শুরু! আজ এটা সখের কান্না। বলে সুবর্ণ হাসবার চেষ্টা করে। একটু পরে আবার সে বলতে থাকে, ...ম্যানেজার বলে, ভাগ্যিস আমি ছোকরা হয়েছিলাম—তা নাহলে তো ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াতাম অ্যাদ্দিন। সেটা সত্যি। কে পুছত আমায় বলুন? এক দিন যখন ছোকরাগিরির নটেগাছটি মুড়োবে—তখন? না শিখলাম কোন কাজকর্ম, না শিখলাম গতরটা খাটাতে। রোদবাতাস শীতবর্ষার খোয়ার সইলাম না। পারব তখন ননীর মতো গতরটা খাটাতে? একদিন যারা আমার একটুখানি ছোঁওয়া পাবার জন্যে নোটের মালা গেঁথে গলায় পরাচ্ছে আসরে...সেদিন তারা তাকিয়েও দেখবে না। তখন আমার কী হবে—সেকথা ভেবেই কাঁদছি। আজ সুবর্ণর এই ঠোঁটে যে ওস্তাদ চুমো খেল, সেদিন...।

এত কথা জানে সুবর্ণটা। সনাতন ওর মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, থামরে সুবর্ণ, চুপ কর বাবা, হয়েছে। শোন, আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, এখনও পৈতেটা ফেলিনি, পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যদি ততদিন জীবনে বেঁচে থাকি—

সামনে নদী। নদীর পাড়ে ঝোপঝাড়। অশ্বত্থগাছ। তার ভিতর মন্দির! মন্দিরে সন্ধ্যাবেলার আরতি শুরু হবে। খুব জাগ্রত দেবতা এই রুদ্রেশ্বর। সনাতন জানে। নানা দেশ থেকে মানত নিয়ে লোক আসে। সারাটি দিন লোকজনের ভিড় জমে থাকে।

...আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি—বলার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে কে বলে উঠেছে, তাই তো! তখন থেকে লক্ষ্য করছি—চেনাচেনা লাগছে, কে লোকটা!

সনাতন পিছন ফিরে চমকাল। সুধা! হাতে ভোগের থালা—সঙ্গে সেই পেঁচো বা ভূতো।

সুধা বলে, কই গেলে না যে বড়? দুপুরবেলা পথপানে হাপিত্যেস করছি—মানুষের পাত্তা নাই। ওকে বলতেই পণ্ডিতি গলায় বললে, খেতে বলেছ তো?

বলো নি? ছিঃ গাঁয়ের মানুষ...তার বামুনভদ্র! ...অতশত খ্যাল ছিল না বাপু। সে কাল হবে'খন। পালাচ্ছ না তো দেশ ছেড়ে। তা, কাল কিন্তু দুপুরে খেয়ো। ...একটু ইতস্তত করে সুধা বলে, আর ও যদি যেতে চায়, সঙ্গে নিও। আমার দিব্যি সোনাদা। ...ফিকে করে হাসে সে। ...ওকে বলেটলে রাজি করিয়াছি। ও আসবে না—রাত জাগা সয় না নাকি—আমি আসব, আর বিমলি নাপতানী। বিমলির ছেলেটা ওর কাছে প্রাইভেট পড়ে—বিনি পয়সায়। বিমলির সঙ্গেই গানটান শুনতে যাই। তবে জায়েদের কথা বলবে, ওদের সব হাতেকোলে ছেলে, সংসারের হরেক ঝঞ্ঝাট। সারাদিন গায়ে গতরে খেটে আর পারে নাকি? যেমন পড়ে, অমনি ঘুমে কাঠ। ঘরে ঘরে আমার তখন ছোটাছুটির পালা—ও মেজকি, তোমার ছেলে কাঁদছে, ও সেজকি, তোমরা ঘোঁতন কাঁদছে—তারপর, ও ছোটকি, তোমার ইয়ে! দেওরগুলো সব বলেছিলাম না, বলদ, বলদ। বড়বউ হবার জ্বালা যে কী, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। ...তা কাল যেও কিন্তু! এই! তুমিও যেও। কেমন? গরিব মানুষের সংসার—যা হয়, দুটি খেয়ে আসবে! দেশেদেশে রাতজেগে বেড়াচ্ছে সব—বাড়ির অন্ন তো জোটে না।...

বলে সুধা যেমন আসছিল, হনহন করে চলে গেল। সনাতন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সুবর্ণকে বলে, শুনলি?

সুবর্ণ ঘাড় নাড়ে।

যাবি তো?

সুবর্ণ ফের ঘাড় নাড়ে।

লায়েকরা বলে গেছেন, রাত নটাতে আসর—একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। সাড়ে আটটার মধ্যে মেলার দেবতা ঁশ্যামচাঁদের ভোগ হয়ে যাবে। ভোগারতি দেখতে বড্ড ভিড় হয়। যেন সেই ভিড় ফিরে এসেই আসবে বাদ্য যন্ত্রপাতি দেখতে পায়। তা নাহলে গোলমাল লাগিয়ে দেবে।

রাতের খাওয়া আজ লুচি বোঁদে আর একটা তরকারী। আসরে যাবার আগেই খেয়ে নিতে হবে। দোকানে বন্দোবস্ত করা আছে। তারপর যদি ক্ষিদে পায়, মুড়ির বস্তা রইল। নতুন গুড় রইল। সারারাতে তিনবার চা 'ছাপ্লাই' হবে দোকান থেকে। সকালে ফের চা-মুড়ি। আসর সকাল আটটার মধ্যে ভাঙতে হবে। কাল আবার ঁশ্যামচাঁদের স্নান অনুষ্ঠান আছে।

সুবর্ণ সাজতে বসেছে। প্রথম আসর এ দলের। তা নাহলে লোক থামানো যাবে না। ওস্তাদ ঝাঁকসা নতুন কাপ ঠিক করতে ব্যস্ত। অনিস আর সুবর্ণকে বলে দিচ্ছে ঘটনাটা। সনাতনের ভূমিকা নগণ্য। মাস্টার মানুষ—বেশি খাটতে চায় না সে।

সাজঘরে শাড়ি পরে সুবর্ণ উঠে দাঁড়িয়েছে। সনাতনকে খুঁজছে। বেরিয়েছে হয়ত। সুবর্ণ দরজার ভিড় সরিয়ে বাইরে যাচ্ছে দেখে ম্যানেজার আমির আলি বলে, একা যাসনে। সঙ্গে লোক নে। এই নন্দবাবু, সঙ্গে যাও!

নন্দ কোণে ছিলিম টানছে কাবুলের সঙ্গে। ফজল বলে, হ্যাঁ—বলা যায় না জী, একবার সুফলকে শালারা তুলে নিয়ে মাঠে পালিয়েছিল।

সবায় হাসে একথায়।

তার আগে সুবর্ণ বেরিয়ে গেছে। চাপা গলায় ডাকে সে, সোনাদা!

বারান্দার কোণ থেকে সনাতন সাড়া দেয়, আয়। ...তারপর সুবর্ণ ওর কাছে গেলে সে বলে, আজ সুধা আসরে থাকবে, সুবর্ণ। আমার বড্ড লজ্জা করছে রে! ...আকাশপাতাল ভেবে পাচ্ছি না।

অনেককালের পুরনো একতলা দালান বাড়ি। ফাটল আছে, শ্যাওলা আর আমরুলের চারা আছে দেয়ালে—কার্নিশে বটের চারাও বাড়ছে। দেখে গা ছমছম করে। ছোট্ট উঠোনে কুয়ো, শিয়রে চাঁপাগাছ। কবে একদিন বাড়বাড়ন্ত ছিল সংসারের। এখন হয়ত কোন রকমের চলে যায়। উঠোনের কোণে মরাই আছে একটা। সেও হতশ্রী—মাটির পাতলা স্তর ফেটে বেরিয়ে পড়েছে খলপাবাতা।

একান্নের সংসার। চারদিকে পায়রাখোপের মতো ঘর আর টানা বারান্দা। টুটাফাটা শ্রীহীন নোংরা। বাচ্চাছেলের গুয়ে কুচ্ছিত জাঙিয়া, ভাঙাচোরা খেলনা, ছড়ানো মুড়ি, এইসব। আর থিক থিক করছে একদঙ্গল ছেলেপুলে। সুধা ফিসফিসিয়ে বলে গেছে, রাবণের গুষ্টি। বাড়ছে আর বাড়ছেই—থামবার লক্ষণ কই?

কোণের দিকে—রাস্তার ধারে যে ঘরটা, ওটা একসময় বৈঠকখানা ছিল সম্ভবত। নড়বড়ে পালিশ-ওঠা দুটো চেয়ার আর তেমনি একটা টেবিল আছে। তার ওপর একগুচ্ছের খাতাপত্র আর বই। তক্তাপোষ আছে। তক্তাপোষে মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে অতিথির সম্মানে। সুবর্ণ পা ঝুলিয়ে বসেছে। সনাতন পা তুলে আসনপিঁড়ি হচ্ছে কখনও—কখনও পা নামিয়ে দিচ্ছে। এইখানে সুধা থাকে! ভিতর দরজা দিয়ে ভিতরের সবকিছু দেখতে পাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে টুকরো কথাবার্তা কানে আসছে। কখনও ঝংকার টংকার, সামান্য কোলাহল। পুরুষ ও মেয়েরা কী নিয়ে কথা বলছে বা বচসা করছে। ফের সুধা এসে চাপা গলায় বলে গেছে, দিনরাত্তির চিল-শকুন উড়ছে বাড়িতে। কানের মাথা খেয়ে বসে আছি—নয়ত অ্যাদ্দিন মরে যেতাম সোনাদা!

...এই যে আপনারা, নমস্কার!

সনাতন মুখ তুলল। রোগা ঢ্যাঙা কুঁজো একটা লোক—গায়ে ফতুয়া, পরনে লুঙি, বাস্তুসাপটি যেন—নড়বড় করে ঘরে ঢুকছে। মাথায় কাঁচাপাকা অল্প চুল, একটা টিকিও আছে, গলায় তুলসী কাঠের মালা। হাতে থেলো হুঁকোটি থাকলেই ভদ্রপুরের নৃসিংহ পণ্ডিত হয়ে উঠত। সনাতনের মনে হয়।

সনাতন শশব্যস্তে সরে বসে। সুবর্ণও।

উঠে বসুন। আরাম করে বসুন ...লোকটা চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসে।...ভদ্রপুরের লোক এসেছে শুনে আমি কালই ভাবছিলাম, যাব নাকি। হয়ে ওঠে না মশাই—নানা কাজ। পঞ্চায়েত ব্লক—নানারকম হ্যাঙ্গামা সব। থাক গে, অনেকদিন ভদ্রপুরের কেউ আসেনি। কী ব্যাপার, বুঝতে পারছি না। রাগটাগ করলে নাকি...

সনাতন কেঠো হাসে। এত নীরস কেজো লোকের সঙ্গে কী নিয়ে বাক্যালাপ করবে বুঝতে পারে না। আর, সনাতন কিছুটা স্তম্ভিত। অমন পাখির মতন টুকটুকে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে এই আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে? তার ওপর, কী মুশকিল, নামটাও জানে না—এমন বিড়ম্বনায় পড়া গেল।

...আপনি তো গানের দলের লোক শুনলাম! ওটি বুঝি নাচিয়ে? বাঃ, বেশ! লোকটা খিকখিক করে হসে। ...আজকাল এদিকে আলকাপের রবরবা খুব। আমি শুনিনি মশাই, লোকে বলে। শুনি যাত্রাথিয়েটারেও অত লোক হয় না নাকি। তোমার নামটি কি খোকা?

খোকা শুনে সুবর্ণ মুখ ফিরিয়ে হাসে। সনাতন বলে, ওর নাম সুবর্ণ! ...আর আমার নাম তো শুনেছেন—

সোনাবাবু? ও সোনাদা-সোনাদা বলছিল তাই না?

সনাতন হাসি চেপে বলে, হ্যাঁ—ওরা তাই বলে! আসল নাম সনাতন—সনাতনকুমার রায়।

সনাতনকুমার রায়। বিড়বিড় করে বলে সুধার বর—যেন মুখস্থ করে নেয়। তারপর বলে, গান বাজনা খুব ভাল জিনিস। শুনলে চিত্তশুদ্ধি হয়। আজকাল আবার পাঠশালাতেও গান শেখাচ্ছে সব। বোর্ড থেকে সারকুলার এসেছে—কী কাণ্ড দেখুন! উপযুক্ত মাস্টার খুঁজছি—

সনাতন ফস করে বলে ফেলে, কেন? আপনার ঘরেই তো যোগ্য মাস্টার রয়েছে!

লোকটা সোজা হয়ে বসে। অবাক চোখে বলে, আমার ঘরে! কে?

কেন? সুধা! আরে বাবা, ও গোঁসাইজীর সেরা ছাত্রী ছিল—ভজনে মাতিয়ে দিত একেবারে! ...সনাতন ঝোঁকের বশে বলতে থাকে। জেলা কমপিটিশানে নাম দিয়েছিল—হঠাৎ গোঁসাইজী গেলেন মারা। আর সব কী হল যেন—সুধা যায়নি!

লোকটি হা হা করে বিকট হাসে। ...কী সর্বনাশ! ওরা কিছু বলেনি তো! আমার ঘরেই গেনের বাসা। ওগো, কোথায় গেলে গো! সে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে।

সুধা উঁকি মারে ... কী হল?

তুমি গাইতে জান? এরা সব কত কী বলছে তোমার নামে। এ, কী আশ্চর্য!

ফেট! বলে ভ্রূ-কুঁচকে চলে যায় সুধা। যাবার সময় সনাতনের দিকে কটাক্ষ হেনে যায়!

সুধার বর হাসতে হাসতে গম্ভীর হয়ে ওঠে হঠাৎ। কী যেন ভাবতে থাকে।

সনাতন বলে, দেখবেন , খুব ভাল শেখাবে। মাইনে পাবে নিশ্চয়। এ বাজারে—

সুধার বর নাক মুখ বাঁকিয়ে বলে, মাথা খারাপ মশাই। হেড পণ্ডিতের বউ গানের মাস্টার হবে। কী যে বলেন—তার ঠিক নাই। পল্লীগ্রামের সমাজে মুখ দেখাতে পারব তাহলে? তাছাড়া মশাই, মুখে যাই বলি—ও নেশা লক্ষ্মীছাড়া। গেনে-গুণে-কেত্তুনে, এই তিনে উচ্ছন্নে—কাকপুরুষের বচনে আছে। যে গান করে যে মন্ত্রতন্ত্র গুণ করে, আর যে কীর্তন করে—

পরক্ষণে যেন নিজের বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষার কথা স্মরণ হতেই অনুচ্চস্বরে দুবার

'গউর, গউর' বলে একটু থামে। শুধরে নিয়ে বলে, অবশ্যি নাম সংকীর্তন পবিত্র জিনিস সে আমি নিজেও করি টরি।

পরিবেশটা কটু লাগে সনাতনের। সে সিগ্রেট প্যাকেট বের করে এগিয়ে দেয়, আসুন দাদা—

করজোড়ে নমস্কার করে সুধার বর। ...চলে না।

বাইরের পথে কে ডাকছে—সাধুপদবাবু, ও সাধুবাবু! ও পণ্ডিত, আছো হে?

তাহলে ইনিই সাধুপদ? সনাতন দ্যাখে, লোকটা হুড়মুড় করে উঠেছে। সুবর্ণর পায়ের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে দরজার কাছ গিয়ে দাঁড়ায় সে। চৌকাটে দুই লম্বা হাত রেখে মুণ্ডুটা বাইরে বের করে দাঁড়িয়েছে। পাছার প্রায় কাছাকাছি—একটা কারে মাদুলী ঝুলছে। ...তারিণী যে! কী খবর?

পথ থেকে তারিণী নামে কেউ বলে, প্রধান মশাই যেতে বললেন। ব্লক থেকে কে এসেছে।

এসেছে। সাধুপদ লাফ দিয়ে সরে এল। ভিতরে দৌড়ল। তারপর সে নিখোঁজ। হয়ত উঠোনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে যথাস্থানে।

কতক্ষণ পরে সুধার সেই পেঁচো বা ভুতো ডাকতে আসে। ...ভেতরে আসুন। জেঠিমা ডাকছে।

দুজনে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে ওঠে। দুটি মুখেই হাসি নেই।

বারান্দার এককোণে থামের পাশে দুটো আসন। সুধার হাতের কাজ হয়ত—চটের আসনে নকসার কাজ করতে করতে হাঁটু দুমড়ে গান শিখতে যেত গোঁসাইজির সামনে। গোঁসাই বলতেন, ছিঁড়ে ফেলব বলছি। রাখ এখন। ...সুধা আসন ছুঁচ-সুতো গুটিয়ে হাসিমুখে বলত, নিন। হল তো?

সেই আসনে বসামাত্র খুশি হয়ে ওঠে সনাতন। সুবর্ণ একটু ইতস্তত করছিল! নিচুজাতের ছেলে—এরা তো সে খবর জানে না! সনাতন চোখ টিপে ইশারা করে, বসে পড়। সুবর্ণ আড়ষ্টভাবে বসে।

ঝকমকে কাঁসার গ্লাসে জল টলটল করছে সামনে। সুধার মনের মত ভরা। সনাতনের ভাল লাগে। প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় ভাত, ভাজাভুজি বিস্তর, নুন, লেবু। বাটিতে ডাল। সুধা বলে, ধীরেসুস্থে খাবে কিন্তু! উনুনে চাপানো আছে এখনও।

সুধার নাকের ডগায় ঘাম, চিবুকে ঘাম, কপালে ঘামে ভেজা চুলের পোঁচ। ময়লা তাঁতের শাড়ি—আঁচলটা কোমরে জড়ানো। সকালে স্নান করেছিল—পিঠে এল চুলের ঝালর। জ্বলজ্বলে সিঁদুর সিঁথিতে, কপালে টিপ। গলার কাছে দলাপাকানো পাওডারের দাগ। হেঁট হয়ে বাটি রাখে সামনে। বলে, ছানার ডালনা। সব খেও কিন্তু। ফের দৌড়ে ওদিকে কোথায় রান্নাঘরের দিকে যায়। ধুপধুপ শব্দ তুলে ফেরে। ফের বাটি থালার ওপর। ...সুকতো আছে। আলুকফির ছ্যাঁচড়া। আস্তে আস্তে খাও। মাছের ঝোল এখনও উনুনে রয়েছে। উঃ, কত বেলা হয়ে গেল দ্যাখো তো! ফের চলে যায় কিছু আনতে। সনাতন আর সুবর্ণ পাতের দিকে ঝুঁকে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে। খুব আস্তে মুখে

তোলে গ্রাস। সামনে এদিকে ওদিকে এক দঙ্গল ছেলেপুলে—কেউ ন্যাংটো, ছিকনিপড়া নাক, ঘেয়ো চোখ—প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে এদের খাওয়া দেখছে। আড়চোখে সনাতন দ্যাখে, ঘরের দরজার কাছে কয়েক জোড়া চোখ—শাড়ির পাড়, হাতের বালা। কোমরে রুপোর বিছেপরা ডাগর ন্যাংটো মেয়েটি—এখনও হাঁটতে শেখেনি, পাছা ঘেঁষড়ে বার বার পাতের দিকে আঙুল তুলে হানা দিচ্ছে—গী গী গী! তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রকপরা মেয়েটি। পিছনে বুঝি তার মায়ের ধমক, আঃ, ওকে নিয়ে বাইরে যা না ক্ষেন্তি। ভিতর থেকে পুরুষকণ্ঠে কে বলে, হেগেটেগে দেবে—সরিয়ে আন। ফের সুধা এসে বাটি রাখে—গরম বাটি! আঁচল দিয়ে সাবধানে মুড়ে নামায়। ফিসফিস করে বলে, যত জ্বালা তো আমার! তোমাদের কেউ আসুক এবার—শুয়ে গতর দোলাব'খন।

খেতে কেমন বাধো-বাধো লাগে সনাতনের। সামনে সুধা হাসিমুখে বসেছে এতক্ষণে। মেঝেতেই বসেছে। ...

...একটুও চেনা যাচ্ছিল না, যা সাজের ঘটা। বিমলি তো তর্ক জুড়ে দিল। মল্লারপুরের ঢপের মেয়ে। আমি বলি, বা রে, আমি দিনের বেলা দেখেছি। ...তা অপূর্ব নাচে কিন্তু। বাঁশির সুরে কী সুন্দর না-নাচল!

কথাটা সুবর্ণকে লক্ষ্য করে। সুবর্ণর খাওয়ার ভঙ্গিতেও মেয়েলিপনা আছে। সুবর্ণ মুখ তুলে সলজ্জ হাসে। ফের মুখ নামায়। সনাতন বলে, এখন চেনা যাচ্ছে?

মাথা দোলায় সুধা। ... না বলে দিলে সাধ্যি নাই। ফ্রক বা শাড়ি পরালেই পারতে! পরাও না কেন? বেশ জুটিয়েছ সব!

সনাতন বলে, তা কতক্ষণ ছিলে আসরে?

হাই তুলে সুধা জবাব দেয়, যতক্ষণ তোমাদের নাচনকোঁদন হল। আচ্ছা নাচতেও শিখছ! লজ্জা করে না?

প্রশ্ন সরল। সনাতন ঘাড় নাড়ে। বলে, এক সময় যাত্রাদলের সখী সাজতাম, জান না?

সুধা ঢলে পড়ে হাসির চোটে। মেঝেয় একটা হাত রেখে ভর সামলায়। বলে, ওমা! তাই নাকি। তখন আমার জন্মই হয়নি হয়ত!

সনাতন বলে, হয়েছিল—মনে নাই। তা সুধা, এদের কেউ তোমার সত্য পরিচয়টা জানে না দেখছি! তোমার কর্তা তো ...

জিভ কেটে চোখ টেপে সুধা। ...ডালটা কেমন হয়েছে? রান্নাটান্না তেমন জানিনে তো—কোনদিন কুটো ভেঙে দুটো করিনি। বউদের সঙ্গে ওই নিয়েই তো প্রথম লেগেছিল। ...তোমার নামটা কী যেন ভাই, ভুলে যাচ্ছি—

সুবর্ণ বলে, নাম জামাইবাবু নতুন রেখেছেন—খোকা! এবং তা শুনে তিনজনেই হাসে। তারপর সনাতন বলে দেয়, ওর নাম সুবর্ণ!

নামটা তো বেশ! সুধা বলে। লজ্জা করো না ভাই। খাও। কোনটা চাই বল—এনে দিচ্ছি। ওকি! সোনাদা। আর ভাত নেবে না? কী খেলে? না খেয়ে চেহারাটা কী করেছে দ্যাখো তো!

সনাতন জল খেয়ে ঢেকুর তোলে। বলে, আঃ! কতযুগ পরে মেয়েদের হাতের রান্না খেলাম। পেট তো ভরেছেই, মনটাও কম ভরল না। নাকি রে সুবর্ণ?

যাঃ, বলে সুধা উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলে, এখানে জলের বালতি। আঁচাবে।

এক সময় ফের বাইরের ঘরে ওরা বসেছে। পেঁচো বা ভূতো পান দিয়ে গেল। তারপর সুধা আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে এল। চেয়ারে ধুপ করে বসে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, আঃ!

তুমি খাবে কখন? জামাইদা ফেরেন নি বুঝি? সনাতন বলে।

সে কথায় কান না করে সুধা হঠাৎ বলে, কাল তোমাদের আসরে বসে থাকতে থাকতে আমার কী সব হয়ে যাচ্ছিল যেন সোনাদা! তুমি গান গাইছিলে ওর সঙ্গে —ঠিক সেই ভজনটার মত সুর—গুরুজীর প্রিয় গানটা গো—ধুর ছাই—পেটে আসছে মুখে আসছে না। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে সে বিষণ্ণ হাসে।

সনাতন বলে, কোন গানটা?

সুধা বলে, কাল রাত্তিরটা আমার যা গেছে না! সে এক অনাচ্ছিষ্টি। যতক্ষণ ছিলাম আসরে, ...উঃ কেন যে মানুষ ওসব ছাইপাঁশ শিখতে যায়! বাকি রাতটুকু আর ঘুমই এল না চোখে। শুধু এপাশ ওপাশ করেছি। কান থেকে তোমাদের সুর যাচ্ছে না, চোখ বুজলে সেই নাচকোঁদন—এখনও কানের ভিতর বাজছে। আর ওই কত্তাল-টত্তাল বাজানোটা তুলে দিতে পার না তোমার? বাব্বা! কানের পোকা মেরে দেয় একেবারে।

সনাতন নিজের করতল খুঁটে বলে, আমাদের সয়ে গেছে। কত্তাল তুলে দেব কী, বরং আরও জোর বাজালে মনে হয় তৃপ্তি পাব। আসলে এক-একটা ঝোঁক আসে, আর মনে হয় পাগলের মতো যা খুশি করে ফেলি।

সুবর্ণ মন্তব্য করে, গানবাজনার নিয়মই এই।

সুধা কী ভেবে নিয়ে বলে, ঠিক। গাইতে গাইতে অমন হয়। ভগবান মানুষকে এই জিনিসটা না দিলেও পারত। ...জীবজন্তুরা গায় না—বেশ তো বেঁচে আছে!

শেষ বাক্যটা স্পষ্ট আর তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সে উচ্চারণ করল, সনাতন আর সুবর্ণ দুজনেই তাকাল ওর দিকে।

সুধা বলে, আর করাত্তির গাইবে?

সনাতন জবাব দেয়, আজই শেষ। অবশ্যি ফের বায়না করল কি না জানিনে। তারপর?

তারপর আর কী? চলে যাব। সুবর্ণদের গ্রামে সাঁওতাপাড়া।

সুধা অস্ফুট স্বগতোক্তির মত ফের শুধোয়, তারপর?

সনাতন আসে। ...এর কোন 'তারপর' নাই সুধা। এইরকম এদেশ ওদেশ,—রাতের পর রাত।

সুধা মুখ তুলে বলে, তোমার ভাল লাগে?

না লাগলে বেড়াচ্ছি কেন?

সুবর্ণকে লক্ষ্য করে ফের প্রশ্ন করে সুধা, তোমার?

সুবর্ণ মাথা নামিয়ে বলে, ভাল বইকি দিদি। গানবাজনা তো নিজের জন্যে নয়—পরকে শোনাবার জন্যে।

সুধা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক বলে, ঠিক বলেছ ভাই।

সনাতন ভাবছে। সুধার এই মূর্তিটার কথা ভাবছে। কাল হঠাৎ সে সুধার সঙ্গে দু-দুবার দেখা, একটু আগে যে-সুধা সামনে ভাত তরকারি পরিবেশন করছিল, সে এ-সুধা নয়। এর চেহারা ভিন্ন, কণ্ঠস্বর ভিন্ন, এর হাসিটি অন্যরকম।

...বেশি আশা করা ভাল না। দাদা সব সময় বলত কথাটা। আমিও মেনে নিয়েছিলাম, বেশি আশা মানুষকে করতে নেই—ঠকতে হয়। আশা আমি করিনি—কিন্তু ... সুধা হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলায়। ...হ্যাঁ সোনাদা, যাবে না একবার ভদ্রপুরের দিকে?

দেখি, বলে সনাতন উঠে দাঁড়ায়। ...এবার আসি তাহলে। খুব জ্বালিয়ে গেলাম।

সুধা বসে থাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সনাতন। পাণ্ডুর নীরক্ত খড়িখড়ি শ্লেটে আঁকা মুখের মত মুখ সুধার। ফের সনাতন বলে, যদি কাল চলে যাই, যাবার আগে দেখা করে যাব। দাদাকে চিঠিফিটি দিতে হলে লিখে রেখ। পৌঁছে দেব যেভাবে হোক। আর ...

কী? ...সুধার স্বরটা খড়ের শব্দের মত।

আজ যদি সুযোগ পাও, যেও গান শুনতে। কাল তো তোমার ভয়ে গলা চেপে গেয়েছি। নচ্ছারামি করিনি। আসরে দাঁড়িয়ে কী মনে পড়েছিল জান? সেই যে সবসময় তুমি আমার খুঁত ধরতে—ভেংচি কাটতে ...উঃ, যা সব দিন না গেছে! তবে এ তো আলকাটাকাপের গান—যা খুশি গাইলেই হল। রাগরাগিণী তালের ব্যাকরণ নাই—ধরবার লোক নাই। আমি এখন এ মহলে সুরের রাজা সেজে বসে আছি। ...

পরক্ষণে সনাতনের কথাটা মনে পড়ে যায়—সে বলে ওঠে, ধুর ছাই, সুরের রাজা কী বলছি! গুরুজি তোমায় ঠাট্টা করে বলতেন, কী রে সুরের রাণী, হাঁ করবি না জপবি বসে বসে? বলত না সুধা?

সুধা কাঠপুতুলের মত বসে আছে। একটু হাসি ঠোঁটের কোণে—সূর্য ডোবার পর যেমন কালো মেঘের ফাঁকে ঝিলিক—রক্তের মত লাল দিগন্তটা!

সুধা, যাই। কর্তার সঙ্গে তো দেখা হল না। ওঁকেও বল। চলি কেমন?

সনাতনের পা উঠছিল না। এইরকম বসে থাকবে মেয়েটা? পাখির মতো চঞ্চল, ধড়ফড়ে, এককণ্ঠে শতকথা বলা মেয়েটা এমন নীরব হয়ে পড়বে! ওর দুঃখের ঘরের দরজা সনাতন এসে খুলে দিয়ে গেল। নিজেকে অপরাধী লাগে। বুক কেমন করে ওঠে। মন বলে, ওকে সান্ত্বনা দিতে আরো দুদণ্ড বস—সেটা আর শোভন নয়।

সনাতনের হাত ধরে সুবর্ণ টেনেছে। কেন, টেনেছে, সেও জানে না। না জানে সনাতন। তবু মনে হয়, টানটা সঙ্গতই। উঁচু বারান্দা থেকে নেমে নিচের পথে যায় ওরা। পা তুলতে গিয়ে মুখ ফেরায়। সুধা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির, নির্বাক, পাণ্ডুর।

শ্বশুরবাড়িতে বাপের বাড়ির লোক দেখলে কি এইরকম হয়ে ওঠে গাঁয়ের

মেয়েরা? সনাতন জানে না। শুধু সুবর্ণ বলে, আহা, মেয়েদের সত্যি বড় কষ্ট। বাপের বাড়ি ছেড়ে ভিনদেশে ঘর করা—তার ওপর এমন একটা বুড়ো বর।

সনাতন মন মনে সায় দেয়। অকারণে কার ওপর রেগে ছটফট করে সে। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বলতে ইচ্ছে করে কাকে—আয়, সামনে আয় দেখি। পাগল! কীসব তোলপাড়া ঘটছে অকারণ। মনে হচ্ছে, কবে অলক্ষিতে—না জেনে, খুব দামি কিছু হারিয়ে গিয়েছিল, ফেলে দিয়েছিল আরও পাঁচটা বাতিল জিনিসের সঙ্গে—আজ সেটার খোঁজ পড়ে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে। তন্নতন্ন খোঁজা হচ্ছে অন্ধিসন্ধি আনাচে কানাচে। ...

আরও কয়েক পা হেঁটে গুনগুন করে ওঠে সে, কী দিয়ে মন বুঝাব, এখন আমি কার কাছে যাব।

স্কুল-প্রাঙ্গণের কাছে হরগৌরী ফুল ফুটেছে থোকাথোকা। সুবর্ণ ফুল পাড়তে চায়। সনাতন গাইতে থাকে—আমার হৃদয় মন্দিরে, বাঁশি বাজত দিনে রাতেরে, এখন আমি কী নাম ধরে বাঁশিটি আর বাজাব।

সেদিন সন্ধ্যায় দীঘির পাড়ে একা গিয়ে চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকে সনাতন।

সেজেগুজে আসরে যাবার মুখে সুবর্ণ একবার প্রণাম করে যায় সনাতনকে। ওটা তার নিজের নিয়ম। আসরে ওঠবার আগে প্রণামের পালা তো আছেই।

যন্ত্রপাতি সব চলে গেছে। দলের সবাই গেছে। সনাতন প্রাঙ্গণের গেটের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় পিছন থেকে কে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। চকিতে বুঝতে পেরে সে বলে, আসরে গেলি নে যে?

নিয়মটুকু বাকি আছে। বলে সুবর্ণ সামনে আসে। পায়ে ঝুঁকে প্রণাম করে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। মুখোমুখি—খুবই কাছে যে দাঁড়িয়ে থাকে। পেন্টের গন্ধে নেশা শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটাও টের পায় সনাতন। কেন অমন করে দাঁড়াল সুবর্ণ? সুবর্ণ তার দু কাঁধে হাত রাখে। গলা বেড় দিয়ে ফিসফিস করে বলে, আপনার মন খারাপ কেন গো আজ? কী হয়েছে?

আর আবিষ্ট সনাতন চুপ করে থাকে না। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেয়ে বসে। রক্তে ঝড় বইতে থাকে তার। কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর যেন সম্বিত ফিরে পায়।

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সুবর্ণ। অস্ফুট হাসে। এঁটোমুখে আসরে পাঠাবেন আজ? পাঠান। আপনি তো ওস্তাদ—আমার আর দোষ কী। কিন্তু ঠোঁট মুছুন—লাল হয়ে গেছে না?

পকেট থেকে রুমাল বের করে হো হো হাসে সনাতন। দেশলাই জ্বালে। ঠোঁট মুছে রুমালটা পরখ করে। ঠিকই। রঙের ছোপ লেগেছিল।

হাত ধরাধরি দু'জনে জনবিরল অংশটুকু পার হয়। তারপর হাত ছেড়ে দেয়। সনাতন বলে, আজ তোকে এত ভাল লাগছে কেন রে সুবর্ণ? তোর চেহারা হঠাৎ খুলে গেছে যেন। সত্যি, আসরে আজ পাগল করে ফেলবি!

সুবর্ণ মোহিনী নটী এখন। বয়সের সীমানা পেরিয়ে কল্পান্তকালের নাগরীনটীদের সবটুকু অভিজ্ঞতা—সব আলো-অন্ধকার ওর মধ্যে চলে এসেছে এখন। আসরের সুবর্ণ কিশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছানো সেই কিছুটা বেল্লিক, কিছুটা বিষণ্ণ, কিছুটা অস্থির কিছু অমনোযোগী পুরুষটি নয়। এ এক ভিন্ন সত্তা।

সনাতন বলে, হ্যাঁ—আমাকেই! আমিও আজ পাগল হতে চাই রে। আজ আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না!

এইসময় কানের কাছে মুখ এনে সুবর্ণ বলে ওঠে, সুধাদির জন্যে তো?

অ্যাঁ? বলে সনাতন থমকে দাঁড়ায়।

সুধাদি, সুধাদি!

জোরে বল শালা?

সু—ধা! বলে সুবর্ণ দৌড়ে ভিড়ে গিয়ে ঢোকে।

সনাতন দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। কতক্ষণ পরে কাবুল এসে ডাকে তাকে, ব্যাপার কী? আসর ধরতে পারছে না—আসুন শিগগির!

সনাতন বলে, মাথা ধরেছে বড্ড। ওস্তাদজি তো আছেন। চালাতে বল আমি পরে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে পৌঁছব।

বাঁশির নাচ?

আজ বাদ গেলেই বা! দু'রাত দেখল লোকে। একঘেয়ে লাগবে।

কাবুল চলে যায়। সনাতন তখনও চুপ। মাথা ধরা বলতেই সত্যি সত্যি যেন মাথা ধরে উঠেছে। আর—আর বড় অশুচি লাগছে নিজেকে। বড় দীনহীন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কী গুরুতর পাপ করে ফেলেছে—এ পাপের ক্ষমা নেই। সারা শরীর ক্রমশ ভারি হয়ে আসছে কীজন্যে?

ওরা আসরে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

জয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয়
জয় জয় বাবা শ্যামচাঁদ কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ তানসেন কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ ঝাঁকসা কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ পাতু কী জয়
জয় জয় সোনাওস্তাদ কী জয়।

... সোনা ওস্তাদ! সুবর্ণর কীর্তি! সে যা বলবে, ঝোঁকের মুখে সবাই তা উচ্চারণ করবে। কিন্তু এই ভাল। সনাতন নয়, সোনা ওস্তাদ। সনাতন মরে গেছে কবে। ... এতদিন পরে সঙ্গীতগুরু হাবল গোঁসাইয়ের উদ্দেশে প্রণাম করতে সাধ যায়। পারে না—দেহ যেন অশুচি। রক্তে পাপের নৌকো বেয়ে যাবার শেষ ঢেউটি মিলিয়ে যায়নি। বড় দুঃখে সনাতন ভাবে, সুবর্ণ তাকে নরকের দরজায় পৌঁছে দিতে চলেছে ক্রমশ। আর—এখন এই বিপদের মুহূর্তে বড় দরকার কারও একজনের—যে তাকে...

কে? অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে সনাতন। ... কে ওখানে?

অল্প আলো পড়েছে পাঁচিলের ওপর—দুটো দোকানের ফাঁক দিয়ে আসা মেলার

আলো। সেখানে—মাত্র হাতদশেক তফাতে কে সামনাসামনি এগিয়ে আসছে। মুখটা অন্ধকার—পিছনে সেই আলোর ফালি। সনাতন দু'পা এগিয়ে ফের বলে, কে?

কুচমুচে পাঁপরের শব্দ। তার মধ্যে কথার বুনোন। ...কখন থেকে ভাবছি, লোকটা কে? আসরে যেতে তো দেখলাম না! সন্ধ্যাবেলাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম—কত্তাবাবু সেই দুপুরে বেরিয়ে ফিরল তোমরা যাবার পরে। রামপুরহাট ছুটল তক্ষুণি। কাজ লেগেছে কিসের। আমার তো ছুটি এখন! দেওর-ফেওরদের কে গ্রাহ্যি করে। কই রে পেঁচো—কোথায় গেলি? ওই যাঃ, ছোঁড়াটা হারাল কোথায়? ওম্মা, কী করি এখন। ওগো, দ্যাখো, দ্যাখো একটু। আমার মাথাটা রাক্ষুসীরা চিবিয়ে খাবে যে!

সনাতন কয়েকপা এগিয়ে এদিক ওদিক দেখে ফিরে আসে। বলে, থাক। আছে কোথাও। অতবড় ছেলে—হারাবে কোথায়?

সুধা বলে, ওই দ্যাখো—সবায় এদিকে তাকাচ্ছে। অন্য কোথাও চল বাপু। চেনা লোক দেখলেই টিটি পড়ে যাবে দেশে।

পাঁচিলের পাশে পাশে অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে হেঁটে যায় সুধা। যেতে যেতে ফের বলে, দোষ কিসের সে বিচার তো কেউ করবে না। সোনাদার সঙ্গে এমনি কত রাতে বাড়ি ফিরেছে গুরুজীর আখড়া থেকে।

সনাতন বলে, তখন তুমি কচি মেয়ে ছিলে।

সুধা একমুহূর্তে দঁড়িয়ে মন্তব্য করে, মেয়েদের বয়স বাড়ে নাকি? কই—দাঁড়াব কোথায়? চারদিকেই তো লোক আনাগোনা করছে।

সে ঘোমটা টেনে দেয় আরও। সনাতন হাসতে হাসতে বলে, লোক যেখানে নাই, সেখানে গিয়ে কেলেঙ্কারিতে পড়ব না তো?

কিসের কেলেঙ্কারি? ও ফিরবে কাল দুপুরে। তখন যদি সাতপাঁচ কথা ওঠে—সুধা অবহেলায় বলে যায়, তাহলে বিষ নাই? দড়ি নাই? আগুনেরও অভাব আছে নাকি! মিথ্যে কেলেঙ্কারি সইবার মেয়ে সুধা নয়। ...

সনাতন বাঁদিকের শস্যশূন্য মাঠে নেমে পড়ে। বলে, মিথ্যে?

সুধা থমকে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফিক করে হাসে। ... যাও! এমন করে বলছ যেন তুমি সোনাদা নও, অন্য কেউ।

কয়েকটা জমির পর বাঁজা ডাঙা। অন্ধকারে একলা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। শুকনো ঘাস। ঘাসের মধ্যে কাঁকর খোলামকুচি। একটা কোঙাঝোপের সামান্য তফাতে সনাতন বসে। বলে, এখানেই খানিক বসা যাক।

সুধা একটু তফাতে বসে। বসার পর পায়ের দিকে কাপড়টা ঠিক করে নেয়। নক্ষত্রের আলো কিংবা কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর দৃষ্টি স্পষ্ট হয়। এত স্পষ্ট যে কাঁকরগুলোও ঠাহর করা সহজ।

সুধা বলে, তোমরা—মানে তুমি এসে আমার ঘরকন্নাটা ভণ্ডুল করে ফেলেছ সোনাদা! বুঝলে?

আমি? কেন বল তো? সনাতন সিগ্রেট বের করতে গিয়ে করে না। আলো জ্বালানো ঠিক নয় এখন। তার বুক টিপটিপ করছে।

সুধা সহজভাবে বলে, কী জানি। শুধু ভদ্রপুরের কথা মনে পড়ছে। গুরুজির কথা মনে পড়ছে। শুনেছি, গুরুজি মরার সময়ও আমার নাম করেছিলেন। ...এই। পাঁপর ভাজা খাও! এঁটো করেছি কিন্তু।

সনাতন হাত বাড়িয়ে ভেঙে নেয় খানিকটা। তারপর বলে এঁটো! আখড়ায় আমরা মুড়ি তেলেভাজা খেতাম একসঙ্গে। মনে নেই?

আছে। বলে সুধা চুপ করে থাকে।

মরুক গে সেসব পুরনো কথা। ...সনাতন হাতদুটো অকারণ ঝেড়ে সাফ করে নেয়। তোমার সংসারটা মন্দ নয়। তবে অতগুলো মানুষ বাচ্চাকাচ্চা।

সুধা ঝাঁঝাল স্বরে বলে, থাম। আমার সংসারের কথা বলবার জন্যে এমন করে আসিনি।

সনাতন কনুই ঠেস দিয়ে আদ্ধেক শুয়ে বলে, কেন এসেছ সুধা?

সুধা চুপ। কতক্ষণ চুপ। নক্ষত্র দেখছে। নাকি আকাশ দেখছে। আকাশ আর নক্ষত্র দেখলে হয়ত মনটা প্রসন্ন হয়। পৃথিবী তুচ্ছ লাগে। এরপরও কিছু থাকার বিশ্বাস মনকে হালকা করে তোলে—পাখিরা যেমন উড়ে যেতে পারে অনেকদূর। এখানে ভাল না লাগল তো অন্য কোথাও—অন্য কোনখানে। কিন্তু চারপাশে বড় স্তব্ধতা। অন্ধকার ভিজে যাচ্ছে মনে হয়। জেবড়ে যাচ্ছে সব ভিজে কাগজের লেখার মত।

সনাতন স্তব্ধতা ভেঙে ফের বলে, আমার একসময় মনে হত—এমনি একলা রাতে অন্ধকারে যখন বাঁশি বাজাতাম—মনে হত, যদি সত্যি সত্যি আকাশ থেকে পরী নেমে আসে! ... আজ বলছি সুধা—সে পরীর মুখটা অবিকল যেন তোমার মতো—আজ সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। এই সুধা শুনছ? সে কি সাধ আমার! সনাতন খিক খিক করে হাসে। তার রক্ত তোলপাড় হতে থাকে। হাত বাড়াতে সাধ যায়। পারে না। কতক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে ডাকে, সুধা! আর হঠাৎ তার মনে হয় যেন সুধা কাঁদছে। সে তার পিঠে হাত রাখে। অস্ফুটস্বরে বলে, তুমি কাঁদছ? কেন সুধা, কেন?

সুধা আস্তে—ভিজে স্বরে বলে, চুপ কর। আজ আমাকে কাঁদতে দাও সোনাদা।

সনাতন কী করবে, ভেবে পায় না! শুধু আকাশে দেখে, নক্ষত্র দেখে। পৃথিবীর সব অন্ধকারের মধ্যে সব চেনা মুখ আর শোনা কথা হারিয়ে যেতে থাকে তার। সুধাও অচেনা হয়ে ওঠে।
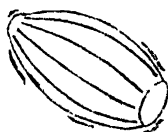
আবার একটা দিন শুরু হল। কিছু পুরনো কিছু নতুন—কিন্তু যে সুর নিয়ে শুরু তা আজও বাজছে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা সকালে গান ভাঙার পর আড্ডায় ফিরে চুপচাপ উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। কোন কথাবার্তা নেই মুখে। ফজল কয়েকবার জিগ্যেস করতে গেছে, চড় খেয়েছে—বাপান্ত শুনেছে! ফজল বলেছে, লাও জী! সেই ঘোড়ারোগে ফের কাহিল

হল লোকটা। ফজল মনমরা হয়ে রোদে বসে থেকেছে। সঙাল মানুষ। কিন্তু সুবর্ণ কাতুকুতু দিলে সেও ওস্তাদজীর মত খেঁকিয়ে উঠেছে। ...ভাল্লাগে না রে ভাই! তোদের দুনিয়া ডুবলেও হাঁটুপানি!

দুনিয়া কিসে ডুবল ওরা টের পাচ্ছিল না। ওদিকে লায়েকরা সহজে ছাড়তে রাজি নয়। আরও অন্তত তিন-চার আসর গাইয়ে তবে ছাড়বে। যাত্রা থিয়েটার আর কবিগানের বায়না দেওয়া আছে। সেও হবে সন্ধ্যাবেলার দিকে। দুপুর রাত্রি থেকে চলুক না আলকাপ। মেলায় বেচাকেনাটা বেশি হবে—লোক থাকবে। তাই দোকানদারেরা বাড়তি চাঁদা দিতে রাজি। কিন্তু ওস্তাদজী বলছে, না মশাই। আমি আর পারব না। ওরা যদি পারে তো জিগ্যেস করুন।

লায়েকপক্ষের লোকেরা ম্যানেজার আমির আলিকে নিয়ে পড়েছিল। আমির সনাতনকে ডেকেছে। সনাতন বলেছে, নিন না বায়না! আমার অমত নাই। চালিয়ে যেতে কি পারব না? খুব পারব।

আমির বলেছে, ষাট টাকা রেট। ঝাঁকসুকে তাহলে আরও বেশি দিত! সত্যি, আমার বড্ড অবাক লাগছে।

বারান্দায় যথারীতি রান্না হচ্ছে। আলুকপির ছ্যাঁচড়া, মুসুরি ডাল—ব্যস! নন্দ ছিলিম সেজে মোড়ায় বসে রয়েছে উনুনের সামনে। পাশে কাবুল। ছিলিমে আগুন দেবার মন নেই নন্দর—মনটা কটু। বারবার আড়চোখে আনাজপাতির দিকে তাকাচ্ছে আর রাগে বুকের ভিতর ধিকিধিকি ওইরকম উনুন জ্বলছে। ...শুধু ছ্যাঁচড়া আর ছ্যাঁচড়া! নিত্যি এই ছাড়া জোটে না শালাদের। এতবড় দলটা এল—একবেলাও কি মাছ-মাংস দেবার নাম আছে? হতাম যদি দলের ম্যানেজার—সোজা বলে দিতাম—হুঁঃ!

কাবুল বলে, তামুক জ্বালো মামু। নয়ত আমায় দাও। চোখে চশমা পরে বসে থাকি।

নন্দ খেঁকিয়ে ওঠে, খাব না রে তামুক। শালার দেশে তামুকেও ভেজাল দেয়।

কাবুল বলে, আবগারির মাল!

নন্দ চোখ পাকায়। ...তখন বললাম, গভর্নমেন্টের মালটুকু থাক, অমন জিনিস আর পাব না। রয়ে সয়ে খাই। তা কি না তর সইল না তোর। নে, এখন ইয়ে চোষ।

কাবুল হাত বাড়িয়ে বলে, নাও ঠাকুর—এবেলা ওই চোষ। আমি দেখছি—নদীর ধারে ঘুরে আসব একপাক। সন্ন্যাসীদের কাছে কিছু ভাল জিনিস বাগিয়ে আনব। মনকির ওস্তাদ বলছিল—খুব জমিয়ে ফেলেছে সাধুবাবাদের সঙ্গে। সে কি জিনিস মাইরি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর রঙ বদলে দেয়।

নন্দ লোভার্ত চোখে বলে, মনকিরদার মত মানুষ হয় না রে! বুঝলি? তোদের সোনামাস্টার ছোকরার প্রেমে পড়ে আলকাপে ঢুকেছে—আর মনকির মাস্টার কি না সত্যিকার মাস্টার!

পিছন থেকে সুবর্ণ বলে ওঠে, আর তুমিও খুব সাধু হে নন্দবাবু!

নন্দ মুখ ফিরিয়ে কাঁচুমাচু হাসে। কালচে পাঁকাটি শরীরটা মোচড় দিয়ে বলে, তুই আছিস!

গেটের কাছে কালাচাঁদ খুড়োকে দেখা যায়। দু'হাত তুলে প্রায় নাচতে নাচতে

দৌড়চ্ছে। সঙ্গে হোঁৎকামোটা একটা টেকো লোক! পেটে পৈতে জড়ানো। খালি গা। কালাখুড়ো চেঁচাচ্ছে, প্রসাদ, প্রসাদ! ঠাকমশাই রুদ্রদেবের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছে গো! আজ মচ্ছব হবে! মচ্ছব!

শালপাতায় মোড়া সের দুই পাঁঠার মাংস। স্বয়ং সেবাইত মশাই নিয়ে আসছে। নন্দর হাতে দিয়ে বলে, নাও বাবারা! বাবার ভোগের জিনিস দশজনাকে বিতরণ করাই বিধি।

কাবুল সবিনয়ে বলে, আজ সকালে কতগুলো পড়েছিল বাবাঠাকুর?

লোকটা অবহেলায় জবাব দেয়, সাতটা। বলির কথা যদি বললে, তা রুদ্রদেবের এ এক লীলা গো! দিন গড়ে দশ বারোটা মানসিক তো বলি হচ্ছে।

মাংসের খবর শুনে দলের যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসে ভিড় করেছে। ফজলও নাচছে ...সেই কবে নেশ্‌তা-তালাই গ্রামে কালীপুজোয় পাঁঠা খেয়েছি, উঃ—এখনও পেটের মধ্যে ব্যা ব্যা করে ডাকে শালা! কিন্তু রান্না করবে কে? হেঁদুর কম্ম লয় বাবা! দাও, ব্যাটা এ মোছলমানকে দাও।

আমির ফিসফিস করে, আপনি পাঁঠা খান ফজলভাই?

ফজল বলে, ঝাঁকসু কি কিছু বাদ রেখেছে খাওয়াতে হে? অজগর তো অজগর, হাতি তো হাতিই। একবার বুধিগ্রামে গান হচ্ছে। লায়েকরা কেটে পড়েছে গান করিয়ে। না টাকা, না পেটের ব্যবস্থা! ওস্তাদজী বলে, লে শালার ব্যাটারা, ওই ঢাকগুলো খেয়ে লে। ঢাকের চামড়ায় কামড় দিয়ে বসি আর কী! ঢাকীরা ঢাক তুলে লিয়ে ভোঁ দৌড়! বাপরে বাপ ...

ভিড় হাসছে হো হো করে। শেষ অব্দি দেখা গেল, সবাই যখন মাংস খাবে—তখন আলু কপির সঙ্গে মাংসটা একত্র রান্না ছাড়া উপায় নেই। এতগুলো লোক। আনিস পরামর্শ দিয়েছে, মাংসটা আগে মশলা আর দই দিয়ে কষে ফেলতে হবে। তা নয় তো, উৎকট গন্ধটা যাবে না। সে জানে। তার পাঁঠাখাওয়ার গল্পটাও সবাইকে হাসাল। সেও যে সঙাল, ফজলের চেয়ে কম কিছু নয়—এ প্রমাণ সে দিতে কসুর করল না।

সনাতন রোদ থেকে সরে পাঁচিলের কাছ শিরিষগাছের ছায়ায় বসে আছে। কাল রাতের ঘটনাটা ভাবছে।

আর এই ফাল্গুনের দিন—গাছে গাছে কচিপাতার ঝালর, সতেজ রাঢ়মাটির পৃথিবী আর আকাশ, মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে জলহাঁসের উড়ে যাওয়া নদীপারের বিলাঞ্চলে, শিরশিরে হাওয়ায় মিঠে উষ্ণতা—মনজুড়ে গান খেলে বেড়ায়। ঠোঁটে অলক্ষ্যে গুনগুনানি শুরু হয়!

আজ ফের আসর পড়বে ঝিঝিডাঙার মেলায়। সুধা কি আসবে আজও? মন বলে, আসবে, আসবে! প্রস্তুত হও। প্রস্তুত থেকো। ...

বারান্দায় ওস্তাদ ঝাঁকসা তখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে শিমুলগাছের মাথাটা জ্বলে যাচ্ছে। বাজ পড়ছে। মেঘ ডাকছে। গঙ্গা তোলপাড়। গঙ্গার জল নয়—আসর, জনকল্লোল। ঢপওয়ালি নাচছে: নাকি শান্তি? মুখটা শান্তির, দেহ ঢপওয়ালির। বাঃ রে বাঃ ঢপওয়ালি! ...দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। শরীর জ্বলে

যায়। চারপাশে এত লোক! একটু আড়াল দরকার। আড়াই চাই, আড়াল! এত লোক! ওস্তাদ—ওস্তাদ—ওস্তাদজী! আঃ, কেন যে ডাকে শালার ব্যাটা শালারা!

ধুড়মুড় করে উঠে বসে ওস্তাদ ঝাঁকসা। সাবধানে কাপড় চোপড় সামলে নেয়। কাম! সর্বনেশে কামের মারমূর্তি শরীর ভিতর। রাতজাগা শরীর কামঘরে পরিণত। হয়—এ তার নিজের কথা। আর লাল চোখে সামনের লোকটাকে দেখে সে। সুবিদ পাইকার না? মদনপুরের সুবিদ হোসেন! ওস্তাদ হাসবার চেষ্টা করে। ...সুবিদভাই রে! কখন আইলি? ভাল আছিস? কুশল তো সব? হেফাজদ্দি কেমন আছে?

বাঘড়ী অঞ্চলের বুলিতে সুবিদ হোসেন বলে, চণ্ডীতলার দলের বায়না দিয়ে এনু জী।

চণ্ডীতলা? নামটা কোথায় যেন শুনেছে। ওস্তাদ ঝাঁকসা স্মরণ করতে থাকে। ... চণ্ডীতলার দলের কথা শুনিনি! নতুন দল? বাঃ, ভাল ভাল!

সুবিদ মাথার পাগড়িটা খোলে—চাদর পেঁচিয়ে পাগড়ি বানানো ওর পাইকারি রীতি। হাতে ছড়ি—ওই দিয়ে গরুকে খোঁচাখুচি করে। সাদা লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি—তার ভিতর ফতুয়া। কোমর খুঁজলে গেঁজের ভিতর কৌটোয় একগুচ্ছের নোটের দেখা মিলবে। সে বলে, হ্যাঁ—নতুনই বটে। তবে কি না ... কেমন রহস্যময় হেসে চুপ করে সে।

উঁ? বলে ওস্তাদ ঝাঁকসা সপ্রশ্ন তাকায়।

সুবিদ বলে, মদনপুর গোহাটের দিন—হাতেনাতে কাল মঙ্গলবার এক আসর গান দিবে পাইকারগণ। তো ফির, হামারে দায়িত্ব দিলে কি ঝাঁকসু ওস্তাদ তুমার যে চেনা লোক—সুবিদ তুমিই যাও জী। তাই গেনু ধনপতনগর। গেনু তো পেসন্নর মুখে খবর পানু, আপনি রাঢ়ে আছেন। বাপ রে বাপ, সেই রাঙামাটি-চাঁদপাড়া থেকে ঘুরতে ঘুরতে ঝিঝিডাঙা। তেবে (তবে) হামি বুলেছিনু জী—যে ঠিএে (যেস্থানে) থাকেন উনি, টুঁড়ে বার করবই। ...লেন জী, বায়না লেন।

দশটাকার নোট বের করে সুবিদ। ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ফজলকে ডাকি। ...ফজল, ফজলা রে!

ফজল দৌড়ে আসে! আরে পাইকার যে! আস্‌সালামু আলাইকুম!

...আলাইকুম আস্‌সালাম। ভাল আছেন জী? সুবিদ হাত বাড়ায়।

মুসলমানি রীতিতে করমর্দনের পর ফজল বলে, বায়না? দেখেই বুঝেছি।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, চণ্ডীতলার দলের কথা শুনেছিস ফজল?

চণ্ডীতলা! ...চণ্ডীতলা...কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ফজল। তারপর গুম হয়ে যায়। মাথাটা ঝুলে পড়ে। মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে তার।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, কী হল রে কাঠব্যাঙ?

ফজল নিরুত্তর। সুবিদ হোসেন চোখ পিটপিট করে হাসছে!

ওস্তাদ গর্জে ওঠে, এই শালা খবিস? বলবি তো?

ফজল মুখ তোলে। কালো—ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে মুখ। ঠোঁট কামড়ায়। তারপর বলে,

ওস্তাদজী, সেই হারামিবাচ্চা চণ্ডীতলার দলে গেছে। মনকির মাস্টার বলছিল—মনে নাই? ...পাইকার, এটা ঠিক লয় ভাই, ঠিক লয়। তুমি কুপ্রস্তাব লিয়ে এসেছ।

ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ বুজেছে আবার। সুবিদ। খ্যাক খ্যাক করে হাসে। ... বেশ তো জী, হুকুম দেবেন—শান্তির চুল ধরে আপনার কাছে হাজির করে দিব। লিয়ে যাবেন ধনপতনগর। কার সাধ্য আপনারঘে গায়ে হাত দেয়। একেবারে আসর থেকে তুলে লিয়ে আসব জী!

ফজল লাফিয়ে ওঠে। ...তাই! হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই করতে হবে! যদি বশ না মানে, শালার চুল কেটে লিব ফির। ন্যাড়া করে দিব শালাকে। ... ফজল প্রতিশোধের নেশায় নেচে ওঠে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা ধমকায়। ... চুপ বে, চুপ। হামাকে ভাবতে দে। হামি শোচ করতে লাগি। ...

ওস্তাদজী কতক্ষণ শোচ করবে। সুবিদ হোসেন ফজলকে মেলার দিকে ডেকে নিচে যায়। চা পান খাওয়াবে। পাইকার মানুষ—নগদ পয়সাকড়ির অভাব নেই ট্যাকে। যেতে যেতে ফজল সেইসব দিনগুলোর কথা ভাবছে। শান্তিকে আসরে পেলা ধরত সুবিদ পাইকার। একবার তো একগাদা নোটের মালা গেঁথে দিয়েছিল গলায়। সে রাত্রে সে দারুণ তাড়ির নেশায় মাতাল। ফের সেফটিপিনে দশ টাকার নোট গুঁজতে গেলে সঙ্গের লোকেরা তাকে পাঁজাকোলা তুলে নিয়ে গেল। ...কী কাণ্ড সব! মেয়ে তো নয়, আস্ত পুরুষ। তবু মাথাটা খারাপ হয়ে যায় অমন হিসেবি ঝানু পাইকারটার।

চায়ের দোকানে বসে সুবিদ বলে, ঝিঝিডাঙা আমার চেনা জায়গা। স্বরূপ মণ্ডলের সঙ্গে দোস্তি আছে। চাটা খেয়ে চলেন যাই ওনার বাড়ি। খানিক ফূর্তি করাও যাবে। মণ্ডল মাঠকোঠার ছাদে চোলাই হজম করে রাখে।

ফজল বলে, না হে পাইকার। ঝাঁকসুর মেজাজ আজ ভাল নাই। মাতাল দেখলে মেরে দম বের করে দেবে। নিজে যখন খাবে না, অন্যকেও খেতে দেবে না। বড় বেয়াড়া মানুষ হে পাইকার।

ওরা এইসব কথাবার্তা বলে। ফজলের পাশে ভিড় জমেছে ততক্ষণে। সঙাল দেখছে! দেখেই হা হা করে হাসছে। শূন্য মেলাপ্রাঙ্গণে ঘূর্ণি হাওয়ায় শালপাতা উড়ছে। একটা কুকুর দৌড়ে যাচ্ছে তার পিছনে। ফজলের চোখ পাতাতেই। ফের ঘূর্ণি এল। ফের শালপাতা উড়ল। এবার হঠাৎ ফজল উঠে কয়েক পা দৌড়ে যেতেই ওদের পেটে খিল ধরে গেছে। রামধনিয়া চানাচুরওলা পেটে হাত দিয়ে কঁকাচ্ছে। আরে বাপ! জান মার দিয়া রে, বিলকুল! ...

ঝিঝিডাঙায় এখন এগুলো সবই উৎসবের অঙ্গ। ঝিঝিডাঙায় এখন উৎসবের মরশুম। কাছারিবাড়ির প্রাঙ্গণে ইতস্তত জটলাপাকানো গেনেরা, দিনের মেলার অল্পস্বল্প এইসব লোকজন আর ঘটনাবলী—সব নিয়ে পাড়াগেঁয়ে মানুষদের মনে কতরকম শোরগোল। কত তোলপাড়। কিছুদিন পরেই তো এখানে শ্মশানের গা ছমছমানি, কবরের নিরুপদ্রব ঘুম! এখন যে-যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সবার মনে ওইসব দৃশ্য অবিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্রে ভাসছে আর ভাসছে। ...

আনিস দই আনতে যাচ্ছে। সুবর্ণকে ডেকে যায়। সুবর্ণ চুপচাপ শুয়েছে ঘরে। কাদের আলি এসে বলে, সঙ্গে গেলে অনেক মিষ্টি খেতিস সুবর্ণ।

সুবর্ণ ভুরু কুঁচকে মাথা দোলায়। কাদের আলি তার পাশে শুয়ে পড়ে। ওর চুল শুঁকে বলে, বাড়ি ফিরলে ভাল হেয়ার টনিক এনে দেব বহরমপুর থেকে। কল্পনায় একটা দারুণ নাচ-গানের ছবি চলছে রে। দেখে আসবি। অনেক শিখতে পারবি।

সুবর্ণ গুনগুন করে। বশ মানবার মত নিজেকে কিছুটা কাদের আলির কাছে যেন সমর্পণ করে দেয়। তারপর বলে, সেই হিন্দি গানটা কী গো মাস্টার? ম্যায়নে ক্যা করু ...

কাদের আলি বলে, থাম। বাড়ি ফিরেই রেডিও কিনছি। কত শিখবি, শিখিস।

সুবর্ণ অবাক চোখে বলে, তোমার বাড়ি তো 'ফারাজি' (ওহাবী মুসলিম—পিউরিট্যান পন্থী) পাড়ায়, রেডিও বাজাতে দেবে লোকে? ভেঙে দেবে না তো?

কাদের আলি চিন্তিত মুখে জবাব দেয়, দেখা যাক।

সুবর্ণর চুড়িপরা হাতটা অকারণ নাড়াচাড়া করে সে। পায়ের দিকে 'বাহক' নফর ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছে করেই তার গায়ের ওপর পা দুটো চাপিয়ে দেয় কাদের আলি। নফরের হুঁস নেই। সে একটু হেসে বলে, সখ আমাদের আর কতটুকু? সখ এই কুম্ভকর্ণটার! ছোঁড়া চিরদিন যন্ত্র বয়েই মল—আস্বাদন পেল না।

সুবর্ণ হাসতে হাসতে বলে, তোমরা সবাই ওইরকম। আমিও। ...

দই কিনতে গিয়ে আনিস ফিরে আসছে। সুবর্ণ যায়নি সঙ্গে। না যাক। খচ্চরটার খুব বাড় বেড়েছে। ঠিক আছে। ফিরে গিয়ে দলের চাঁদা আর দিচ্ছে না সে। সুবর্ণর খোরাকি মাইনে যা দিতে হয়, ওরা আর সবাই দিক। আনিস দলের সঙাল—তাকে ছাড়া দল চলবে না!

সে সনাতনকে ডাকে। ... আসুন ওস্তাদ, ঘুরে আসি।

সনাতন ঝিমোচ্ছে। চোখ তুলে বলে, কোথায়?

হাত ধরে টানে আনিস। ...আসুন না ছাই! মেলায় এলাম, মেলার স্বাদ পেলাম না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সনাতন সঙ্গে যায়। মিষ্টির দোকানে গিয়ে বেঞ্চে বসে দু'জনে। আনিস বলে, যতরকম ভাল মিষ্টি আছে, সব দুটো করে।

সনাতন লাফিয়ে ওঠে। ... আরে! না না—মিষ্টি আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু হাতে মস্ত ঠোঙাটা এসে গেলে সে নিতে দ্বিধা করে না। নিঃশব্দে খায়। অনেকদিন মিষ্টি খায়নি—কেন খায়নি তাও ভাবে সে। পয়সার অভাব? ...তবে এটা ঠিক, বহরমপুরে ফিল্ম দেখাতে নিয়ে গিয়ে সুবর্ণকে অনেকবার সে মিষ্টি খাইয়েছে। নিজে খায়নি। কেন খায়নি? ...হাল ছেড়ে দিয়ে সনাতন রাজভোগের রস চুষতে থাকে শিশুর মত। সত্যি, জীবনে মিষ্টি খাবার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। ...

তারপর সূর্য মাথার ওপর।

কতক্ষণ পরে রান্না শেষ হয়ে আসে। কাবুল যথারীতি ডাকাডাকি শুরু করে। হেই গেনেরা, চান করে এস। খাবার রেডি! যে যেখানে ছিল ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অনেকে তেল

মাখতে বসে। ওস্তাদ ঝাঁকসা আজ স্নান করবে না। শরীর খারাপ। সুবর্ণ ব্যাগ থেকে সাবান বের করে। সাবধান জামাগেঞ্জি তুলে তক্ষুণি গামছা জড়িয়ে নেয় গায়ে। যেতে যেতে একটানে ফজল ওর গামছাটা টেনে ফেলে। সুবর্ণ দু'হাতে অকারণ বুক ঢাকে—বড় অকারণ!

নাকি তা নয়। সনাতন আড়চোখে দেখে, এই বয়সে—আশ্চর্য, পুরুষের বুক নিয়ে বিধাতার এ কী রসিকতা! সনাতন স্মরণ করে, তারও এইরকম হয়েছিল। এই নিয়ম। কিন্তু অবাক লাগে তার। ...

দীঘির পাড়ে আশ্বত্থশিরিষের মাথায় শেষ আলোর টোপর। তখন গাঁয়ের মেয়েদের জলকে আসার সময় হল। গেরুয়া ধুলো আর খড়কুটো উড়িয়ে মাঠের কোনাকুনি দৌড়ে গেল দিনের শেষ ঘূর্ণিহাওয়া। নির্জন মাঠে শেয়ালটা পায়ে শুকনো খড় জড়িয়ে বিব্রত হয়েছে। এতদূর থেকে এরা লক্ষ্য করে, ফজল চলতে চলতে হঠাৎ থেমে তার সঙ্গে রসিকতা করে নিচ্ছে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কুঁজো হয়ে হেঁটে চলা ভারি আর মোটা হাড়ের শরীরটা উন্মুল ভাসমান গাছের মতো দেখাচ্ছে। অসমতল চড়াই-উৎরাই, বাঁজাডাঙা, পিঙ্গল আদিগন্ত মাঠের পটে দুটো মানুষকে অবেলায় এমনি করে চলতে দেখে এরা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। তুখোড় নন্দও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, থাকল না ওরা!

ওরা থাকল না। মনে ঝড় নিয়ে চলেছে। ঝড়ের টানে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই ওস্তাদ মানুষটাই আসলে একটা অদ্ভুত ঝড়। ওর সঙ্গে ওরা ভেসে এসেছিল। আটকে রইল। এদেরও বড় খারাপ লাগছে। যেন ভাঙা শূন্য করে কোন বাবুমশাইরা কেটে তুলে নিয়ে গেলেন প্রকাণ্ড বট। এত একলা লাগছে! এত অসহায়। যতক্ষণ কাছে ছিল, মনটা ছিল ভরে। মাথার ওপর কঠিন আড়াল ছিল। এখন বুঝি দুঃসময় এসে গেল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আর চাপা স্বগতোক্তি করে আমির আলি বলে, তৈরি হও ভাইবন্ধুরা!

কালাখুড়োও চুপি চুপি সুবর্ণকে শুধোচ্ছে, এরা কিছু অসম্মান করেনি তো ওনার? ঠিক জানিস বাছা?

সুবর্ণ উদাস চাউনিতে শুধু মাথা দোলাচ্ছে।

কাবুল বলে, কী বলব গো! আমার চোখ ফেটে জল আসছে। আহা-হা, কী মানুষ! এমন হয় না—এমন দেখি নাই সংসারে। আজ যেন বাবাহারা হলাম। কাছে যতক্ষণ ছিল চিনতে পারিনি গো।

কাদের আলিও আনমনা। সে ম্লান হাসছে। বলছে, পিঠে বয়ে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেল। শ্বেতহস্তী—শ্বেতহস্তী!

আমি বলে, হুঁ। পঁচিশ টাকার 'পয়ান' (দর) বেড়ে হল ষাট। ...আমি টাকার হিসেবেই ব্যাপারটা দেখছে বলে সবার খারাপ লাগে।

দীঘির পাড় থেকে বিদায় দিতে আসা দলের সবাই চলে গেল আড্ডার দিকে।

সনাতন কাটা তালগাছের মুড়োয় বসে ছিল। সে বসে থাকল। আর সুবর্ণ গেল না। সুবর্ণ পাশে এসে হেলান দিয়েছে।

সনাতন বলে, ওস্তাদজী কেন গেল, জানিস সুবর্ণ?

সুবর্ণ জবাব দেয়, হঁ। ফজলদা বলছিল, ওনার সেই পালানী ছোকরাটার বিপক্ষে বায়না। ধনপতনগর যাবে। নিজের সেট জুটিয়ে পাল্লা দেবে।

কিন্তু আমাদের তো বলতে পারত রে! তুই ছিলি—শান্তিটান্তি ফুঁয়ে উড়ে যেত। জব্দ হত।

সুবর্ণ অকারণ ঝাঁঝালো গলায় বলে, বা রে! তাহলে আর ওনার কদর রইল কী? আপনারা ওস্তাদজী চেনেন নি—আমি চিনেছি। লোকে বলবে, ঝাঁকসু ওস্তাদ সাঁওতাপাড়ার ছোকরার জোরে শান্তিকে হটালে। ফজলদা বলছিল, সেই ভানুকে নিয়েই লড়বে ওস্তাদজী!

সনাতন হাসতে হাসতে বলে, আবার এও হতে পারে—ভানু-টানুকে নিয়ে গাইলে ওঁর টাকাকড়ি বেশি থাকবে—আমাদের নিলে সেদিকে পোষাবে না। নিজের অঙ্কে কম পড়বে।

সুবর্ণ বলে, যান! আপনিও ম্যানেজারের মতো। টাকা দিয়ে সব হিসেব মেলাতে চান!

মেলে না?

না। তাহলে আপনি—আপনার মতো মানুষ কেন আলকাপের দলে?

আমায় তোরা কী ভাবিস বল তো সুবর্ণ?

সুবর্ণ তর্কের সুর গলায় রেখে বলে, আপনাকে আলকাপে মানায় না।

কেন মানায় না?

সে জানিনে বাপু। আপনি নিজেও বোঝেন সেটা।

তাহলে চলে যেতে বলছিস?

সুবর্ণ চমকে ওঠে। ... যান! কী কথায় কী! আপনার চেয়ে অনেক বেশিদিন এ লাইনে আছি কি না—সব জানি। এত খারাপ এত মন্দ আর কিছু নাই সংসারে! আলকাপ এক সর্বনেশে আগুন ওস্তাদ—নরক, নরক! মানুষকে দগ্ধে দগ্ধে মারে। না পারে এ নেশা ছাড়তে, না পারে এর মধ্যে শান্তিতে বাঁচতে।

সনাতন নিষ্পলক তাকায় ওর মুখের দিকে। জানি না, তুই কী সব বলছিস। বুঝতে পারছি নে সুবর্ণ।

সুবর্ণ মুখ নামিয়ে শ্লিপারের ডগা মাটিতে ঘষড়ায়। তারপর বলে, একদিন বুঝবেন।

সে রাতের আসরে মনকির ওস্তাদ নিজমূর্তি ধরেছে।

ওঠামাত্র ব্যঙ্গ আর টিকাটিপ্পনী নানারকম। ...শিশুর সঙ্গে যুদ্ধ মহারথীর। তবে এ শিশু তো অভিমন্যু নয় বন্ধুগণ। এ হল কিনা মুদ্দোফরাসবাড়ির পেঁচোয় পাওয়া ক্ষেন্তি। আর তাকে কিনা শহুরে হাওয়া লেগেছে গো! চিঁ চিঁ করে গান গেয়ে বলে, 'ছিনেমা, ছিনেমা!' ... আরে বাবা, আদি আলকাপ কিছু জানা আছে? ও তো নকলের নকল, তস্য নকল। ধার করে এনেছে শহরের মামুবাড়ি থেকে!

শ্রোতারা সোজা হয়ে বসে। কাঁচারঙের খেউড় শুরু হবে তাহলে। হোক।

... আমি নলহাটি-গোবিন্দপুরের মনকির হোসেন। আমি নিজে বাঁধি গান, নিজে রচনা করি কাপ, নিজের 'কবিকল্পনা' বলে বানাই আলকাপের ছড়া। ...

মনকির ওস্তাদ জোর নাচ শুরু করল তালে তালে। সেই নাচের দশায় খুলে ফেলল গায়ের কাপড়চোপড়, খালি গায়ে কাপের চরিত্র নিল। তামাটে রঙ, ফুলন্ত বুক—শীর্ণ হলেও পুষ্ট নিটোল দেহটা। গলায় চাঁদির তক্তি। ঝাকমাকড় পিঙ্গল চুল নাড়া দিয়ে বলল, তবে শোন একখানা আদি আলকাপের নাট্য। আমরা দুই ভাই। আমি ছোট, আমার বড় একজন আছে। দুইভাই বেশ ছিলাম—দুই পরের ঘরের বেটি এনে মনকষাকষি। পৃথকান্ন না হলেই নয়।

জমে গেল কাপ। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে সামান্যই। গাঁয়ের মোড়ল ভাগবণ্টন করে দিচ্ছে। একটা তালগাছ, একটা গাইগরু একটা কাঁথা নিয়ে সমস্যা। দুজনেই ওগুলো চায়। মোড়ল বলল, তবে এক কাজ করা যাক। তালগাছের মাথা-গোড়া ভাগ হোক। কে মাথা নেবে, কে গোড়া নেবে—তাই বল!

ছোট বলল, মাথার দিকটা তো উঁচুতে। নাগাল পাব না পৈতৃক সম্পত্তির। অতএব গোড়া আমার রইল।

বড় বলল, তাই হোক। মাথা আমার।

এবার গাইগরুর বণ্টন। সামনে কে নেবে, কে নেবে পেছনটা। ছোট বলল, সামনের মাথার দিক নেব। বা রে! পৈতৃক সম্পত্তি—কাস্তে হাতে মাঠে ঘাস কাটাতে যাব। ঘাস আনব। লোকে দেখবে। শুধোলে বলব, বাপের বিষয় গাইগরু পেয়েছি। ওরা বলবে বাঃ! লোকটার কপালে গোরু জুটেছে।

বড় বলল, ঠিক আছে। আমার পেছনের দিক রইল।

তারপর কাঁথা বণ্টন। দিনে একজন, রাত্রে অন্যজন। দিনে কে নেবে? ছোট নেবে। বাপের বিষয়—লোক দেখবে। কাঁথাগায়ে শোবে মাগ-মরদে দরজার সামনে। সবাই বলবে, দ্যাখ, দ্যাখ!

গবির গেরস্থ সংসারে আরও কত কী টুকরোটাকরা আছে। ছোট সবিক্রমে গান জুড়ে দিল,

> বেঁটে দে দাদা, ছাতা,
> ওরে বেঁটে দে মোরে ছাতা—
> বিষয়ের ভাগ লিব রে দাদা
> ময়দা-পেষা জাঁতা।।

ছোট কিছু ছাড়তে রাজী নয়! চেঁচিয়ে ওঠে মুহুর্মুহু—

> বেঁটে দে দাদা, হুঁকো
> ওরে বেঁটে দে মোরে হুঁকো—
> বিষয়ের ভাগ লিব রে দাদা
> ছাগল বাঁধা খুঁটো।।

ছাগলটা অবশ্য নেই। খুঁটো আছে। তারও ভাগ চাই। বণ্টন শেষ হলে মজার কাণ্ড বাধল। বর্ষায় তাল পেকেছে। বড় পেয়েছে ডগা। সব তাল তার। তালপিঠে খায়, তালবড়া খায়। ছোট পস্তায়। গরু দুধ দিচ্ছে। বড় পিছনের মালিক। সে দুধ খায়। ছোট হাঁ করে দ্যাখে। শীত পড়েছে। ছোট সারারাত শীতে কষ্ট পায়, বড় আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। তবে চল সেই মোড়েলের কাছে। বুদ্ধিশলা নেওয়া যাক। বুদ্ধিশলা মিলল। ব্যস, এবার চূড়ান্ত নাটক। ছোট কুড়োল এনে তালগাছের গোড়া কাটতে যায়—বড় হাঁ হাঁ করে ওঠে। উপায় নেই। ছোটর নীচের দিকটা—যা খুশি করতে পারে। বড় দুধ দুইতে বসলে ছোট গোরুর মুখে বাড়ি মারে। গোরু ঠ্যাঙ তুলে লাফায়। কাঁথাটা দিনের দিকে ছোট জলে চুবিয়ে রাখে—রাত্রে বড় ভিজে কাঁথা নিয়ে বিপাকে পড়ে যায়। অতএব?

ফের দুই ভাই একান্ন হল। ঠাঁই ঠাঁই হতে নাই—গরিবের সংসার। জোট বেঁধে থাকো। মনে মিল রাখো। নৈলে কেউ বাঁচতে পারবে না বাবাসকল।...

প্রথম পালা সাঁওতাপাড়া, গান জমাতে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছিল। তুখোড় ঘরোয়া আটপৌরে কথায় তৈরি কাপের বিপক্ষে 'আধুনিক কাপ' যেন কোণঠাসা। রাজা-রাজকন্যা জমে না, ফিল্মের ঘটনা থেকে তৈরি 'সামাজিক' কাপ সনাতনের—লোকে বলছে, স্বদেশী যাত্রা ভাল্লাগে না বাবু, খাঁটি আলকাপই হোক আজ। আশ্চর্য! সনাতনকে আশ্চর্য লাগে। কাল রাতে ওস্তাদ ঝাঁকসা আসবে ছিল। কতক্ষণ ধরে করুণ রসের নানান পালা গেয়েছে—স্তব্ধ হয়ে শুনেছ সবাই। কী যাদু ছিল ওস্তাদজীর কাছে?

দ্বিতীয় পালা পেয়ে মনকির ওস্তাদ শুরু করল 'নুনচুরির' কাপ। গরিব দুই মাগ-মরদ। পান্তা আছে ঘরে, নুন নেই। দুজনে গেছে মোড়লের বাড়ি নুন চাইতে। এত কৃপণ মোড়ল—এককণা নুন দেবে না। অতএব দুজনের পরামর্শ চুপিচুপি। বউকে পেটাতে পেটাতে দৌড়চ্ছে লোকটা! বউ দৌড়ে সেই মোড়লবাড়ি ঢুকল। মোড়ল দুজনকেই থামাতে চায়—আটকাতে পারে না। বউর চলে মুখ, ওর চলে হাত। ফের জোর তাড়া খেয়ে বউ ঢুকেছে মোড়লের ঘরে। মোড়ল দরজায় দাঁড়িয়ে আটকায়।—থাম বাপু, থামদিক। খুব হয়েছে। মরে যাবে যে। লোকটা বলে, না, ওকে খুন করব। পথ ছাড়ো।

ভিতর থেকে গাল দেয় বউ, রক্তের ব্যাটা শক্ত!

মরদটা বুঝেছে, কী বলতে চায় বউ। নুন জমে শক্ত হয়ে আছে। সে পাল্টা গাল দেয়, উঁটের বেটি খুঁটে!

বউটিও বুঝেছে। স্বামী তাকে বলছে, নুন শক্ত হোক—খুঁটে তোল। সে গাল দেয়, আটার ব্যাটা ফাটা।

অর্থাৎ, কাপড় যে ছেঁড়াফাটা। নুন পড়ে যাচ্ছে। পুরুষটি বলে, অবলের বেটি ডবল।

তার মানে কাপড়টা ডবল কর। মোড়ল বলে, কী আপদ! মুখ যে কারও থামছে না রে বাবা! কেমন করে মিটবে ঝগড়া? বাবা, তুই একবার থাম না, থেমে দ্যাখ।

পুরুষটি বলে, বেশ। থামলাম। ভিতর থেকে মেয়েটিও বলে, আমিও তবে থামলাম।

নুন চুরি করে দুজনে চলে গেল।......

এইসব 'কাপে' মনকির এস্তাদ শেষরাত্রির আসরটা চাঙ্গা করে তুলেছে। সনাতন সুবর্ণর দিকে তাকায়। সুবর্ণ বলে, ওরা তাই করুক। আমরা আরও স্বদেশী করি। সকালের আসর আমরা পাচ্ছি। তখন অনেক শিক্ষিত মানুষ এসে ভিড় করবে। সমঝদার পাবো।

সূর্য ওঠার মুহূর্তে এদের পালা শুরু। রীতি অনুসারে প্রথমে ওঠবার কথা ছোকরার। উঠল সনাতন নিজে। কোর্নাদন যা করবে না ভেবেছিল—তাই করে বসল। 'ঠেস' ধরল ছড়ায়। সরাসরি আক্রমণ।

"...গুণের কামধেনু! (আহা) গুণের কামধেনু
তোর, বলিহারি যাই,
পট্‌কা বাঁট দুধ মেলে না ঠ্যাঙ তুলে লাফায়।।"

রূপপুরের আসরে কালিপদ ছড়াদার আলকাপের দলে এসেছিল। সনাতনকে 'ঠেস' মেরেছিল এই ধুয়ো দিয়ে। ভারি ঝাঁঝাল—তিক্ত—তুখোড়। আসর ফেটে পড়ছে, বাঃ বাঃ!

হঠাৎ সনাতন চমকে উঠেছে। পা ওঠে না নাচে! গলা শুকনো। সুধা দাঁড়িয়ে আছে শেষপ্রান্তে। লজ্জায় মহূর্তে আড়ষ্ট হয় সনাতন। সুধা এসে দাঁড়াতেই সবটাই হাস্যকর আর ঘৃণ্য হয়ে পড়েছে। কেন এল সুধা? কেন তার সঙ্গে আবার দেখা হল? একটা গভীর হয়ে সনাতনের বুকটা কাঁপে। সুধা কী চায় তার কাছে—এতদিনে?

মধ্যরাতের আকাশে নক্ষত্র। নক্ষত্র গঙ্গার বুকের তলায় ঝিকিমিকি জ্বলছে। ঠাণ্ডা শান্ত নিশ্চুপ জল। আবছা চরের পাশে ভাঙা নৌকা কাত হয়ে আছে। নিঃঝুম এপার-ওপার পৃথিবীতে গভীর ঘুমের সময়। ধনপতনগরের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে ফজল চেঁচিয়ে ডাকে, সুরজধনিয়া হো! হেই সূর্যধন! হো-ই-ই-ই-ই!

সাড়া পাবার কথা নয়। সূর্যধন ঘেটেল এখন গাঁজা খেয়ে কুঁড়ের ভিতর সমাধিস্থ হয়ত। জঙ্গীপুর হয়ে এলে ভাল হত। দূর দক্ষিণে আলোর ফোঁটা অগুনতি—যেন স্বপ্নের ভিতর রাজপুরী।

ওস্তাদজী ধুপ করে বসে পড়েছে বালির ওপর। ভারি ক্লান্ত! যা হয় ফজল করুক—পারে না।

ফজল বলে, চলেন জী—হেঁটেই পার হই। এককোমর বড় জোর। উঠেন!

ঝাঁকসা ওস্তাদ বিদঘুটে হাসে।...হাম নেহী শেকে বে, তু কাঁধসে বৈঠা হামকো। বৈঠাকে পার কর!

ফজলও হাসে। হামিও কেলান্ত জী। পারব না। সাড়ে দু মণ ওজন হবে পাক্কা! ওঠেন!

ওস্তাদজী বলে, ফির ডাক না বে। ডাক, শালা ভাতিজাকো। মেরা নাম বোলকে ডাক।

ফজল চেঁচায়—তালু দিয়ে চোঙ বানিয়ে যথাসাধ্য চোঁচায়, হই সুরজধনিয়া! ওস্তাদজী আয়া বে! তেরা ঝাঁকসুভাতিজা!...

কয়েকবার ডেকে গলা ভেঙে যায় ফজলের। রাতের পর রাত চেঁচিয়ে গলায় আর রসকষ কিছু নেই। ছেৎরে যাচ্ছে ডাক। এবার ওস্তাদজী নিজেই ডাকে। ডাক তো নয়, দুপুর রাতে বাজ পড়ছে। কী অমানুষিক কণ্ঠস্বর লোকটার! সারাজীবন ফজল ওই কণ্ঠস্বর শুনছে—কোন আসরে শুনল না একটুখানি চিড় খেয়েছে বা ধরে গেছে। ঝাঁকসা ওস্তাদ ডাকে, ওবে শালার বেটা শালা সুরজ্যা! এ মেরে বহিনকা বাচ্চা!

কোন সাড়া নেই দেখে সে হুড়মুড় করে জলে নামে। কাপড় জুতো সমেত এগিয়ে যায়। ফজল অতটা পারে না। জুতো খোলে। জামা গেঞ্জি খোলে। মাথায় জড়ায়। শেষে পা বাড়াতে গিয়ে ধুতিটাও খুলে ফেলে। মাথায় পুরোটা পেঁচায়। এক হাতে জুতো জোড়া নিয়ে ন্যাংটা হয়ে নামে। ওস্তাদ ঝাঁকসা হাসে না। শুধু বলে, আবে মস্তান, গাঙমে ভি তেরা মাফিক বহৎ মস্তান জালমাছ (চিংড়ি) হ্যায়। সামাল না!

ফজল আঁতকে উঠে খালি হাতটা জলের ভিতর নাড়তে নাড়তে এগোচ্ছে। কখনো কোমর জল, কখনো হাঁটু—তারপর চর। ফের জল। কোমরের বেশি নয় এদিকে। ঘাটের সোজাসুজি গেলে বেশি হত। উঁচু পাড় সামনে। মস্তো ঢ্যাঙা গাছটার দিকে তাকিয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসা থমকায়। ...কাঁহা আ গইলা বে ফজল!

ফজল ঠাহর করে জবাব দেয়, আপনারঘে শ্মশান।

মাটির চাঙড় আঁকড়ে দুটিতে অনেক কষ্টে পাড়ে ওঠে। ফজল দ্রুত ধুতি দিয়ে গা মুছে নেয়। কাপড় জামা পরে। হি হি করে কাঁপছে সে। তারপর ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, ঢপওয়ালীকে কাঁহা পুঁতিস বে ফজল?

মুহূর্তে ফজলের গায়ে কাঁটা দিয়েছে। সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেছে। দেঁতো মাংস ওঠা মুখ, একরাশ চুল, কামড়ানো স্তন—উলঙ্গ পচা দুর্গন্ধ মেয়েলী দেহটা! সে ফিসফিস করে বলে, চিনতে পারছিনে। চলেন জী, পালাই। গা বাজছে!

ওস্তাদ ঝাঁকসার কোন চঞ্চল্য নেই। পকেট থেকে কী বের করছে। বের করে সে ফজলের দিকে বাড়িয়ে দেয়—লে। রূপেয়া। একশো' থা—খরচাকা বাদ পুরা শও। লে, তেরে পঞ্চাশ আলাদা রাখিস হাম। লে!

...এত ক্যানে দিচ্ছেন জী? ফজল স্তম্ভিত। রাঢ়ে মাত্র চার রাত্রি গেয়েছে। চার আসরে তার পাওনা হয় চল্লিশ—কিন্তু যাবার আগে ত্রিশ টাকা নিয়ে বসে আছে। ফুফার কাছে দেনা ছিল—শোধ করেছে। সে হিসেবে পাওনা হয় মাত্র দশ। সে

ব্যাপারটা বুঝতে চায়। ওস্তাদ কি তাকে সবসময় এমনি অগ্রিম দিয়ে আটকে রাখতে চায়! ফজলও পালিয়ে যাবে নাকি? ফজল ফের বলে, ওস্তাদজী! এত টাকা ক্যানে?

...তেরা বখশিস বে ভাতিজা। ওস্তাদ ঝাঁকসা একটু হাসে। ...শান্তিকা হিস্যাভি তেরা পাওনা। লে। গিনকে লে আচ্ছাসে।

বেশি কথা বলা সঙ্গত নয়। ফজল টাকাগুলো পকেটে রেখে বলে, আসেন!

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, যা বে, ঘর চলা যা। কাল বিহানমে আবি—ঠিক আট বাজকে! হ্যাঁ!

ফজল ইতস্তত করে। ...আপনি!

ওস্তাদ ঝাঁকসা তেড়ে যায়, মারকে তোড় দেগা মুখ—আ বে মেরা বহুকা ভাই, দর্দ দেখাতা? ভাগ শালা। ভাগ!

ফজল চলে যায়। প্রায় দৌড়ে পার হয় ঝোপ জঙ্গলগুলো। বাঁধে উঠেই সে গান ধরে—ভূতের ভয়ে মানুষ যেমন গান গায়। 'চাঁই' বোলিতে সে গায়,

সুন্দরা মুখড়াবালী বিজলী বা ধাড়িয়া
হামরে নজর লাগি যায় জী।।

'বিক্রমাদিত্য ও কুঁজো রাজা'র কাপে পিঠে কুঁজ বেঁধে ফজল ওই গান গায়। সুন্দর মুখ তাদের, চোখে বিজলীর ছটা—যেন পরী, সেই নারীদের নজর লেগেছে। কানে দেখতে গিয়ে কুঁজো রাজা হঠাৎ এই গান জুড়ে দিলে পাত্রপক্ষ তক্ষুনি থ। এ যে বদ্ধ পাগল রে বাবা!

ওস্তাদজী খিকখিক করে আপন মনে হাসে। তারপর গম্ভীর হয়। শিমুল গাছটার দিকে তাকায়। শকুন বসে আছে শূন্য শিমুল ডালে। যেন কী অসম্ভব কালো ফল ধরেছে অন্ধকার রাতের ওই গাছটাতে! ঝোপঝাড়গুলো যেন জেগে উঠে স্থির তাকাচ্ছে তার দিকে। পায়ের নিচে গঙ্গার জলে বিশাল নক্ষত্রের আকাশ যেন ঈশ্বরের মুখ হয়ে উঠেছে! টলতে টলতে গাছটার কাছে যায় সে। গুনগুনিয়ে ওঠে,

শিমুল তোর গুণের বালাই যাই
বিয়ের কাঁটা অঙ্গে গাঁথা গন্ধ মধু নাই।।

...ধুস শালা! অস্ফুটকণ্ঠে বলে চুপ করে যায় ওস্তাদ ঝাঁকসা। ঢপওয়ালী রে, তুই কার প্রেমে পড়ে পিছুপিছু এসেছিলি, এতদিনে জানা গেল। আমার মতন বুড়ো বটের কোটরে ছিল শান্তি নামে পাখির বাসা। তুই পাখিওয়ালী, পাখি ধরতে এসেছিলি।

ভিজে কাপড়ে টলতে টলতে সে হাঁটে।

সুখলতার ঘরেই যাবে এখন। গাঁয়ে ঢোকবার মুখে সুখলতার ঘর। ব্যাগের কাপড়টাও ময়লা। কাচিয়ে নিতে হবে। আর—

আর কী যেন। হঠাৎ এসেছিল কথাটা, হঠাৎ ডুবে গেল। মন যেন ওই গঙ্গার জল—মরুলা মাছের মতো ঝাঁক বেড়ায় ইচ্ছেভাবনার। এই দেখি মুখ, ওই দেখি—নাই! বাঃ রে বিধাতা, চমৎকার প্রহসন! আসরে দাঁড়িয়ে এই কথাটা কতবার না বলে সে। ফের বলল অস্ফুটকণ্ঠে। স্তব্ধ কালো নির্জন গ্রামের পথে ফের ভিজে পাম্পসুর ভারি আওয়াজ উঠতে লাগল। মাথার ওপর এত রাতে উড়ে গেল

বুনোহাঁসের ঝাঁক—শন শন শন শন! পদ্মার চর থেকে ওরা আনাগোনা করছে দূর উত্তর-পশ্চিমে ফরাক্কার বিলাঞ্চলে। পাথের পাশের শ্যাওড়াগাচে প্যাঁচা ডাকল একবার! ধুরে ভুট্টার ক্ষেতে শুয়ার তাড়ানো টিনের আওয়াজ হল।

...সুখবতী গে! হেই সুখিয়া! ওস্তাদ ঝাঁকসা চাপা গলায় ডাকে। খোলা উঠোন—পাটকাঠির বেড়া আছে দুদিকে। মধ্যেটা হাট করে খোলো। ছিটেবেড়ার ঘর, দরজার করাঘাত করে সে। নরম সুরে ফের ডাকে, অয়ি সুখি, মেরা বহু গে! সুখলতা!

ভিতর থেকে সদ্যজাগা অস্ফুট কণ্ঠস্বর। তারপর তীক্ষ্ণ চিলচিৎকার—কৌন রে?

...হাম গে বহু, সরকারজী। দরওয়াজা খুল ভাই!

আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে যায়। ভিতরে টিমটিমে লম্ফ জ্বলছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেজমোল্লান। শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। একটা স্তন পুরো অনাবৃত, অন্যটাও তদ্রূপ। গলায় রুপোর হাঁসুলী, নাকে মোটা নাকছাপি, কানবরতি অসংখ্য আংটা, হাতে বাজু, সুখলতা ভারী মুখে দেখছে চাঁইমোড়ল সরকারজীকে। অন্ধকার ছায়া পড়েছে মুখে। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওস্তাদ ঝাঁকসা।

হট ভাই। কাপড়া বদল না!

সুখলতার কোন কথা নেই মুখে।

আরে! ক্যা হুয়া তেরা বহু? দেখনা জাড়া লাগে বহুত! ওস্তাদ ঝাঁকসা আদর করে বলতে থাকে। ...তেরা লিয়ে কুছ আনেকা মতলব থা—লেকিন সব গোলমাল হো গাইলা রে! উও যো—

অতর্কিত গালে চড় পড়েছে ওস্তাদ ঝাঁকসার। ওস্তাদ হাত দিয়ে গালটা চেপে চাপা গরগর করে উঠেছে, তু মার দেইলা হো, সুখি, মুঝে তু চড় মার দেইলা!

কোন জবাব নেই। দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় সশব্দে—মুখের ওপর। ওস্তাদ হাঁসফাঁস করে বলে, ঠিক হ্যায় মেজকি! তব, তেরা সুটকেসমে মেরা কাপড়া থা—কাপড়াঠো তো দে। কাল গাহনা হ্যায় রাঢমে—হেই মোল্লান!

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ভিতরে দমকে দমকে কান্নার উচ্ছ্বাস। মেজমোল্লান বিছানায় পড়ে কাঁদছে। আরো বরকতক ডেকে সে আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নামে।

পথে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে যেন দিকে নির্ণয় করে নেয় ওস্তাদ ঝাঁকসা। সুখলতার বুকখানা তার স্তন দুটোর মতই কঠিন। শালীর বেটি শালী, কুত্তিন, খানকী বেশরম! দাঁতে দাঁতে চেপে গাল দেয়। নিজে মানীগুণী মানুষ—নয়ত ওর চুলের ঝুঁটি ধরে এই দুপুররাতে গঙ্গাপারে ছেড়ে দিয়ে আসত। লে বে ভাতিজারা, শকুনকা মাফিক খা লে খানকীকো।

বড়মোল্লান কমলবাসিনীর ঘরে আস্পষ্ট চেঁচামেচির আওয়াজ। জেগে আছে তাহলে। ছোট ছেলেটার নাকি খারাপ কী ব্যাধি হয়েছে—সারছে না। টাকাকড়ি তো দেয় ওস্তাদ—দিতে কসুর করে না। এমনকি মেজমোল্লানকেও দেয়।

সে কেসে সাড়া দিয়ে তারপর ডাকে, রাজু, বেটা রাজমোহন!

ভিতরে বড়বউর আওয়াজ। ...ফির মুতিস রে, ফির? হা ভগবান! নিদ মেরা লিয়ে না দিস তু! হট্, ইধার হট্। ...ঝাডু মাত রো বেটা। চুপ সে নিদ যা! কাল তেরা বাবা আয়েগা, না? কেতো আচ্ছা চীজ লাবে গা না মেলাসে! হাঁ...বহুত সুন্দর খেলোয়ারী, আওর মেঠাই, আওর......

ওস্তাদ ঝাঁকসা শোনে। আর ডাকতে ইচ্ছে করে না।

একটি শিশুর কণ্ঠ শোন যায়। ...মোট্টর লাবে গা বাবা, কিসিকো না দেগা হাম।

চৌদ্দ বছরের রাজমোহন জেগেছে এবার। ধমক দেয়, চুপ বে চুপ রহনা। নিঁদ না লাগে রে?

রাজু, বেটা! কাল গণেশকা সফর যানে লাগে রাঢ়সে! বোল না উসকো, শকরকন্দ লেকে তু ভি সাথ যানা! বলিস, থোড়া হ্যায়—এক মণ।

কব গে মা।

কাল সাঁঝমে গাড়ি ছোড়ে গা গণেশ।

মা? রাঢ়মে বাবাকা সাথ দেখা হো যায় তো?

একটু চুপ করে থেকে কমলাবাসিনী জবাব—বেটা! রাঢ় বহুত বড়া দেশ হ্যায়।

আস্তে আস্তে পিছন ফেরে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ডাক ওরা শোনেনি। ঈশ্বর, জোর বাঁচিয়েছ—ঈশ্বর, তুমি আছো। ...ধুস শালা! আছে যদি, তাহলে 'আলকেপে' হয় কেন মানুষ!

কখন অন্যমনস্ক হেঁটে প্রসন্নর বাড়ি চলে এসেছে। ভারি গলায় ডাকে, প্রসন্ন! প্রসন্ন রে!

প্রসন্নর এখানেও সে থাকবে না। কিছু টাকা দিয়ে যাবে ওকে—বড়মোল্লানকে যেন পৌঁছে দেয়। আর—রাজু, রাজুকে যেন রাঢ়ে যেতে নিষেধ করে। ওস্তাদ ঝাঁকসার পুত্র রাঢ়ে শকরকন্দ আলু ফেরি করে বেড়াবে? ছি ছি! তা অশোভন। বরং এবার বেশি-বেশি টাকা দেবে, নিয়মিত দিতে থাকবে।

পরক্ষণে চমকে ওটে। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। আর বায়না দেবে তো লোকে? শান্তি নেই—চারদিকে রটে গেছে। চন্দ্রজুয়াড়ীর মতে লোক—সেও কম টাকা দিয়ে বসল! সুবর্ণর মতো ছোকরা হাতে থাকলে অবশ্য বয়ানার অভাব হবে না। কিন্তু সুবর্ণ—সুবর্ণ যতটা নয়, ওই সনাতন মাস্টার তা চায় না, চাইবে না। এটা সে স্পষ্ট টের পেয়েছে। লোকটা 'সিনেমা' শেখাবে ছোকরাটাকে। তাছাড়া ওদের ম্যানেজারটাও ভারি দেমাকী লোক; আহ্লাদে মাটিতে পা পড়ে না। বিদেশে এসে জাঁক বেড়ে গেছে। ভাবছে, তাদের দল কেন ঝাঁকসা ওস্তাদের অধীনে থেকে গান করবে?...তাছাড়া আরও ব্যাপার আছে। যত ভাল ছোকরাই হোক, সুবর্ণ শান্তি নয়। শান্তি ছিল তার তৈরি জিনিস—সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত সে টের পেত। সুবর্ণ ওস্তাদ ঝাঁকসার ভাষা বোঝে না!

সুবর্ণর আশা করা বৃথা। পরের ঘরে দামী রত্ন যদি বা—আমার তাতে কী? হাতেকোলে যতগুলো মানুষ করব, একদিন না একদিন বুকে 'হস্তা' দিয়ে পালাবেই! হত যদি নিজের ছেলে, তাহলে......

পাগল! তা হয় না। অসঙ্গত, অন্যায়, অধর্ম!

ওস্তাদ ঝাঁকসা ফের ডাকে, প্রসন্ন রে, হামি সরকারজী। ঝাঁকসু সরকার। নিকাল বে!

পরের রাতে মদনপুর গোহাটের বিরাট আসরে যে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, সে ভিন্ন মানুষ। সে আসরের মানুষ। কার সাধ্য তার গায়ে হাত দেয় কেউ, কার ক্ষমতা আছে, 'ঠেস' মেরে বসিয়ে দেয়। নাম শুনেই পদ্মার এপার—অজয়-ময়ূরাক্ষী-দ্বারকা-গঙ্গার কঠিন রাঢ়মাটি স্পন্দিত হয়। নেচে ওঠে!

আজব তামাসা দেখতে লোক ভেঙে পড়েছে। শান্তিচরণের বিপক্ষ দলে আজ স্বয়ং ওস্তাদ ঝাঁকসা। সে শান্ত গম্ভীর মুখে 'ছড়া গান' ধরেছে,—এই প্রথম অন্যের বানানো গান গাইছে ওস্তাদের রাজা—সোনা মাস্টারের বাঁধানো পদ :

আজ আমার কী আনন্দ দেখলাম রে
নভে নবীন চাঁদের উদয়।

খচ্চর ফজল ধুয়োটার দোহারকি করতে গিয়ে কালি পালটে নিচ্ছে—দেখে শান্তি চাঁদের উদয়, ওগো, দেখে শান্তিচন্দ্রের উদয়। আর ওস্তাদ তা শুনে সবার অগোচরে ওর কোমরে লাথি মেরেছে।...

কতক্ষণ পরে প্রথম পাল্লা শেষ। ফজল কানে কানে বলে, এবার চলেন জী। যাই। ওস্তাদ ঝাঁকসা ওঠে। বাইরে যায়। যেতে যেতে শোনে, শান্তিচরণ গান ধরেছে :

দেখা হল, ভাল হল, জুড়াল জীবন।
সুখে—আছো তো এখন
ভাল—আছো তো এখন।

অশ্লীল গাল দিতে দিতে হাঁটে ওস্তাদ ঝাঁকসা। বাইরে একেবারে মাঠের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। একটু পরেই ফজল আসে। ফিসফিস করে বলে, ওইখানে —মাঠের মধ্যে একটা পুকুরপাড় আছে। ওখানে অপেক্ষা করতে হবে! চলেন, আঁটঘাট সব ঠিক আছে। ভানুদের সব বলা আছে। সুবিদ হোসেন কাছেই থাকবে। গোলমাল বাধলে ওদের দলটাকে নিয়ে যাবে নিজেদের আড্ডায়। আর...কেউ তো জানতে পারছে না—কী থেকে কী হল। ভানুদের কোন ক্ষতি হবে না।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কোন কথা বলে না। ফজলের পিছনে হাঁটে সে। মনের মধ্যে শান্তির ছবিটা ভাসছে। 'মোহিনীচিত্র' —হাসছে, নাচছে, গাইছে। আঃ, কান থেকে ওর কণ্ঠস্বর ওর সুর কিছুতে মোছে না। সেই শান্তি! সেই মুখ, সেই সুন্দর শরীর, সেই অপরূপ হাসি আর ভ্রূভঙ্গি আর কটাক্ষ! বুকে আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। খুন চেপে যাচ্ছে মাথায়। না দেখলেই বরং ভাল ছিল। কেন এ দুর্মতি হল তার?

...সলিম লোকজন নিয়ে তৈরি আছে। ঠিক সময়ে গোলমাল লাগিয়ে দেবে। তারপর—

ফজলের কথা যেন হঠাৎ দুর্বোধ্য লাগে ওস্তাদ ঝাঁকসার। এ সব কী বলছে ফজল? সে ধমক দেয়, চুপসে চল বে।

সলিম—বাঘড়ীর দুর্ধর্ষ গুণ্ডা খুনে আর ডাকাত। পুলিশের একগাদা পরোয়ানা ঝুলছে মাথায়। ধরতে পারে না ওকে। চন্দ্রজুয়াড়ীর পক্ষপুটে দিব্যি কাটাচ্ছে সুখে। সে আজ শান্তিকে আসর থেকে তুলে আনবে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কাছে হাজির করে দেবে। তারপর শেষরাত্রের ট্রেনে মুরারই থেকে আজিমগঞ্জ হয়ে জঙ্গীপুর। সলিম বলেছে, কত শালার পালিয়ে যাওয়া মাগকে বাপের বাড়ি থেকে ধরে এনে মরদের ভাত খাওয়ালাম। এ তো ছোকরা!

পালিয়ে যাওয়া বউ ধরে আনাও ওর পেশা। সলিম সব পারে। দেশের সবখানে ওর দলের লোক—অনুগত বিশ্বস্ত চেলারা রয়েছে। সলিমডাকাত জেলার আতঙ্ক। তার বন্দুক আছে, বোমা আছে।...

তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে গেছে পশ্চিমের আকাশে। ঘন কালো অন্ধকার কিছুক্ষণ। ফাঁকা নির্জন মাঠে পুকুরপাড়ে—ঈশানকোণে ওস্তাদ ঝাঁকসাকে একা বসিয়ে রেখে ফজল চলে গেল। আস্তে আস্তে দৃষ্টি স্পষ্ট হচ্ছিল ওস্তাদ ঝাঁকসার। দূরে হাটতলায় আসরের আলো দেখা যাচ্ছিল।

একসময় হঠাৎ চমকে ওঠে সে। দূরে অস্পষ্ট গোলমালের আওয়াজ যেন। বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকে। উঠে দাঁড়ায় সে। কান পাতে। হাটতলা উত্তরপশ্চিম কোণে। দক্ষিণ থেকে বাতাস আসছে। স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু ও আওয়াজ গানের নয়—তা ঠিক।

কেন সুবিদ হোসেনের শলা মেনে নিল সে? ছি, ছি, জনসাধারণ শুনলে লজ্জায় মুখ দেখানো দায় হবে। কোন মুখে বড় বড় কথা বলবে আসরে?

পরক্ষণে মনে হয়, যদি সত্যি শান্তি বশ মানে!

চুপচাপ শান্তভাবে অপেক্ষা করে ওস্তাদ ঝাঁকসা। আসুক আগে—সামনে হাজির করুক ওরা। তারপর দেখা যাবে।...

ফের চমকায়। উঠে দাঁড়ায়। চষা জমির ওপর কাদের দুদ্দাড় শব্দে ছুটে আসা যেন। হাঁফাতে হাঁপাতে ওস্তাদ বলে ওঠে, কে, কে আসছে?

একটা দেহ—ব্লাউজপরা, বেণীবাঁধা চুল, নিশ্চুপ দেহ নামিয়ে দেয় কয়েকটি মানুষ। হাতে লম্বা লাঠি। ফজলও আছে সঙ্গে। হাঁটু দুমড়ে দেহটার পাশে বসে সে। বেণীটা খামচে ধরে। বলে, ওঠ শালার ব্যাটা শালা!

একটু ককানি—অস্ফুট আওয়াজ, উঃ মাগো! তারপর ফের চুপচাপ।

ওস্তাদ ডাকে, সলিম, সলিমভাই!

ফজল বলে, সলিম ইস্টিশানে থাকবে।

ওস্তাদ বলে, ফজল, তোরা হাঁটতে থাক। আমি একে দুটো কথা বলব। তারপর তোদের সঙ্গ ধরব। তোরা এগো।

ফজল বলে, না না ওস্তাদজী! পালিয়ে যাবে—চেঁচাবে!

ওস্তাদ ঝাঁকসা গর্জে ওঠে। ...চুপ শুয়ারকা বাচ্চা! হামি মর্দানা না স্ত্রীলোক বে! যা, তোরা এগো!

দলটা চলে যায়। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় অন্ধকার মাঠে।

ওস্তাদ ডাকে, শান্তি! আবে শান্তি! ওঠ! উঠে বস। আমি আছি—তোর ওস্তাদ, ওঠ!

শান্তি আস্তে আস্তে ওঠে। পা দুমড়ে বসে থাকে অবিকল মেয়ের মতো।

...ওপরে আকাশে, নীচে মাটি—এ এক কালরাত্রি শান্তি রে! ...ওস্তাদ বলতে থাকে। ...এ আমি চাইনি। বিশ্বাস কর, চাইনি। তবু এ অন্যায় আমার করতে হল। কেন করতে হল? না—তুই আমায় এই কালরাত্রির মতন অন্ধকার করে ফেলেছিস। ...শান্তি, তোর সঙ্গে গান আর আমি করব না। তোর মুখও আর দেখব না। শুধু একটা কথা জানবার সাধ ছিল। সেটা জানতে চাই। জবাব দিবি?

শান্তি কাঁদছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

না, তোর জানের ভয় নাই। তোকে মারব না! শুধু বল, কেন পালালি?

শান্তি নিরুত্তর।

আমার ভয়ে?

হুঁ।

একটু চুপ করে থেকে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, ঢপওয়ালীকে তুই অশুচি করেছিস। আমি জানি, সে দোষ তোর নয়। সে তোকে কুপথে টেনেছিল। এও জানি, তোর জন্যেই সে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। শান্তি, ঢপওয়ালী বিষ খেয়ে মেরেছে। মরার পর যদি এমনি করে তার সঙ্গেও দেখা হত, তাকে জিগ্যেস করতাম—কেন সে বিষ খেল? সেও কি আমার ভয়ে? আমি কি এমনি ভয়ানক জীব রে শান্তি? নাঃ, এর কোনটাই সত্যি নয়। কী সত্যি?

শান্তি নাক ঝাড়ে সশব্দে। শাড়ির আঁচলে মোছে। তারপর ছ্যাৎরানো কণ্ঠস্বরে বলে, গঙ্গাদি মরেছে, আমিও শুনেছি। তবে আমি জানতাম, গঙ্গাদি অমনি করে মরবেই—একদিন না একদিন। আপনাকে সাহস পাইনি বলতে।

কেন রে শান্তি?...ওস্তাদ ঝাঁকসা ঝুঁকে আসে ওর মুখের কাছে।

শান্তি বলে, আপনি ভুল বুঝছেন ওস্তাদ। গঙ্গাদি আপনার টানেই এসেছিল। কিন্তু ওকে ছেড়ে আপনি আমার কাছে শুয়ে থাকতেন—ও সারারাত ঘুমোত না। আমি দেখেছি। আপনি আমাকে চুমো খেতেন—গঙ্গাদি নিজের চোখে দেখেছে বলত। আমাকে গাল দিত। শাপ দিত সারাক্ষণ। ভয়ে বলতে পারতাম না আপনাকে। ...আর সেদিন সকাল থেকে ওর চোখমুখ দেখেই বুঝেছিলাম একটা কিছু হবে। বিকেলে আমাকে ডাকল, চল, বেড়িয়ে আসি গঙ্গার পাড়ে। বেড়াতে গেলাম। হঠাৎ গঙ্গাদি...

বুঝেছি। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে।...

শান্তি থামে না। বলে, হঠাৎ গঙ্গাদি বললে, তোর কাছে এমন কী মধু আছে রে ছোঁড়া, পুরুষ হয়েও পুরুষকে মাতিয়ে রেখেছিস? তারপর হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে লাগল। তারপর...

হুঁ, হুঁ...

শেষে বললে, দেখলাম, তুই আরো পাঁচটা পুরুষের মতো পুরুষ—না কী অন্য কেউ। বললে, তুই তো খাঁটি পুরুষ রে ছোঁড়া! তবে কেন তোকে নিয়ে এত

মাতামাতি? ওস্তাদজী, সেদিন আমার সঙ্গে কুকাজ না করলেও গঙ্গাদি বিষ খেত! আমার কোন দোষ নাই।...ফের কেঁদে ওঠে শান্তি। নাক ঝাড়ে। বিকৃত কণ্ঠস্বরে কাঁদে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, হুঁ। আমায় স্মরণ করতে দে। সে রাতে আমি গঙ্গামণির কাছে শুলাম। গঙ্গামণি জড়িয়ে ধরল। বড় ক্লান্ত ছিলাম। আর—কতদিন থেকে নারীসঙ্গ আমার ভাল লাগে না! তেতো লাগে সব! হাঁ, হাঁ—গঙ্গামণি বললে, আমি শান্তি হলে তো মুখে মুখ দিয়ে শুয়ে থাকতে! হাঁ—তাই বললে বটে! আসলে খুব ঘুম পেয়েছিল আমার—কালঘুম রে শান্তি! কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! অথচ—আহা! কত আশা ছিল মেয়েটার! দেহের আশা—মনের আশা।

কতক্ষণ চুপচাপ দুজনে। তারপর জোরে কেঁদে ওঠে শান্তি। ...আমি কী করব ওস্তাদ?

তুই—তুই...কথা খোঁজে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ...শান্তি, আমি—আমি আর গান করব না রে! করব না। বড় অশান্তির আগুন মনে। বিবাহ করেছি। এখনও দুই বহু ঘরে। পুত্রকন্যা আছে। আমি বাবা রে শান্তি—তবু সব ভুলে হঠাৎ গর্জে ওঠে সে। ...সব ভুলে তুই হারামী পুরুবেশ্যাদের ভাগাড়ে রাহুচণ্ডাল সেজে বসে আছিস! কেন তোদের জন্ম হয়েছিল রে গিদ্ধড়ের বাচ্চারা! লজ্জা করে না শালাদের মাগী সাজতে? যা, ভাগ শালার ব্যাটা শালা! তোদের মুখ দেখলে সামনে নরক জ্বলে। যা, যা, পালাঃ!

সারাপথ মূর্ছাহতের মত এসেছে লোকটা। সলিম আজিমগঞ্জ স্টেশনে কেটেছে দলবল নিয়ে। ফজল বিষণ্ণমুখে—ঠিক বানরের মত বসে থেকেছে বেঞ্চে। জঙ্গীপুরে গাড়ি থামলে ভোর হয়ে গেল।

রিকসো চেপে দুজনে আসছে। রঘুনাথগঞ্জ বাজারে এসে রিকসা থামায় ওস্তাদ। বলে, কিছু কেনকাটা করব ফজল।

ফজল বলে, কী কিনবেন জী?

কিছু খেলনা কিনব। কিছু সন্দেশ। কাপড়চোপড়। আয়।

কেনাকাটা শেষ করে ঘাটের দিকে চলে ওরা। যেতে যেতে ফজল বলে, সত্যি গান ছেড়ে দেবেন জী?

ওস্তাদ ঝাঁকসা জবাব দেয় না।

ফজল বলে, আমার ছেলেটা—এগারো সনে পড়ল। সুন্দর চেহারা। তাকে যদি ছোকরা করি? আপনি হুকুম দেন ওস্তাদজী, ছোকরা হলে তো আপনার বা আমার ইয়ারকি চলবে না! শুধু গানের দরকার, পাটের দরকার—আসরে যা দরকার। ছেলের সঙ্গে পাট করতে দোষ নাই জী। অভিনয়শাস্তর—আপনিই তো বলেন। ঠিক পারবে। গলা ভাল—দেহও ভাল।

ওস্তাদ ঝাঁকসা শুধু হাসে।

আসর শুরু হবার আগে কালাচাঁদ খুড়ো কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমূর্তি হয়ে ওঠে। তখন সে কালা গুণিন। যেন সাপের চোখে রক্তছটা, রুক্ষু চুল আলুথালু, কপালে সিঁদুরের ছোপ—সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। কেউ বললেও জবাব দেয় না। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ তোলে, তারপর বাদ্যযন্ত্রগুলো দেখাতে থাকে, তারপর সুবর্ণর পা থেকে মাথাঅব্দি দেখে নেয়। বিড়বিড় করে কী বলে। আড়ালে অবশ্য দলের সবাই হাসাহাসি করতে ছাড়ে না। সুবর্ণ তো পয়লা নম্বর অবিশ্বাসী। মুখ ঘুরিয়ে ফিকফিক করে হেসে ফেলে। টের পেলেই কালা গুণিন তখন গর্জে ওঠে, মরবি, তু মরবি সুবন্ন!

অমনি করে দলের প্রত্যেকের আর বাদ্যযন্ত্রগুলোর "দেহবন্ধন" করে দেয় সে। এই গুপ্তবিদ্যা তাকে নাকি দিয়ে গিয়েছিল তার মকু ওস্তাদ। সনাতনকে বলেছিল, কাপাসখালি-বিবিগঞ্জের মকবুল ওস্তাদের নাম আপনি শোনেন নি, বাবা। আজ তিনি গত। তেনার কাছে কোথা লাগে আপনাদের ওই ঝাঁকসু-টাকসু। কামিখ্যেয় গিয়ে ডাকিনীদের কাছে শিক্ষা ছিল ওস্তাদমশায়ের। আহা হা, কোথা ফেলে এলাম সেই ওস্তাদের রাজা বিদ্যেধরকে! হুঁ গো! গন্ধর্ব-কিন্নর-বিদ্যেধর তিনজনা ছিলেন একদেহে।

বিদ্যেধরের বিদ্যে পেয়েছিল এক সরলসুবোধ বাউরী কিশোর—তার সেই মোহিনীরূপটাই বা কোথা গেল গো। এ যে শুধু খড়-বাঁশের টাটখানি বয়ে মরছি। আহা হা।...

তখন মনকির ওস্তাদের দল আসরে চলে গেছে। সাঁওতাপাড়া দল তৈরি হয়েছে আসরে যেতে। সবে কালা গুণিন তাদের 'দেহবন্ধন' কর্ম সেরে পাঁচিলের বাইরে হনহন করে এগোচ্ছে। দুপুরে চাপাচাপি খেয়ে পেটে এতক্ষণে প্রচণ্ড বেগ লেগেছিল। তাই অন্ধকার আড়ালের দিকে টোক্কর খেতে-খেতে হন্তদন্ত চলেছে সে। মেলার উজ্জ্বল আলোয় বুড়োর চোখদুটো ধেঁধে গিয়েছিল বুঝি—দীঘি খুঁজে হন্যে কালা গুণিন বিশাল কালো গাছের নিচেই বসে পড়েছে।

হঠাৎ কী শোনে সে। শুনে ফেলে চখিয়ে ওঠে। কান পাতে। পেটের বেগটা আস্তে আস্তে উবে যায়। কতক্ষণ অন্ধকারে জন্তুর মতন নিঃশব্দে বসে থেকে সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সরে আসে আলো লক্ষ্য করে। পাঁচিলের কাছে এসে অনুচ্চস্বরে ডাকে, নফর, বাবা নফর আলি!

দল তখনও আসরে যায়নি। গেটের কাছে জটলা করছে। ম্যানেজার আমির কালা গুণিনের ডাকটা শুনতে পেয়েছিল। সে একটু এগিয়ে এসে গল চড়িয়ে বলে, খুড়োর আর সময়-অসময় নাই। টর্চবাতিটা নিলেও পারতে। ওরে নফরা, যা—খুড়োকে ঘাটে লিয়ে যা।

স্বয়ং আমিরের গলা শুনে খুশি হয়েছে কালাচাঁদ। ...বাবা আমের! ডাকে সে। ...নফরা থাক। তুমিই এসো গো, পেয়োজন আছে। পেচণ্ড পেয়োজন।

এই 'শুদ্ধকথা' শুনে আমির আলি চমকে উঠেছে। হুঁ, কালা খুড়ো নিশ্চয় কিছু গুহ্য

জরুরী কথা বলতে চায়। কিছু গুরুতর ঘটেছে। আমির আলি হুঁশিয়ার ম্যানেজার। দল ঠিক রাখতে তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। ঝিঝিডাঙ্গার আসরে এসে দলের নাম-সম্মান চারডবল বেড়ে গেছে। এই সম্মান-খ্যাতি অতিশয় যত্নে রক্ষা করতেও প্রস্তুত সে। তার রাশভারি চালচলন বেড়ে গেছে। হুঁ, সে আসরপিছু ষাট টাকা 'পয়ানের' (দরের) দলের ম্যানেজার—যা তা কথা লয়, বাবা। অবশ্য এ হচ্ছে নফর আলির মন্তব্য।

কালাখুড়োর কণ্ঠস্বরে কী যেন গুরুতর ঘটনার আভাস। শিউরে উঠেছিল আমির। কদিন থেকে সে লক্ষ্য করছে, সোনামাস্টারের সঙ্গে সুবর্ণটা আবার বড় বেশি মাখামাখি শুরু করেছে। আর তাই নিয়ে যেন দলের সবাই কেমন হিংসুটে হয়ে পড়েছে। এটা ভাল নয়, ইটা ভাল লয়। ...কালাখুড়ো অভিজ্ঞ মানুষ। সে তাকে দুএকবার হুঁশিয়ার করেও দিয়েছে। ওই কিনা দল ভাঙবার বিষকুট। ওস্তাদ হোক, মাস্টার হোক, হারমোনিয়ামদার বা তবলচী হোক—নাচিয়ে ছোকরা সবার সঙ্গে সমান মিশবে। কারো সঙ্গে বেশি ঢলাঢলি নয়। সুবর্ণ মাত্রা ছাড়াচ্ছে। আমির জানে, সোনামাস্টার বাউণ্ডুলে লোক—তার ইহপরকালের ভাবনা নেই। কিন্তু অন্যেরা সবাই একই গাঁয়ের লোক, দুবেলা মুখ দেখাদেখি, ওঠাবসা। তাদের কেউ চটলে দল টিকবে না।

তাই আমির শুধু চমকায়নি, রেগেও উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। তার বড় সহজে রাগ আসে। সেই রাগ মাথায় নিয়ে সে পা বাড়ায়। কী গুহ্য কথা তাকে বলবে কালা গুণিন? হঠাৎ একবার দাঁড়িয়ে সে আলোঅন্ধকারময় প্রাঙ্গণটা ও দলের লোকগুলোকে দেখে নেয়। ফের চমকায়। সুবর্ণ কই? সোনামাস্টারও তো নেই! তাহলে কি দুজনে এখন অন্ধকার আড়ালে......

ঘৃণায় রি-রি করে জ্বলে উঠেছে আমির আলি ম্যানেজার। ...ওয়াক থুঃ। শালার শয়তান দুটো। থুঃ- থুঃ! ...একদলা থুথু ফেলে সে এগোয় কালাখুড়োর দিকে। সেই সময় নফরআলি তার পিছনে এসে গেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে চাপা হাঁকরায়—খবর্দার! কোথা যাবি রে শালার বেটা শালা। ভাগ! বাদ্যযন্ত্রর কাছে বসে থাক গে।

বিরসমনে 'বাহক' নফর আলি পিছিয়ে যায়। একলা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাদ্যযন্ত্রের কাছে। গভীর পরিতাপে তার মনটা কয়েকমুহূর্ত ভেঙে পড়তে থাকে। কেন সে কারণঅকারণে সবার ধমক খাবার জন্যে দলে এমনি করে পড়ে রয়েছে? সে গান গাইতে পারে না, নাচতে বা পার্ট করতেও জানে না—শুধু যন্ত্র বাইবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এইসব নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষগুলোর সঙ্গে! পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে দল থেকে। রাতের পর রাত জেগে আর শরীর চলছে না যেন। একলা দুখিনী মায়ের একলা ছেলে সে। মা তার জন্যে কেঁদে কেঁদে হয়তো অন্ধ হতে চলেছে। এমন সমর্থ যোয়ান ছেলে থাকতে মাকে এখনও পথে পথে রোদবৃষ্টিতে কাঠকুটো শাকমাছ খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে! ধিক আমাকে গো, শত ধিক এই নফর আলিকে!...

কত ঠাণ্ডা রাতের আসরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে সে ভেবেছে দূর গাঁয়ে তখন এক হতভাগিনী দুখিনী বুড়ির ঘরে অমৃত আরাম! কত স্নিগ্ধ উষ্ণতা আর স্নেহময়

কণ্ঠস্বর : বাপ নফর আলি, জাড় লাগে রে! ...না, মা না। ...ছেঁড়া কাঁথা ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে বুড়ি বলেছে : কাছে সরে যাই, বাপ। ...আয়, মা। কাছে আয়—হুঁ, আর জাড় নাই। মাগো, আর জাড় লাগে না আমার।

তখন সেই হিম শীতের ডাইনীর চুল ছড়ানো মৃত্যুময় রাতে সেইসব স্বপ্ন তাকে ব্যাকুল করেছে। পালাবে, পালিয়ে যাবে দল থেকে।

অথচ তখনই হঠাৎ বেজে ওঠে কাদের আলির নিপুণ যন্ত্রী আঙুলের নাচে ছন্দেছন্দে সুরের ঝংকার। মোহিনী নটী সুবর্ণ পায়ের জং বাজিয়ে দুলেদুলে রচনা করে অপরূপ প্রতিভাস। তবলচী ডুবু মাথা ঝুঁকিয়ে তবলায় বোল তোলে, ধেগে নাকে নাকে তিন...ধেগে নাকে নাকে তিন...এবং সুবর্ণ গায় :

এখনও রাত যায়নি কেটে, ডাকেনি ভোরেরো পাখি।

দুখিনী মায়ের ছেলে নফর আলি তখনই সোজা হয়ে বসে। হঠাৎ বেসুরো গলায় দোহারকিদের সঙ্গে গলা মেলায়। ঝিমন্ত নন্দঠাকুরের হাত থেকে কত্তালজোড়া কেড়ে নিয়ে বাজাতে চেষ্টা করে। চেঁচিয়ে ওঠে : বহুত আচ্ছা ভাই রে! এ রাত পোহাবে না, এ রাত ভোর হবে না!

হুঁ, এ বড় মায়া। ঝাঁকসু ওস্তাদ বলে গেছেন বটে। বড় মায়ের বাঁধা পড়ে গেছে গঙ্গাপদ্মার ওপার পল্লীগ্রাম! নফর আলির সাধ্য কী পালায়! সে চুপিচুপি ঘুমন্ত সুবর্ণকে ছুঁয়ে থেকেছে। আসরে সেজে থাকবার সময় সুবর্ণর আঁচল তার গায়ে ঠেকলে পরম আরামে জুড়িয়ে গেছে তার দেহের গোপন যত জ্বরজ্বারি। আরো একদিন আমিরের হাতে কী কারণে চড় খেয়ে তার চোখে জল এসেছিল, একলা চুপিচুপি কাঁদছিল, তখন সুবর্ণ তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিল বটে। আহা, কী সুখ, কী সুখ গো নফর আলি 'বাহকে'র!

আজও একটা কষ্ট ঠেলে এল তার গলার ভিতর ম্যানেজারের অকারণ গালমন্দে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এবার আর নয়। কক্ষনো না। সে এবার নির্ঘাৎ পালাবে। তখন কে অতসব যন্ত্রপাতি মাথায় বয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ রাস্তা ঠ্যাঙায়, দেখা যায়। হুঁঃ, পেয়েছিলে এই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নফর আলিকে! এবার ঠেলা বুঝে নিও।...

ওখানে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে আমির বলে উঠেছে, কী কালাখুড়ো, কী?

কালাখুড়ো খাটো ধুতির কাছাটা হাতে ধরে গুটিয়ে রেখেছে কাপড়-চোপড়, নির্ঘাৎ শৌচকর্ম বাকি আছে, ফিসফিস করে শুধু বলে, বড় গুরুতর বাবা, পেচণ্ড!

আমির রেগে যায় আরো। ...লে মজা! বলবে তো বাপু!

কালাচাঁদ হঠাৎ হাঁটতে থাকে। দীঘিটা আবিষ্কার করে নিয়েছে বোঝা যায়। সে হাত তুলে ইসারায় আমিরকে অনুসরণ করতে বলে। আমির উত্তেজনায় ছটফট করে এগোয়। কী বলবে কালা গুণিন? যা বলবে, তা তো টের পাওয়া গেছে। আলকাপদলের সেই কুখ্যাত পাপ আক্রমণ করেছে এতদিনে। অশুচিতা ছুঁয়েছে দলটাকে। এ দল এবার খতম হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে—সুবর্ণকে নয়, সোনামাস্টারকে তাড়াবে ম্যানেজার। আগেরবার ইসারা ইঙ্গিতে প্রায় তাড়িয়েছিল।

ঝাঁকসু ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা না হলে আর ওকে দলে কখনো আনত না। যাক গে, সুবর্ণ একা একশো।

টর্চবাতি জ্বালো। ঘাট দেখে লিই। ...কালাচাঁদ বলে।

আমির লম্বা মস্তো টর্চটা জ্বালে এতক্ষণে। দীঘির ঘাটের পুরানো ধাপগুলো ঝকমক করে ওঠে। শ্যাওলায় পিছলে পড়ার ভয়ে পা টিপে টিপে কালাচাঁদ সাবধানে জলে গিয়ে নামে। তারপর বলে, বাস, বাস! নিবিয়ে ফেলো বাপু।

যেন কিছুটা দেরি করেই উঠে আসে কালাচাঁদ। কাছে এসে কাপড়টা ঝেড়েঝুড়ে ভাল করে পরে নেয়। তারপর বলে, সময় আছে। ...বসো এই চত্বরে। বিড়ি দ্যায়নি লায়েকমশাইরা? দাও একটা।

অধীর আমির আলি পাশে বসে পড়ে। নিজে একটা সিগ্রেট ধরায়। খুড়োকে অবশ্য বিড়িই দেয়। আগুন জ্বেলে দিয়ে দেখে কালাচাঁদ গুণিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। চমকে ওঠে আমির। এইসব সময় কালাচাঁদকে কেমন যেন মনে হয়।

সে খুব আস্তে বলে, কথাটা বলছ না গুণিনখুড়ো।

কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ বিড়ি ফোঁকার পর অনেকটা ধুঁয়ো ছেড়ে কালাচাঁদ গম্ভীর হয়ে ডাকে, আমের আলি!

হুঁ, গুণিনখুড়ো। বলো।

কথাটো গুরুতর।

জানি। মাস্টারটাকে আমি কালই তাড়াব। ও আমার দল ভেঙে ফেলবে, খুড়ো।

কিন্তু বাপ আমের আলি, ...খিকখিক করে আচমকা হেসে ওঠে কালাচাঁদ। দুলে দুলে আপন মনে হাসে।

আমির ক্ষেপে গিয়ে বলে, হেসো না—হাসির কথা নয়। দল ভেঙে যাবে।

কালাচাঁদ মুখ তুলে ওর কানের কাছে আনে। তারপর বলে, দল ভাঙবে না গো—সোনাওস্তাদ নিজে ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, সেইরকম লক্ষণ। আমার কপালে আরেকটা চোখ আছে, আমের। সেই চোখে দেখছিলাম কদিন থেকে। এখন আরও পষ্ট দেখলাম। হ্যাঁ বাবা, সোনাওস্তাদের নিদেন হয়েছে। তবে তোমার কথাও ফ্যালনা লয় বাছা। বড্ড তরাস পেয়েছি মনে। জানাজানি হলে পরিণামে দলকেই ঠেঙিয়ে তাড়াবে ঝিঝিডাঙ্গার লোক। অখ্যাতি ছুটবে।

আমির কান খাড়া করে শুনছিল। কিছু বুঝতে পারছিল না। সে বলে, খুলে বলবে তো খুড়ো। কী দেখলে? কী করছিল সোনামাস্টার?

গম্ভীর কালাচাঁদ বলে, হুঁ, করছিল কিছু একটা। সেটা ঠিকই।

কার সাথে? সুবর্ণর?

অ্যাঁ, সুবন্ন? ...মৃদু হাসে কালাচাঁদ। ... লা, লা। সুবন্ন লয়, মেয়ে গো মেয়ে। মেয়েছেলে বটে। সেদিন কার বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে এল ওরা—সুবন্ন আর ওস্তাদ, সেই বউটা—জান বাবা আমের আলি? সেই বউটাকে লিয়ে রঙের খোলায় ভাসতে দেখলাম সোনা ওস্তাদকে। তোমার দিব্যি, চক্ষের কিরে। হুই বাগানের মধ্যে ওরা জোড় বেঁধেছে।

আমির হাসে এবার। ...যাঃ এই! আমি ভাবলাম—

কিন্তু জানাজানি হলে বিপদ আছে, বাবা আমের।

তা অবশ্যি আছে।

সোতরাং? ...কালাচাঁদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটু ভেবে আমির বলে, বউটা নাকি এ-গাঁয়ের পণ্ডিমশায়ের বউ। মাস্টারের স্বজাতি—একই গাঁয়ের মেয়ে। হুঁ, মাস্টারকে সাবধান হতে বলব—বুঝলে খুড়ো? এখনও পর-পর ক'রাত বায়না দিয়েছে মেলায়। খুব জমিয়ে দিয়েছি কি না!

আরেকটা বিড়ি দাও, বাপ্।

পরে খাবে খুড়ো। আবার তো কেসে-কেসে কাহিল হবে খালি।

না রে সোনা, দে একটা।

নাও তবে, কেসে মর। হাঁফের অসুখ বাড়ুক। ...আমির বিড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়। কালাচাঁদ বসে থাকে। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। শরীর শীতল হয়ে যাচ্ছে। আঃ, এ বয়সে রাতজাগা আর ভিড়ের ধকল সইতে পারছে না শরীরটা। মাঝে মাঝে এত ক্লান্তি লাগে। ওরা বলে, দুপুরে খেয়ে যখন খুড়ো ঘুমোয়, হাঁ করা মুখ দেখে মনে হয়—যাঃ, মরে গেছে লোকটা। চল এখন, আসর ফেলে গঙ্গা দিয়ে আসি! ..বড় ভয় করে কালাচাঁদের। বুক কাঁপে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে—হঠাৎ এক রাতের আসরে হাজার জনমানুষ—বিমুগ্ধ শ্রোতার ভিড় ঠেলে এসে গেল কালান্তক মহিষবাহন দেবতা, চোখ পাকিয়ে বলল—ওঠ্ রে বাছা, লিয়ে যাই। কোন বিদোধর বগাবগীর বান ছেড়ে তাড়াবে তাকে? হেই বাবা দেবতা, এটু কিরপা কর—আর একটা আসর যেতে দাও! আহা, দলের শোভা পদ্মর পাপড়ি ফোটার মত একটা করে ফুটছে। গন্ধ মউ মউ করছে পিথিমীতে। এতসব ভক্ত মানুষজনের চোখের সামনে যে পায়ে জং বেঁধে নাচছে, ওকে কি তোমরা চেন? না--ওর নাম সুবন্ন নয়—ওই, ওই কালাচাঁদ। কিন্নরকণ্ঠি ছ্যাঁচড়াদলের 'বালক' কালাচাঁদ! অভাজন বাউরীকুলে এক কিন্নরের জন্ম হয়েছিল—তাকে তোমরা ভুলো না বাবাসকল। সে এখনও বেঁচে আছে। এখনও পায়ে জং বাজিয়ে নেচেনেচে গাইছে সে আলোময় জনমণ্ডলীর চোখের তারায়, সামিয়ানার নিচে এবং পঞ্চাশ বছর আগের সেই মাথার ওপরকার তালপাতা বা খেজুরপাতার ছেঁড়া পাটির সামিয়ানা আর টিমটিমে হেরিকেনগুলো আজ হয়ে উঠেছে লাল ফুলকাটা ধবধবে স্নিগ্ধ বিশাল থানের চন্দ্রাতপ, আর হ্যাজাগ-ডেলাইট জ্বলছে শনশন উজ্জ্বলতায়, প্রগলভতায় আলো খেলছে, আলোয় সমানে নেচে চলেছে সেই একই মোহিনী 'বালক'—কালাচাঁদই আজ সুবর্ণ!

তাই, বড় মায়ায় টনটন করে বুক। থাম হে যমদেব, আরও কিছুদূর দেখে যাই—নয়ন সার্থক করে দেখে যাই আমারই আত্মার সেই অমল ইচ্ছাবিন্দু থেকে বেড়ে ওঠা নবীন তরু কতখানি মহাবৃক্ষ হয়ে ওঠে। কালাচাঁদ কাতর হয়ে মনে মনে বলে, আহা শরীল, এই শরীলটা কী শত্তুর দ্যাখো! মনে মনে এখনও যে সে একজনা পায়ের জং খোলেনি, দীঘল কেশ কাটেনি, শাড়ি-ব্লাউজ খুলে চলে যায়নি সাজঘরে।

এখনও তার আসর হয়নি শূন্য। ওস্তাদের রাজা তাকে পদ যোগাচ্ছে, হারমোনিয়ামদার এগারো পর্দায় সুর তুলছে, নিপুণ তালী তবলিয়া বাঁয়া-ডাহিনার বোল বাজাচ্ছে কার্ফা কি দাদরায়, তার চারপাশে কত্তালের ঝমঝম আর আকাশে মুখ তুলে পাগলপারা দুলন্ত দেহ সব দোহারকিদের—হেই বাবা যমরাজ অপেক্ষা কর কিছুক্ষণ। ...

বালুচরে ঘর বানাইলাম ভেসে গেল জলে হে
(ক্যানে) বালুচরে ঘর বানাইলাম। ....

পঞ্চাশ বছর আগের শেখা একটা কলি গুনগুন করে গাইতে থাকল কালাচাঁদ। তার মনে পড়ে গেছে এমনি এক বিচিত্র রাতের কথা। সোনাওস্তাদের মতন তার কাছেও ধরা দিতে এসেছিল এক পাড়াগেঁয়ে বউ, ফিসফিস করে বলেছিল—চল, আমরা পালিয়ে যাই। ঘর বাঁধি দুজনায়। কেন এমন জলজ্যান্ত মিনসেমানুষ চুল রেখে চুড়ি পড়ে ন্যাকামি করে থাকবে? তুমি তো পুরুষ—এত লজ্জা ক্যানে গো তুমার?

হুঁ, লজ্জা-—বড় লজ্জা পেয়েছিল গানের দলের 'বালক' বাইশ বছরের শ্রীকৃষ্ণের মতন সুন্দর তরুণটি। দুহাতে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হঠাৎ সরে এসেছিল। সাপ—'কালসর্প সম্মুখে তোমার'। কালনাগিনী যেন বা ফণা দোলায়! মুকু ওস্তাদের সাবধানবাণী মনে পড়ে গিয়েছিল, খবরদার বাছা, নারীপানে চেয়ো না, নারীঅঙ্গ ছুঁয়ো না—সর্বনাশ হবে।

কী সর্বনাশ হবে জানত না সে। তবু মনের ভয়, হয়ত মনেরই 'ভরম'—বিভ্রান্তি! অভ্যাসে নিজের পুরুষত্বকে চাপা দিতে দিতে এক অদ্ভুত হিমতায় পৌঁছে গিয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশটা বছর আগে মানুষ এত বোকা ছিল ভাবা যায় না!

তারপর তো একদিন চুল কাটতে হল। খুলে ফেলতে হল চাঁদির চুড়ি। কঠোর পুরুষ হতে হল। তখন টের পেল, কী পাষাণ, হৃদয়হীন এ পৃথিবী! দু'কড়ি টাকা পণের অভাবে আর বিয়ে করাও হল না তার। সেই তিক্ততার কাহিনী তার মনে এখনও বিষের জ্বালা ছড়ায়। প্রচণ্ড রাগে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল কালাচাঁদ—ইহজন্মে নারীপানে চাইব না, নারী অঙ্গ ছোঁব না। সে প্রতিজ্ঞা রেখেছে সে। গুণিন ওঝা হয়ে ঘুরেছে দেশবিদেশে। কত আলকাপদলে যেচে পড়ে গিয়ে মিশেছে। তারপর একদিন নিজের গাঁয়ে সাঁওতাপাড়ায় গড়ে উঠল দল। আমির আলি বিশ্বাসী মানুষ। সে তাকে ডেকে নিল দলে। কালাচাঁদের সুখের সীমা নেই।

কিন্তু হঠাৎ এমন সব সময় আসে, এই একটা বিষণ্ণতা তাকে চেপে ধরে। এত একলা লাগে নিজেকে! স্মৃতি তাকে উত্ত্যক্ত করে। রাগে ক্ষেপে গিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে সে—আমি পুরুষ, না পুরুষ লই? যদি পুরুষ তবে আমার জন্যে ক্যানে জোড় দিলেন না বিধেতা? কী শাপে আমার এমন হল গো? এখন আমার চুল পেকেছে, দাঁত ভেঙেছে, শরীল নড়বড় করছে—তবু তো সাধ মিটল না! এ সাধের অর্থ কী গো?

দীঘির জল ছুঁয়ে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া। তালগাছের পাতা কাঁপে আর দোলে—সড়সড় খড় খড়। মেলার দিকে কোলাহল থরথর করে উচ্ছ্বাসে। সার্কাসের তাঁবুতে বাঘ ডাকে। কোথায় ড্রামের শব্দ হয়। নির্জনে বসে গুনগুন করে সে। বিড়ির আগুন সুতো পেরিয়ে গেলেও বিড়িটা ফেলে দেয় না। কাতর প্রার্থনায় নিজেকে সঁপে

দিতে থাকে : হেই বাবা যমরাজ, পালা শেষ হয়ে এল ওই—দেরি নেই। অপেক্ষা কর—আমি যাব।

প্রকাণ্ড বটগাছটার নিচে ঘন অন্ধকার। শেকড়ের ওপর বসে ছিল দুটিতে পাশাপাশি। ফিসফিস করে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে একবার চমকে উঠেছিল সনাতন—কে দৌড়ে গেল যেন! শুকনো পাতায় খসখস শব্দ মিলিয়ে গেল।

সুধা ওর হাতটা নিয়ে বলছিল, কেউ না।

চল, ওঠা যাক। আসরের সময় হয়ে গেল।

চুলোয় যাক তোমার মিন্সেনাচানো আসর। বস তো চুপচাপ। আজ আমার কপালে এত সুযোগ—তা জান না সোনাদা। পণ্ডিত গেছে নলহাটি! এখনও একটা দিন থাকবে সেখানে। দেওররা তো বলদ—বউ নিয়ে পড়ে আছে সার বেঁধে, দ্যাখো গে। মাগ ছেড়ে কেউ উঠবে না—যম ডাকলেও। ...ফিসফিস করে হেসেছিল সুধা।

সনাতনের শরীর কাঁপছিল। ভয়ে আর অস্বস্তিতে। হয়ত অনভ্যাসে। সে বলেছিল, সুবর্ণ ওখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কী ভাববে। ডেকে আনব?

কাকে? ওই ছোঁড়াটাকে?

ওকে তোমার এত রাগ কেন, সুধা?

সুধা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, হয়ত হিংসে। ওকে সতীন লাগে। ...তারপর ফের সে হাসতে হাসতে সনাতনের গায়ে কতকটা ঢলে পড়েছিল।

তখন সনাতন ওকে অসীম সাহসে দুহাতে ধরেছে—বিবেচনায় মাত্র দুকাঁধে হাত রেখেই ধরেছে, এবং নিজের মুখোমুখি ওর মুখ রেখে বলেছে, সুধা, হয়ত ভুল করছ!

কিসের ভুল, শুনি?

আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না তোমার—কেমন করে হবে? অথচ তুমি—তুমি আমাকে...

আমি তোমাকে?

সুধা, বিশ্বাস কর। আমার এত ইচ্ছে করে—তোমার অবস্থা দেখে এত কষ্ট হয়েছে আমার—কিন্তু কী করতে পারি? আমি এত অসহায়, সুধা।

তোমাকে কিছু করতে বলিনি সোনাদা!

বলছ। এমনি করে অন্ধকারে একলা এসে যা বলতে চাও, তা আমি বুঝি। কিন্তু সুধা, বুঝতে পারছিনে কী করব!

কিছুই করতে হবে না তোমাকে। আমাকে ছাড়, যাই।

সনাতন হঠাৎ ওকে সবেগে টানে। সুধা ওর বুকের ওপর ঝুঁকে এলে সে প্রচণ্ড আবেগে চুমু খেতে থাকে। সুধা চুপ করে পড়ে থাকে। বাধা দেয় না। এবং হঠাৎ সনাতন একটা অদ্ভুত ব্যাপার টের পেয়ে যায়। সুধা মেয়ে—তার দেহটা এত নরম, তার ঠোঁট এমন পাতলা, চুলে সুগন্ধ, হ্যাঁ—সুধা মেয়ে—তবু সনাতনের এমন কেন লাগে? কই, কোথায় সে অমর্ত পুষ্পের ঘ্রাণ আনে না—যে সুখ মদের মতন ঝাঁঝাল, তেতো, অথচ আগুন জ্বালানো। সুবর্ণর দেহে একটা অমল কাঠিন্য আছে ... যা সিদ্ধ-ধরনের নরমতার ভিন্ন একটা রূপ অথবা ভাব। সেই পেলব কাঠিন্যের স্বাদ অন্যরকম।

তা নেশা ধরিয়ে দেয় দেহে। সুধার সেগুলো কই? মন—মন নিয়ে কী করবে সনাতন? মনের অনেক জ্বালা।

কেমন নিস্তেজ হয়ে ছেড়ে দেয় সে। সুধা কাপড়ে মুখ মুছে বলে, দিলে তো আমাকে নষ্ট করে! অসভ্য কোথাকার!

সুধা, এবার ওঠা যাক।

না ... বস। যেকথা বলতে এসেছি, বলা হয়নি যে।

কী তোমার কথা, সুধা?

অনেক। একটা করে বলছি, শোন। আমি ওবাড়ি আর থাকব না।

চমকে ওঠে সনাতন। ...তার মানে?

ন্যাকা! বোঝ না? আমি ওবাড়ি থাকলে মরে যাব। তাই পালাব।

পালাবে? কোথায় পালাবে? ভদ্রপুরে দাদার কাছে?

পাগল হয়েছ তুমি? দাদা আপদ বিদেয় করে বেঁচে গেছে। সুধা হাঁসফাঁস করে প্রবল উত্তেজনায়। ...না, ওখানে আমি যাব না।

তাহলে আর কোথায় যাবে?

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সনাতনের কাঁধে হাত রেখে সুধা বলে ওঠে, যদি তোমার সঙ্গে যাই। নেবে না তুমি। ...তারপর তার কান্নার চাপা শব্দ ফোটে, যেন বা গাছের নিচে রাতের অন্ধকারে কী পাখি অসহায় ডানা ঝটপট করছে। ...আমাকে বাঁচাবে না সোনাদা? যদি না বাঁচাও, অবশ্যি আমার অনেক উপায় আছে। হ্যাঁ, এত বড় দীঘির জল আছে, এত সব গাছপালা আছে, আর ...

সুধা, তোমার কিসের কষ্ট বলবে?

অনেক কষ্ট।

আমি যদি এখানে না আসতাম, তাহলে কী করতে?

মরতাম।

কেঁদো না—কথা শোন। আমার তো কোন ঘর নেই, সুধা। কোথায় রাখব তোমাকে! তাছাড়া পণ্ডিত ছেড়ে দেবেন না। পুলিশে জানাবেন। মাঝখান থেকে আরও কষ্ট পাবে।

সুধা ফুঁসে ওঠে, থাম! ...তারপর আস্তে আস্তে বলে, যদি অনেক দূরে কোথাও চলে যাই আমরা—যেখানে কেউ আর খুঁজে পাবে না?

ছেলেমানুষি কর না। শোন। ...

বুঝেছি! বেশ—আমার মরণই চাও। ছাড়, আমি যাই।

সুধা, আমাকে ভাবতে সময় দাও।

সুধা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে বলে, আমার হাতে একটুও সময় নেই। আমি একেবারে বেরিয়ে এসেছি। ওখানটায় আমার সুটকেস রেখেছি। ছাড়।

সর্বনাশ! ...লাফিয়ে ওঠে সনাতন। ...কী কাণ্ড করে ফেলেছ তুমি! ছি ছি!

ছি ছি বলছ? পারছ বলতে?

কিন্তু এ কী করে ফেললে!

হ্যাঁ—তোমার মিঙ্গেনাচানো বাদ পড়ছে। যাও। আমি আসি। বেরিয়ে পড়েছিলাম অনেক আশা নিয়ে। মুখপুড়ী সুধার কে আছে ভাবি নি! যাক গে, পথে নেমে আর ভয় কিসের সোনাদা! হ্যাঁ, দাঁড়াও—তোমাকে, তবু একটা প্রণাম করেই যাই।

সত্যি সত্যি সে সনাতনের পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর পা দুটো জড়িয়ে আচমকা হু হু করে কাঁদতে থাকে। সনাতন কী করবে ভেবে পায় না। ...

সেজেগুজে দাঁড়িয়ে সোনা ওস্তাদের অপেক্ষা করছিল সুবর্ণ। সামনে অন্ধকারে গাছের জটলা। ওস্তাদ ওখানেই কোথায় আছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে কিংবা মন্দ কিছু ব্যাপার করছে। মুখ টিপে হাসছিল সুবর্ণ। ওই অশুচি গায়েই কি আসরে যাবে সোনা ওস্তাদ? হয়ত দিঘীতে গিয়ে চুপি চুপি স্নানটা সেরে নেবে। মনকিরের দল দুঘণ্টার আগে আসর ছাড়ছে না—যা বোঝা যাচ্ছে।

ওরা কী করছে এতক্ষণ—কৌতূহল হচ্ছিল খুবই। কিন্তু ছিঃ, তা উচিত নয়। সোনা ওস্তাদ রাগ করবে। তাছাড়া, ছিঃ, সে বড় লজ্জার কথা!

কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে পা টাটাচ্ছে এতক্ষণে। এত কী কথা বলছে ওরা? ওদিকে দলের লোকেরা হয়ত আসরে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। খুঁজতে বেরোবে না তো? ম্যানেজার টর্চ জ্বেলে এগিয়ে এলেই বিপদ। তেড়ে বলবে, এখানে একলা কী করছিস রে শালা?

হুঁ-উ—আমির আলি ষাঁড়ের মত হাঁকছে : হেই সুবর্ণ! কোথা গেলি রে? ... তারপর এক ঝলক টর্চের আলো ওপাশে ফাঁকা জমিতে খেলে গেল কয়েকমুহূর্ত। সুবর্ণ দ্রুত সরে একটা গাছের দিকে এগোল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। জোরালো আলোয় ধরে ফেলেছে ওকে আমির আলি ম্যানেজার। হাঁক এল : হেই ব্যাটা মুদ্দফরাস! এদিকে আয়!

ভয়ে-ভয়ে কাছে যেতেই আমির চাপা গলায় গর্জে বলে, আক্কেল নেই রে ছোঁড়া? মেলাখেলা জায়গা। একলা ওখানে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছিস। দুষ্টুলোকের চোখে পড়লে তুলে মাঠে নিয়ে ফেলবে, জানিস নে?

দলের সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। নন্দ বলে, হ্যাঁ—বাছাবাছি করবে না। এবং হাসিটা আরও বেড়ে যায়। গেটের কাছে দলটা অপেক্ষা করছে। হ্যাসাগটা লায়েকরা নিয়ে গেছে আসরে! খোলামেলায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা—যন্ত্রপাতির কাছে একটা হেরিকেন জ্বলছে। মেলার আবছা আলো পড়েছে বলে এখানটা মোটামুটি স্পষ্ট। আমির সুবর্ণর কানের কাছে মুখ এনে বলে, মাস্টার জোর মাস্টারি করছে শুনলাম। লোকটা বিপদ বাধাবে। আমি কিছু বলতে পারব না—তুই আমার হয়ে সাবধান করে দিবি। বুঝলি?

সুবর্ণ সরে এসে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। কাবুল আর নন্দ তার কাছে আসে। তারপর কাবুল ফিসফিস করে বলে, ওস্তাদ কোথায় রে?

সুবর্ণ জবাব দেয়, জানিনে।

নন্দ হাসে। ...বল্ না বাবা, ওস্তাদের প্রসাদ তো তুই নিশ্চয় পেয়ে এলি। আমরাও একটু পাই-টাই, না কী?

সুবর্ণ রাগতে গিয়ে হেসে ওঠে। ...ফুক্কুরি কর না। ওস্তাদ তেমন লোক না।

কাবুল বলে, উরে শালা! ওস্তাদ একেবারে ধোয়া তুলসীপাতাটি! আর বে ঠাকুর, আমরা দেখে আসি কী খেলা খেলছেন সোনা ওস্তাদ।

নন্দকে ডেকে নিয়ে সে বাগানের দিকে চলে যায়। সুবর্ণ হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার ইচ্ছে করে, ম্যানেজারকে গিয়ে বলে কথাটা। কিন্তু আমিরের যা স্বভাব—হয়ত উল্টে তাকেই বাপান্ত করে ছাড়বে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টে সেই অন্ধকারটা লক্ষ্য করে সে। আকাশভরা নক্ষত্র। নিচে এই পৃথিবী। কত আশ্চর্য ব্যাপারই না ঘটছে সারাক্ষণ। মেলার দিক থেকে মনকির ওস্তাদের ছোকরাটার গান ভেসে এল এতক্ষণে :

এত রেতে ডাক এসেছে রূপসী রাই কমলিনী
চুল বাঁধা থাক পড়ে লো আয়, হবি তুই কলঙ্কিনী।।

গায় বেশ ছোকরাটা। স্বর এখনও চিড় খায়নি। শুনতে শুনতে কেমন ভয় পেয়ে যায় সুবর্ণ। তার গলা একদিন অমনি ছিল। এখন একটু করে ধরে আসছে যেন। সে কি বয়সের দোষে? বয়স যেন কী একটা চাপ ঠেলে নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, কত কী পুরনো খসে পড়ছে, সব টের পায় সুবর্ণ। তার এইসব সময়, একলা হলেই, সেই গোপন গুরুতর ভয় তাকে চেপে ধরে—একদিন তাকেও চুল কাটতে হবে।

সেই অনিবার্য দিনের প্রতি থমথমে চোখে সে তাকিয়ে থাকল! ...

কতক্ষণ পরে নন্দ চিমটি কাটে কাবুলকে। টের পায় কাবুলের শরীরটা শক্ত। ঠিক বাঘের বসার ভঙ্গিতে হাঁটু দুটো দুমড়ে থাবার মত দুটো হাত মাটিতে পেতে বসেছে সে। নন্দ আরও টের পায়, এখন কাবুল কাবুল নয়—নিরেট ঘনশ্যাম বা ঘনা বাগদী। তার বাবা ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। জেলেই মারা গিয়েছিল। ঘনা বাবার মত নয়, সে নন্দর ভাষায় 'আরটিস' বা 'সিল্‌পি'—তার গানের গলা আছে। অভিনয়ে সে পটু। সচরাচর বদমাস চরিত্রগুলোই তাকে 'কাপে' দেওয়া হয়। তখন তাকে এত মানিয়ে যায় আসরে!

নন্দর মনে হচ্ছিল, আসরের সেই চরিত্রটি এখন এই বটগাছটার উল্টোদিকে ঝুরির আড়ালে এসে ওঁৎ পেতেছে। নন্দ ভীতু ছেলে। তার বাবা পূজারী বামুন। তার রক্ত যেন অন্যরকম।

হ্যাঁ, মেয়েটি চলে যাচ্ছে এতক্ষণে। গুজগুজ ফিসফাস প্রেমকথা কয়ে নাগর সোনা ওস্তাদের কাছ থেকে কেটে পড়ছে। নন্দর বলতে ইচ্ছে করে, ভাই কাবুল, ও শালী এখন কেমন সতী সেজে ভাতারের কাছে শোয়, দেখতে পেলে ধন্যি হতাম মাইরি! নন্দ উসখুস করে। ফের চিমটি কাটে।

কাবুল উঠে দাঁড়ায় এবার। ফিসফিস করে বলে, যাবি?

আরও চাপা স্বরে হাঁফাতে হাঁফাতে নন্দ বলে, কোথায়?

শিকারে! ...বলে কাবুল যেন হাসে। নন্দর একটা হাত ধরে টেনে সামনে এগোতে থাকে। গাছের জটলার ভিতর ঠাসা অন্ধকার পেরিয়ে চলে দুজনে। নন্দর ভিতরটা থরথর করে কাঁপে। সে টের পেয়ে গেছে, কাবুল কী করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ

বিকট একটা ভয় আর আনন্দ এসে চেপে ধরেছে। মেয়েটিকে ওরা দেখেছে। ভারি সুন্দর—নিটোল চমৎকার একখানা দেহ, ওর ভাষায় 'খাসা জিনিস!' আর নন্দ জানে, সচরাচর এসব সময় অসতী মেয়েরা ধরাপড়া বা আত্মরক্ষার তাগিদে খুব সহজে দেহের মূল্যে মান বাঁচায়, প্রাণ বাঁচায়। তার জীবনে এমন একবার হয়েছিল! পাড়ার বউ শেফালী সিঙ্গি মশায়ের সঙ্গে খামারবাড়িতে জোড় বেঁধেছিল। সিঙ্গি চলে যেতেই নন্দ সেখানে হাজির। ...হুঁ হুঁ বাবা, বলে দেব সব। ...শেফালী হাতে পায়ে ধরেছিল, দোহাই নন্দদা, যা চাও দেব—নাও। কিন্তু কাকেও বল না! ...অতএব নন্দর একটা চরম প্রাপ্তিযোগ ঘটে গিয়েছিল।

এবারও সেই নিয়মে চমৎকার প্রাপ্তিযোগ ঘটতে চলেছে। কিন্তু কে আগে? উঁহু—ব্যাটা বাগদীকে একটু সামলাতে হবে। আরে বাবা, 'অগ্রে ব্রাহ্মণ দদ্যাৎ'—পড়িস নি শাস্ত্র? না পড়ে থাকিস, শুনে নে। ... মনে মনে এইসব বলে আর নন্দ হাঁফাতে হাঁফাতে চলে। সামনে অন্ধকার মাঠে শেয়ালের মত তাকায়। মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না। ঘনা নিশ্চয় দেখছে। নন্দর পায়ে শুকনো খড় জড়িয়ে যায় বারবার। রাগে বিরক্তিতে সে বিড় বিড় করে ঈশ্বরকে গাল দেয়।

হঠাৎ কাবুল থমকে দাঁড়ায়। বাঁজা ডাঙ্গার ওপর শুকনো ঘাসে মেয়েটি বসে পড়েছে। নক্ষত্রের আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। বসল কেন? তাহলে কি সোনা ওস্তাদ ফিরে আসবে? আসুক। এসে খুঁজেই পাবে না। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ওকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবার মত ক্ষমতা ঘনশ্যামের আছে। সে ধুতির কাছাটা খোলে। আণ্ডারপ্যান্টটা খুলে পকেটে ভরে।

আসর—হ্যাঁ, আসর শুরু হবার আগেই কাজ সেরে ভালমানুষের মুখে ফিরে আসবে তারা। বলবে, ঘাট সেরে এলাম হে আমের আলি। দুপুরে খাওনাটা আজ পেচণ্ড হয়েছিল!

নন্দ ফিসফিস করে, যদি চ্যাঁচায়, মেলার লোক দৌড়ে আসবে যে কাবুল?

কাবুল তাই ভাবে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে পিছনে দিকে দূরে মেলাটা দেখে নেয়। বাতাস বইছে উদ্দাম। চ্যাঁচালেও কানে যাবে না। তাছাড়া চ্যাঁচাতে দেবেই বা কেন? একবার অকারণে আকাশের নক্ষত্র দেখে নিয়ে সে সামনে পা বাড়ায়। বলে, পালাস নে।

সনাতন তার ব্যাগটা নিতে এসেছিল শুধু। ব্যাগটা সুবর্ণর কাছে আছে। দল তখনও আসরে যায় নি! মনকির ওস্তাদ তুফান তুলেছে শোনা যাচ্ছিল। দোহারদের ধুয়ো গমগম করে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল স্তব্ধ মেলার আসর। আমির আলি সেই সময় গেটের ওদিকে হেঁড়ে গলায় ডাকে, খুড়ো, কালাখুড়ো!

সুবর্ণ দৌড়ে এসে বলে, ওস্তাদ!

ব্যাগটা কই সুবর্ণ? ...সনাতন চাপা গলায় বলে।

সুবর্ণ ব্যাগটা দিয়ে ফিসফিস করে হাসে। ...কেমন হল ওস্তাদ?

কী কেমন হবে?

প্রেমালাপ?

সনাতন গম্ভীর হয়ে বলে, এখনও বাকি আছে। তারপর সে চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ায়।

সুবর্ণ অমনি সামনে এসে দাঁড়ায়। ...আবার কোথায় যাচ্ছেন?

আসছি।

চকিতে সুবর্ণ নড়ে ওঠে। কী একটা আঁচ করে তার বুকটা কাঁপতে থাকে। রুদ্ধশ্বাসে সে বলে, আপনি চলে যাচ্ছেন ওস্তাদ?

যাঃ, আসছি এখুনি।

না—আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আসবেন না। ...সে সনাতনের একটা হাত চেপে ধরে! ছটফট করে বলতে থাকে, সুধাদির সঙ্গে আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন। কেন, কেন যাবেন? না—আপনার যাওয়া হবে না।

আঃ, কী হচ্ছে সুবর্ণ!

সুবর্ণ অস্ফুটকণ্ঠে বলে, না না! কেন যাবেন? এত সব বায়না নিয়েছে ম্যানেজার। তার কী হবে?

সনাতন রেগে যায়। ...বায়না নিয়েছে তো আমার কী? তোরা নিজেরা তুলবি বায়না।

সুবর্ণ কাঁদো কাঁদো মুখ বলে, তাই বলে আপনি একটা কেলেঙ্কারি করবেন?

কিসের কেলেঙ্কারি রে?

নয়? আপনি একজন গুণী ওস্তাদ হয়ে সামান্য মেয়ের জন্যে আসর ছেড়ে পালাবেন?

খুব বড় কথা শিখেছিস তো সুবর্ণ! ছাড়, আমাকে যেতে দে।

সুবর্ণ হু হু করে কেঁদে ফেলে। বিড়বিড় করে বারবার, না না। আপনাকে এমন করে যেতে দেব না। কিছুতেই না। ...হয়ত ওর মুখের পেন্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হয়ত দ্বিতীয়বার না সেজে ওর আসরে যাওয়া হবে না! তবু পাগল হয়ে উঠেছে নাচিয়ে ছোকরাটা, এক অন্ধ আদিম জেদ কিংবা গভীরতম অদ্ভুত বিহ্বলতায় সে সনাতনকে আঁকড়ে ধরে মাথা কুটছে, না না না না। কিছুতেই না।

ওখানে বাঁজা ডাঙাটার ওপর সুধা অপেক্ষা করছে একা। এখানে ব্যাগটা নিতে এসে এ বিপাকে পড়ে যাবে, সনাতন ভাবতেই পারেনি। সে বোঝাতে চেষ্টা করে সুবর্ণকে। ...সুবর্ণ, কথা শোন। সুধাকে আমি কোথাও রেখে আবার তোদের দলে ফিরে আসব। গান কি ছাড়তে পারি রে? পারব না। তবে এ এলাকায় আর গান করা হবে না। দেশটা তো অনেক বড়। তুই ভাবিস নে। তোরা কোনরকম বায়না চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাস। সেখানেই আমি ঠিক সময়ে হাজির হব!

সুবর্ণ ফের বলে, না।

সেই সময় আনিস এসে পড়েছে। কাদুর সঙ্গে এতক্ষণ দুচার পাত্র গলায় ঢালছিল। বেশ নেশা ধরেছে তার। এসেই বলে, ড্রামা না প্রেমালাপ বাছা সুবর্ণ? সরি, ভেরি সরি ওস্তাদজী। রাগ করবেন না। হুঁউ, সুবর্ণ কী বলছে? ভালবাসে? ...হা হা করে হাসে

সে। ...এই সুবর্ণটা মেয়েও নয়, ছেলেও নয়। আবার হিজড়েও না। তবে কী? কিছু না। মায়া! ইয়েস ওস্তাদজী, ঝাঁকসা বলে ইনি মায়া—মহামায়া! আ রে সুবর্ণ! তুই ওস্তাদের হাতটা ধরে আছিস কেন বে? ছাড় শালা। বেয়াদপি! ননসেন্স!

সুবর্ণ এবার ভাঙা গলায় বলে, আনিসদা, ওস্তাদ পালিয়ে যাচ্ছে!

কী পালিয়ে যাচ্ছে! ...আনিস কাছে এসে সনাতনের মুখটা দেখতে চেষ্টা করে। ...হোয়াই ওস্তাদ? কেন? আমির আলি যা তা বলেছে?

সনাতন কী করবে ভেবে পায় না। সব মাটি হয়ে গেল। সুবর্ণ তাকে এমন করে আটকাবে, সে একটুও ভাবেনি। এবার আনিস এসে গেছে! আর কোন উপায় দেখছে না সে। ধমক দিয়ে বলে, চুপ কর তো আনিস! ...

আনিস চুপ করবে না, ওস্তাদ। সুবর্ণ কাঁদছে। সুবর্ণ আপনার হাত ধরে আছে। মুখের পেন্ট চটে যাবে জেনেও সুবর্ণ কাঁদছে। ম্যানেজার আমির আলির গাল খাবে জেনেও, সুবর্ণ—শী ইজ উইপিং। হ্যাঁ, কাঁদছে শালা আলকাপের নাচিয়ে ছোকরাটা। অতএব, সোনা ওস্তাদ আলবাৎ পালাচ্ছে। কিন্তু কেন পালাচ্ছে? কে তাকে কুকথা বলেছে? তার নাম কী? ..

মাতালের কাণ্ড! তার ওপর আনিস—দুর্দান্ত জেদি ছেলে। সে গর্জায়। অমনি সুবর্ণ ফিসফিস করে বলে, সেই পণ্ডিতের বউটা নিয়ে পালাতে চায় ওস্তাদ! আনিসদা, তুমি ওকে আটকাও।

আনিস এবার হো হো করে হেসে ওঠে। সনাতন বাধা দেবার আগেই সে চেঁচিয়ে বলে, ম্যানেজার! তোদের ওস্তাদকে নিয়ে আসরে চললাম। যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দাও। কাদু, কাদের আলি মাস্টার! কাম অন ব্রাদার। আমরা আসরে যাব। সেই কালাখুড়ো! চলে এস বাপ! আজ মনকিরকে ঠেকাতে জানপ্রাণ সব যাবে। তূণে বাছাবাছা বাণ নিয়ে এস খুড়োমহাশয়!

শক্ত হাতে সনাতনের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানে আনিস। মেলার প্রান্তে এসে চাপাস্বরে বলে, সুবর্ণ—এই সুবর্ণকে নিয়ে যদি পালাতেন ওস্তাদ, এই কন্ট্রাক্টর পুত্র ম্যাট্রিক পাস আনিস আলি আপনাদের হেলপ করত। কিন্তু মেয়ে—নিতান্ত মেয়ে! কভি নেহি ওস্তাদ, কভি নেহি!

সনাতনের বলতে সাধ যায়, নিতান্ত মেয়ে নয় আনিস, সুধা কী তুমি জান না! কিন্তু বলতে পারে না। সুবর্ণকে খোঁজে। সে আলোর সীমানায় দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে আয়না বের করছে। তার সামনে অজস্র মানুষের পিঠ। তারা দেখছে না, এক মোহিনী নটী আপন মনে নিজের মুখে পাওডারের পাফ বোলাচ্ছে তাদেরই পেছনে। আর তার ঠোঁটে প্রগাঢ় তৃপ্তির হাসি। ভুরুতে মায়া, চাহনিতে মায়া, ঠোঁটে মায়া—হা সর্বনাশ!

সনাতন দেখল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই সর্বনাশ সোনা ওস্তাদকে ঘিরে ধরেছে। সুধা মরুক! সুধা যা খুশি করুক। সামনে হাজার বিমুগ্ধ মানুষের ভিড়ে এখন সুবর্ণকে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা মনে হয়েছে। এইসব আলোকিত আসর ফেলে কোথায় গিয়ে বাঁচতে চাইছিল সে?

আনিস, একটু মাল খাব আজ। আছে?

আলবাৎ। ওস্তাদের জন্যে না রেখে পারি? ...পকেট থেকে একটা বেঁটে বোতল বের করে সে। পানের দোকানের পেছনে অন্ধকারে চলে যায় দুজনে।

সনাতন বোতলটা গলায় ঢেলে প্রচণ্ড কাসে। তারপর বলে, সিগ্রেট দাও, আনিস।

এই যে ওস্তাদ।

আনিস, এ হয়ত ভালই হল।

হল বইকি ওস্তাদ।

হ্যাঁ আনিস, সুবর্ণকে আমি ভালবাসি।

আনিস হাসে শুধু।

আনিস, সুবর্ণ কিছু দিতে পারে না—তবু ওকে কেন ভালবাসি?

আনিস আরও হাসে।

এ ভালবাসার মানে কী আনিস? আমি বুঝি না। যাকে হাতের নাগালে পাব না, যা শুধু দুটো চোখ, দুটো কান আর মনের সুরে বাঁধা, তার জন্যে ... কথা শেষ না করে মাতাল সনাতন—সোনা ওস্তাদ পরিতাপে মাথা নাড়ে। বড় বড় চুল আঁকড়ে ধরে দুহাতে।

আনিস বলে, পাবেন না বলেই তো এত নেশা ওস্তাদ। নইলে আমি—আমি শালা বড়লোক কন্ট্রাক্টরের ছেলে, ম্যাট্রিক পাস—আমি কেন মেতে গেলাম আলকাপে? তবে কথা কী—আমি সুবর্ণর একটা নেশায় পড়েছি বটে, আমার আসল নেশা গানে-কাপে। আমার তাই ভয় নাই ওস্তাদ, আমি বেঁচে থাকব। আপনি—আপনাকে নিয়েই যত ভয়।

আনিস, আর মদ নাই?

কাদুর কাছে আছে। বসুন, আনছি।

আমিরের কথা শোনা যায় ওদিক থেকে। খুড়ো এলে নাকি? মলোছাই, বুড়ো ঘাটে মরে পড়ে থাকল নাকি? ওরে নফর আলি, ওরা সব কই? চল্, আসরে যাই। সুবর্ণ, হেই সুবর্ণ! ওরে শালা মুদ্দফরাস! শালা মরবে রে, মরবে। ঠিক শালার বরাতে হাসপাতাল আছে। কাবুল, কাব্বেল! সে শালাই বা কোথা গেল? ঠাকুর, ও নন্দঠাকুর!

ঝিমুনি ধরেছিল কালাগুনিনের। স্নিগ্ধ রাতের হাওয়া ঘুম দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলছিল। সে চমকে ওঠে হঠাৎ। ঘাটে জলের শব্দ হচ্ছে। সে বলে ওঠে, কে গো বাবারা?

নন্দর সাড়া আসে। ...আরে! খুড়ো নাকি?

হ্যাঁ, বাবা। আসরে যাওনি?

তুমি যাওনি যে খুড়ো? তোমারই তো আগে যাবার কথা।

আজ এট্টু অনিয়ম করলাম, ঠাকুর। 'জল খরচ' (শৌচকর্ম) করতে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ, খুড়ো।

ওটা কে সঙ্গে?

কাবুল—তোমার আদরের ঘনশ্যাম।

বাপ ঘনা, ঘনশ্যাম।

কাবুল গামছায় হাত পা মুছতে মুছতে বলে, হুঁ, বল।

আর ক'রাত বায়না আছে রে?

পাঁচ।

আমি—আমি বরঞ্চ কাল একবার বাড়ি ঘুরে আসি, বাছা।

যেও। ...বলে কাবুল চলে যায়।

নন্দ বলে, বাড়িতে কী মধু আছে খুড়ো? বাড়ি গিয়ে মরবে? এস, ছিলিম টানবে আমার সঙ্গে। খাঁটি গরমেন্টের মাল—সারগাছিতে বুনে দিয়েছে। এস, টানবে এস।

হঠাৎ লোভী হয়ে ওঠে কালাগুনিন। দৌড়ে সঙ্গ নিয়ে চাপাস্বরে বলে, মরে যাবার আগে তোমাকেই সব দিয়ে যাব, ঠাকুর। ঘনশ্যামটা নিতে পারবে না। ও বড্ড বোকা আর পাষণ্ড। বুঝলে ঠাকুরমশাই, ওর মনে দয়ামায়া বলে কিছু নাই।

নন্দ শিউরে ওঠে। রুদ্ধশ্বাসে বলে, হ্যাঁ, নাই। ঘনা একটা জন্তু।

সে রাতের আসরে নন্দর কী যেন হয়েছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ চমকে উঠে শরীর নাড়া দিয়েছে আর লাল চোখে কাবুলের দিকে তাকিয়েছে। আমির ধমকেছে, ঠিক্‌সে কত্তাল বাজাও ঠাকুর। তাল কাটছে। কাবুল কটমট করে পাল্টা তাকাতেই নন্দ চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তার নেশাটা আজ জমেই নি। আকাশপাতাল দোলানো সে সুখের ঢেউটা আজ আসেনি। মনের ভেতর শুধু ওই এক প্রশ্ন ভোঁস করে শুশুকের মতো ভেসে উঠছে : অত ঠাণ্ডা কেন হে কাবুল? দীঘির ঘাটে যাবার আগে অব্দি সে ওই প্রশ্ন বারকয় করেছিল কাবুলকে। কাবুল বলেছিল, আবে চোওপ্। ছেড়ে দে। কিন্তু ছাড়তে পারেনি নন্দ। রাত যত বেড়েছে, তত সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বার দুই পেচ্ছাপের ছলে আসর থেকে বাইরে উঠে গেছে। অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে ঝোঁকটা সামলে নিয়েছে। ভয়ে শরীর সিঁটিয়ে গেছে তার। একবার দেখে আসতে পারলে ভাল হত। ঘনাকে কিছু বিশ্বাস নেই। ওর রক্তে কী আছে।

তৃতীয় পাল্লার পর, কাদুর ঘড়িতে রাত তখন তিনটে, ছিলিম টানবার জন্যে কাবুল বাইরে যেতেই নন্দ তার পেছনে উঠে এসেছে। মেলার আলোর ওধারে পানের দোকানের পেছনে বসেছে দুটিতে। সেই সময় নন্দ হাত রাখে কাবুলের কাঁধে। ঘনা রে!

হুঁ।

একটা সত্যি কথা বলব?

হুঁ।

বিশ্বাস কর মাইরি তোর এঁটো আমি খাইনি।

শালা বেহ্মচারী!

বিশ্বাস কর, আমি ছুঁয়েই চলে এসেছি শালীকে।

ক্যানে?

ঘনশ্যাম, আমার হঠাৎ কেমন ভয় হল রে।

ক্যানে, ক্যানে?

ওর গা ঠাণ্ডা। হিম।

হুঁ!

মরা কাঁকড়ার মত শক্ত। চিৎপাত।

হুঁঃ!

ক্যানে রে ঘনা?

ঘড়ঘড় করে হাসে কাবুল। ...ঘনা বাগদী পুরুষ বটে। আর বাবুবাড়ির মেয়েরা বড্ড নরম। ছুঁলেই মুচ্ছো যায় হে ঠাকুর।

নন্দ মাথা দুলিয়ে বলে, না না। ও মুচ্ছো যায় নি! ঘনা, কাবুল! ওর গা অত ঠাণ্ডা ক্যানে রে? মরা কাঁকড়ার মতো শক্ত চিৎপাত!

চুপ বে। ছিলিম দে।

ঘনা, তুই কী করেছিস?

এ্যাও শালা!

তুই ওর গলা টিপে ধরেছিলি, ঘনশ্যাম। মেয়েটা মরে গেছে। ...নন্দ ছটফট করে। হাঁসফাস করে বলতে থাকে, হ্যাঁ—তুই ওর চ্যাচানি থামাতে গলা টিপে দিয়েছিলি। ও মরে গেছে। ঘনা তুই খুন করেছিস। তোকে পুলিশে ধরবে। তোর ফাঁসি হবে রে।

কাবুল প্রকাণ্ড থাবায় নন্দর মুখটা চেপে ধরে বলে, চু-উ-প শালা! নিজেও বাঁচবিনে। চু-উ-প।

ছেড়ে দিলে নন্দ চুপ করে যায়। কতক্ষণ চুপ করে থাকে। তার ইচ্ছে করে, ভীষণ জোরে কাঁদতে পারলে কষ্টটার আরাম হত। একটা গভীর পরিতাপ কাঁপতে থাকে তার মনে। আহা, অমন সুন্দর মেয়েটা! ফুটফুটে গোলগাল পুতুল নরম মখমল রঙচঙে! সে বিশাল আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজেকে এমন অসহায় লাগে তার।

ছিলিমে মাল ঠাসতে ঠাসতে কতক্ষণ পরে কাবুল বলে, মেলায় এমন হয়। তুই জানিস নে নন্দ, ইটা নিয়ম মেলাখেলা জায়গার। ভিড় থেকে রূপসী তুলে মাঠে নিয়ে পালায়। পার্বতীর মেলা থেকে একবার পোয়াতি রূপসীকে ...

হঠাৎ থেমে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টে সামনে তাকায়। ফিসফিস করে ওঠে। সোনা ওস্তাদ যাচ্ছে!

নন্দ চকিতে ঘুরে দেখতে থাকে।

কাবুল বলে, বসিয়ে রেখে এসেছিল। ভাবছে, এখনও বসে আছে। তাই যাচ্ছে!

নন্দ জড়ানো স্বরে বলে, খুঁজেই পাবে না। ফিরে আসবে।

হুঁ। ভাবে রাগ করে পেয়সী বাড়ি পালিয়েছে।

ঘনা, ঘনা! ওর বাকসোটা?

মাথার কাছে রেখে এসেছি।

বাকসো ক্যানে রে?

সেটাই বুঝতে পারছি নে!

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে নন্দ। ...আমাদের ফাঁসি হবে কাবুল! আমরা মরে যাব।

ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারে কাবুল। টানতে টানতে একটা কেয়াঝোপের কাছে নিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। নন্দ উঠে বসে। চুপ করে থাকে। মেলার আসরে মনকির ওস্তাদের গান চলেছে।

আজ নিশীথে দেখেছি স্বপন
আমার মন করে কেমন।

গানটা প্রতিধ্বনিময় হয়ে সামিয়ানা আলো আর জনমণ্ডলী পেরিয়ে অন্ধকার আকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাবুল বলে, গানটা শোন। মাথা ঠাণ্ডা হবে। কই, দেশলাই জ্বাল। ...
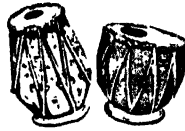
আসর ভাঙতে বেলা দশটা। কাছারিবাড়ির ঘরটাতে সাঁওতাপাড়া দল ফিরে এসেছে। সুবর্ণ সাজ খুলেছে। মুখ ধুয়েছে বালতির জলে। তারপর নীলচে পাজামা শার্ট পরে সনাতনকে ডেকেছে, চলুন ওস্তাদ। মেলা থেকে চা খেয়ে আসি।

সনাতন কাত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। জবাব না পেয়ে সুবর্ণ গিয়ে পাশে বসে। তার পিঠে হাত রেখে ফের ডাকে, ওস্তাদ!

সনাতন সাড়া দেয়, কী?

চলুন, মেলায় গিয়ে চা খেয়ে আসি।

থাক। ভাল্লাগে না।

দলের লোকেরা বাইরে বারান্দায় জটলা করছিল। যে দোকানে চায়ের ব্যবস্থা, সেখানে যাবে—নাকি এখানেই আনতে বলবে। ম্যানেজারের মতে, এখানেই এনে দিক। মুড়ির বস্তা বয়ে নিয়ে যাবে কে? নফরকে পাঠানো হল অবশেষে।

কাদু টিউবেলের দিকে দাঁত ব্রাশ করতে করতে এগোচ্ছে। আনিস শিরিসগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একদল লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কাবুল আজ ভারি উদ্যোগী। প্রকাণ্ড ডেকচি আর কড়াই তার হাতে, বালতি খুন্তি, ইত্যাদি ডুবু তবলচি নিয়েছে, দীঘির দিকে এগিয়ে যায়। নন্দকে ডেকে যায়। নন্দ চুপচাপ বসে আছে বারান্দায়। কালাখুড়ো উনোন সাফ করতে ব্যস্ত। আমির একমাত্র চেয়ারটা নিয়ে বারান্দায় অভিজাত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। এইসব সময় আশেপাশের গ্রাম থেকে বায়না নিয়ে লোক আসতে পারে। আসেও প্রতিদিন। একশ টাকা পয়ান হাঁকে সে। দর চড়াতেই হবে এই সুযোগে। বায়নাওলারা ভড়কে যাচ্ছে আপাতত। আমিরের বিশ্বাস, শেষ অব্দি কেউ না কেউ একশতেই রাজি হয়ে যাবে। আমির শিরিসগাছের ছায়ায় আনিস আর সেই লোকগুলোর দিকে প্রত্যাশী চোখে তাকাচ্ছে। সে অধৈর্য। ওরা নির্ঘাৎ বায়না এনেছে।

আনিসটা কী করছে! আনিসের ওপর রেগে লাল হয়ে ওঠে সে।

ঘরে সুবর্ণ ঝুঁকে আসে সনাতনের মুখের দিকে। ফিসফিস করে বলে, সুধাদির জন্যে মন খারাপ করছে ওস্তাদ?

সনাতন হাসে একটু। যাঃ!

চলুন না, চা খেয়ে আসি।

সুবর্ণ, মাতালদের নাকি দুধ খেতে নেই। চায়ে দুধ আছে। ...সনাতন আরও হাসে।

সুবর্ণ করে কী, নিঃসঙ্কোচে ওর গালে ঠোঁট নামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি ততবড় মাতাল এখনও হোননি মশাই।

সনাতন আবিষ্টভাবে বলে, আমাকে জ্বালাসনে সুবর্ণ। উঠে বস তো!

সুবর্ণ হাসে। ...কেন? প্রেম জাগছে?

না, কাম।

বলে, সনাতন ধুড়মুড় করে উঠে বসে। দরজার বাইরে মস্ত উঠোন। নিচু পাঁচিল সামনে আমবাগান, সেই বটগাছটা। ডাইনে দীঘি। তারপর ধু ধু দিগন্তবিস্তৃত শস্যহীন ঢেউখেলানো মাঠ। বাঁজা ডাঙাটাও নজরে পড়ে। বাজপড়া তালগাছের ডগায় একটা পাখি বসে আছে। ওখানেই সুধার অপেক্ষা করবার কথা ছিল।

সুধা নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছে। তার মনে হয় একথা। মুখে যাই বলুক, সুধার একা যেখানে খুশি পালানোর সাহস নেই। কিন্তু সুটকেসটা ...

গলায় দড়িটড়ি দিয়ে বসেনি তো? কয়েক মুহূর্ত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে সনাতন। পরে ভাবে, নাঃ। সুধা নিজেকে মারতে পারবে না। যে মেয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়, জীবনের ওপর তার লোভটা নিশ্চয় বেশি। সুধা বাড়ি ফিরেই গেছে!

দুজনে বেরিয়ে পড়ে। বারান্দায় গিয়ে সুবর্ণ আমিরকে বলে যায়, একটু আসছি ম্যানেজার। চা ওখানেই খেয়ে আসব।

আমিরের ইচ্ছে নয়। কিন্তু সোনাওস্তাদের সামনে সুবর্ণকে বারণ করতে পারে না সে। শুধু বলে, শিগগির আসবি!

গেট পেরিয়ে পাঁচিলের ধারে ধারে হেঁটে দুজনে মেলায় পৌঁছয়। এখন মেলা ফাঁকা। দোকানদারেরা বাইরে উনুনে আঁচ দিয়ে রান্নাবান্নার যোগাড় করছে। শূন্য আসরের সামিয়ানা বাতাসে নৌকোর পালের মত ফুলে-ফুলে দুলছে। একটা চায়ের দোকনে দুজনে গিয়ে বসে পড়ে। চাওলা আপ্লুত হয়ে বলে, আসুন ওস্তাদ। এস, মা-লক্ষ্মী এস!

সুবর্ণ হাসতে হাসতে বলে, হুঁ। সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক।

চাওলা গড়ে পড়ে। বিধাতার রসিকতা। প্রথম রাত্তিরে যখন দেখলাম, ভাবলাম ঢপ কিংবা ঝুমুরদলের মেয়ে! পরে শুনি, ও হরি! মেয়ে নয়, ছেলে। তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ওস্তাদ। শুধু আমি কেন, কারও বিশ্বাস হচ্ছে না! এই যে এখন সাজ খুলেছে, পাজামা শার্ট পরেছে। তবু কি মনে হচ্ছে? আসলে শালা চোখের ঘোর সবই। আমার চোখে রাতের আসর ঘুচছে কই?

সুবর্ণ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, চা দাও। কেক ... আর ওই বিস্কুট, হ্যাঁ, ওগুলো।

সনাতন শ্যামচাঁদের মন্দির দেখছিল। একদল লোক জটলা করছিল দাঁড়িয়ে। কেমন যেন ব্যস্ততা তাদের আচরণে। ওদিকের দোকানগুলো থেকে আরও কিছু লোক দৌড়ে যাচ্ছে! চাওলা চা ছাঁকতে ছাঁকতে সেদিকে তাকাল। ...কী হল রে বাবা?

সুবর্ণ বলে, কী?

ওই যে সব ছোটাছুটি করছে!

সুবর্ণ মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। চেনা মনোহারিওলা এগিয়ে আসে এদিকে। সুবর্ণ বলে. কী হয়েছে দাদা?

আরে, সে এক কাণ্ড! মাঠে নাকি একটা লাস পড়ে আছে। গাঁয়েরই বউ। ...মনোহারিওলা চলে গেল বলতে বলতে।

বাসনের দোকান থেকে একজন চেঁচিয়ে কাকে বলে, সাধুপদ পণ্ডিতের বউ। একলা মেলায় এসেছিল—গুণ্ডারা তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করেছে। মেরে ফেলেছে।

সনাতন লাফিয়ে ওঠে। পাগলের মতো বাগানের দিকে দৌড়তে থাকে। সুবর্ণ পেছনে ছুটে যায়—ওস্তাদ, ওস্তাদ!

দলের লোকেরা গিয়ে দেখে এসেছে লাসটা। একটা চৌকিদার পাহারা দিচ্ছে। কাকেও কাছে এগোতে দিচ্ছে না সে। সনাতনকে আনিস ধরে নিয়ে এসেছে। পুলিশ এসে যাবে শিগগির। থানায় খবর গেছে। সাধুপদর ভাইরা নাকি কেউ তখনও যায়নি। সাধুপদ নলহটিতে কী কাজে গেছে। তার কাছে খবর গেছে কি না কেউ জানে না!

বিশাল মাঠের বুকে অনেক রোদ গায়ে নিয়ে সুধা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। গোলগাল পুতুল, চিকন মখমল, তুলতুলে। খোলা বড় বড় চোখ। দাঁতের ফাঁকে জিভ। রক্ত!

ওস্তাদ, ওস্তাদ!

উঁ?

হাঁ করুন, ঢেলে দিই।

হুঁ। দাও। ...ঢকঢক করে অবিকৃত মুখে মদ গেলে সোনা ওস্তাদ। দুলতে থাকে। তারপর ডাকে, আনিস!

বলুন, ওস্তাদ।

সুবর্ণ কই?

এই যে আছি। ...সুবর্ণ ওকে ছুঁয়ে থাকে।

সুবর্ণ, সুধাকে কে খুন করেছে জানিস?

ও কথা থাক ওস্তাদ।

হুঁ, থাক। আনিস, মদ দাও।

আমির ধমক দিয়ে বলে, আনিস! কী হচ্ছে! অত খাওয়াচ্ছিস কেন?

কাদু বলে, খাক না। আজ তো আসর বন্ধ।

কালাচাঁদ বলে, আজ কী? আর আসর চলতেই দেবে না শুনলাম। দারোগাবাবুর হুকুম। মেলাও নাকি উঠে যাচ্ছে।

আমির চিন্তিতমুখে বলে, একবার লায়েকদের ওখানে যাই। কথাটা জেনে আসি। খামাকা পড়ে থেকে লাভ কী? বাড়ি ফিরে যাব।

কাবুল ঘরের কোণে কাঠ হয়ে ঘুমোচ্ছে। নন্দ তার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে লাল চোখে বাইরের লালচে রোদ দেখছে। নাকি আকাশ দেখছে। নাকি অন্ধকার দেখছে। অন্ধকারে ঠাণ্ডা মেয়ে। মরা কাঁকড়া চিৎপাত।

ডুবু চিৎ হয়ে শুয়ে গুনগুন করে গাইছে। তাড়ি ছাড়া তার জমে না। একটু আগে বাগদীপাড়ায় গিয়ে একপেট গিলে এসেছে। সে অনন্ত নিরাসক্তিতে বুঁদ।

সুবর্ণ!

হ্যাঁ, ওস্তাদ?

ছুঁয়ে থাক। আনিস, মদ দাও।

অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস, ওস্তাদ। ...

সন্ধ্যার দিকে লায়েকদের চরম কথাটি জানা গেল। গান আপাতত বন্ধ। পয়সাকড়ি চুকিয়ে দিয়েছে দুটো দলকেই। মনকির ওস্তাদ যাবার আগে দেখা করতে এসেছিল। সোনা ওস্তাদ নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছে। নমস্কার রইল, বলে মনকির চলে গেছে।

সোনা ওস্তাদকে নিয়ে ঝামেলা। সন্ধ্যার পর একটা ট্রেন আছে। নন্দ আর কাবুল চলে গেছে স্টেশনে। তাদের সঙ্গে যন্ত্রপাতি নিয়ে কালাচাঁদ আর নফরও গেছে। আনিস ওস্তাদের পাশে বসে আছে। কাদু আর সুবর্ণ বারান্দায় সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। আমিরও তৈরি।

কিন্তু ওস্তাদের ঘুম ভাঙে না। আমির গজগজ করছে। ট্রেন ফেল হবে নির্ঘাৎ। ও আনিস, ওনাকে ডাক না রে! এ তো আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেল!

ওস্তাদ, ওস্তাদ?

উঁ?

উঠুন। ট্রেন ফেল করব যে।

হুঁ। উঠি।

এবার সনাতন উঠে বসে। চোখ কচলে তাকায়। রোদ ফুরিয়ে গেছে। কাছারির প্রাঙ্গণটা স্তব্ধ আর ফাঁকা। আমির মোটা ছড়ি হাতে ব্যস্তভাবে পায়চারি করছে। সনাতন টলতে টলতে ওঠে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। ওর ডান বাহুটা ধরে রাখে। আনিস! সুবর্ণ এগিয়ে এসে বলে, হাঁটতে পারবেন তো?

সনাতন জবাব দেয় না। বারান্দা থেকে নেমে আমিরকে বলে, চলুন। পাঁচজন গেনে মানুষ আস্তে আস্তে হেঁটে যায় স্টেশনের দিকে। ...

ট্রেনের দেরি আছে তখনও। প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল সোনা ওস্তাদ আর সুবর্ণ। হঠাৎ সুবর্ণ বলে, একটা কথা তখন থেকে মাথায় ঘুরছে। বলা হয়নি। কাল রাতে আপনি সুধাদির কাছ থেকে এলেন ব্যাগ নিতে। তখন নন্দ-ঠাকুর আর কাবুলদাকে বটতলার দিকে যেতে দেখেছিলাম। আমি ভাবছি, ওরা কিছু করেনি তো?

সনাতন চমকে উঠেছিল। ...নন্দ আর কাবুল!

হ্যাঁ। ওরা জানতে পেরেছিল, আপনি সুধাদির কাছে ছিলেন। কাবুলদা যাবার সময় কী বলে গেল, মনে পড়ছে। হ্যাঁ ...বলল, আয় রে ঠাকুর, দেখে আসি কী খেলা খেলছে সোনা ওস্তাদ।

সনাতন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলতে পারে না।

ওদের ধরিয়ে দিন। সুবর্ণ ফিসফিস করে। ...এক্ষুনি পুলিশকে বলুন। ওই তো ওখানে একজন পুলিশ দেখছিলাম। নাকি, আনিসদাকে বলব? সে পারবে।

সনাতন বলে, থাক।

কেন থাকবে? পাপী পাপের শাস্তি পাবে না?

কে জানে কে পাপী, সুধা না ওরা!

কী বলছেন ওস্তাদ!

আমি তো বিচারক নই, সুবর্ণ।

সুবর্ণ একটু চুপ করে থেকে বলে, কিন্তু সব জেনেশুনে ওই খুনি দুটো দলে থাকবে, আর সেই দলে গান করব? আমি পারব না ওস্তাদ। আমার ভয় করছে। ঘেন্না হচ্ছে।

আমিও কি পারব সুবর্ণ? পারব না।

নির্জন অন্ধকারে মুখোমুখি ঘন হয়ে আসে সুবর্ণ। দুহাতে সোনা ওস্তাদকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলে, চলুন, আমরা পালিয়ে যাই।

চোখ জ্বলে ওঠে সোনা ওস্তাদের। ...যাবি?

যাব।

চারপাশটা চকিত চোখে দেখে নেয় দুজনে। দলের লোকেরা দূরে স্টেশনের বারান্দায় ট্রেনের অপেক্ষা করছে। নিচু প্লাটফর্মের ওপর কেরোসিন বাতির মৃদু আলো পড়েছে। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

দুজনে প্লাটফর্ম পেরিয়ে লাইনের ধারে ধারে আপ স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকে। সিগন্যাল নীল হয়ে গেল। গাড়ির আলো গায়ে পড়বে বলে বাঁদিকে মাঠে নামে ওরা। লাইনের সমান্তরালে হাঁটতে থাকে। মাথার ওপর অজস্র নক্ষত্র ওদের অনুসরণ করে।

কতদূর গিয়ে ওরা একবার থামে। ট্রেন আসছে। ট্রেনটা আলো নিয়ে চলে গেলে ওরা লাইনে গিয়ে ওঠে। দলের লোকেরা খুঁজবে। হয়ত ভাববে, অন্য কোন কামরায় উঠেছে। ...

আপের স্টেশন পাঁচ মাইল দূরে। হনহন করে হাঁটে দুজনে। কোন কথা বলে না। কোথায় যাবে, কিছু ভাবেই না। শুধু মনে হয়, পৃথিবীটা খুব ছোট নয়। আর যেতে যেতে বিহুলতায় হঠাৎ থেমে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। আর ঘৃণা নয় সোনা ওস্তাদের। এই আবেগ, এই ভালবাসা, এই শরীর ছোঁয়া আবেশ—মায়া নামে নারীর উদ্দেশে। যে নারী নটী—যার ছায়া পড়েছে এক কিশোর পুরুষদেহে, যে ছায়া সারাবেলা নাচে। সেই ছায়াকে নিয়েই যত খেলা। যত পালাগান, কান্না, সুখ, ভালবাসা।

...কিন্তু সাবধান সোনা ওস্তাদ। ছায়ার পেছনে হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজো না। সেখানে

বিষম অনর্থ। সেখানে পাপ। জঘন্যতা। প্রতিমার বুকের ভেতর শুকনো পাঁক খড় কাঠ আবর্জনা। তুমি সাবধান। অধরাকে রক্তমাংসে ধরতে গেলেই বিপদ।

পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর ওপর অনন্ত আকাশ থেকে ওস্তাদ ঝাঁকসার গুরু ওস্তাদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাস চিৎকার করে ওঠে, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! তোমার সামনে মায়া। ছায়ারূপী মায়া। তার পেছনে ভয়ঙ্কর জাহান্নাম।

সুবর্ণ!

ওস্তাদ!

কোনদিন আমাকে ছেড়ে পালাবিনে তো?

আপনি পালাবেন না তো?

না।

আমিও না!

চল, আমরা ওস্তাদ ঝাঁকসার কাছেই যাই।

আমিও তাই ভাবছিলাম, ওস্তাদ।

সামনে স্টেশনের সিগন্যাল বাতি লাল। ওখান থেকে আজিমগঞ্জ হয়ে জঙ্গীপুর—তারপর গঙ্গা পেরিয়ে ধনপতনগর। ওস্তাদ ঝাঁকসার বাড়ি থাকার কথা। না থাকলে, যেখানে আছে—সেখানেই চলে যাবে দুজনে। পদ্মার ওপারে মালদহে আলকাপের বড় খ্যাতি। ওস্তাদ ঝাঁকসাকে বলবে, চলুন—পদ্মার পারে দিগ্বিজয়ে যাই। সুবর্ণর মতো মোহিনী ছোকরা, ফজলের মত কপে, আপনি ওস্তাদের রাজা—আর আমি সোনা মাস্টার, হ্যাঁ আমি আপনার সোনা মাস্টার হয়েই থাকতে চাই ওস্তাদজী!...

অনেক গান আর মায়া ভরা একটা জগতের দিকে হেঁটে যেতে যেতে দুটি মানুষ একসঙ্গে গুনগুন করে ওঠে।

> কী আনন্দ দেখে গো নভে নবীন চাঁদের উদয়।
> মায়ায় মায়ার যাক না জন্ম, যদি আরেকজন্মে সত্যি হয়।

গাইতে গাইতে একটা হাত আরেকটা হাত ধরে থাকে। একটা শরীর আরেকটা শরীরকে ছোঁয়। ফের কে গর্জে ওঠে, হুঁশিয়ার। পিছনে জাহান্নাম! মনে মনে চমকে ওঠে সোনা ওস্তাদ। তবু সেই হাতটা ছাড়ে না। সুবর্ণকে ছুঁয়ে থেকে একটা নতুন পালা বাঁধবার সাধ হয়।

মেয়েদের মত দীঘল কেশ, দুহাতে চাঁদির চুড়ি, নীলচে শার্ট আর পাজামা, পায়ে কাবুলি চপ্পল, ফরসা মুখের চাপা চিবুক, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ, পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী—অথচ নারীও না; সে কিম্পুরুষও নয়—

সে এক অমর্ত্য মায়া। তাকে নিয়েই দেশে দেশে মৃদঙ্গ বাজে।